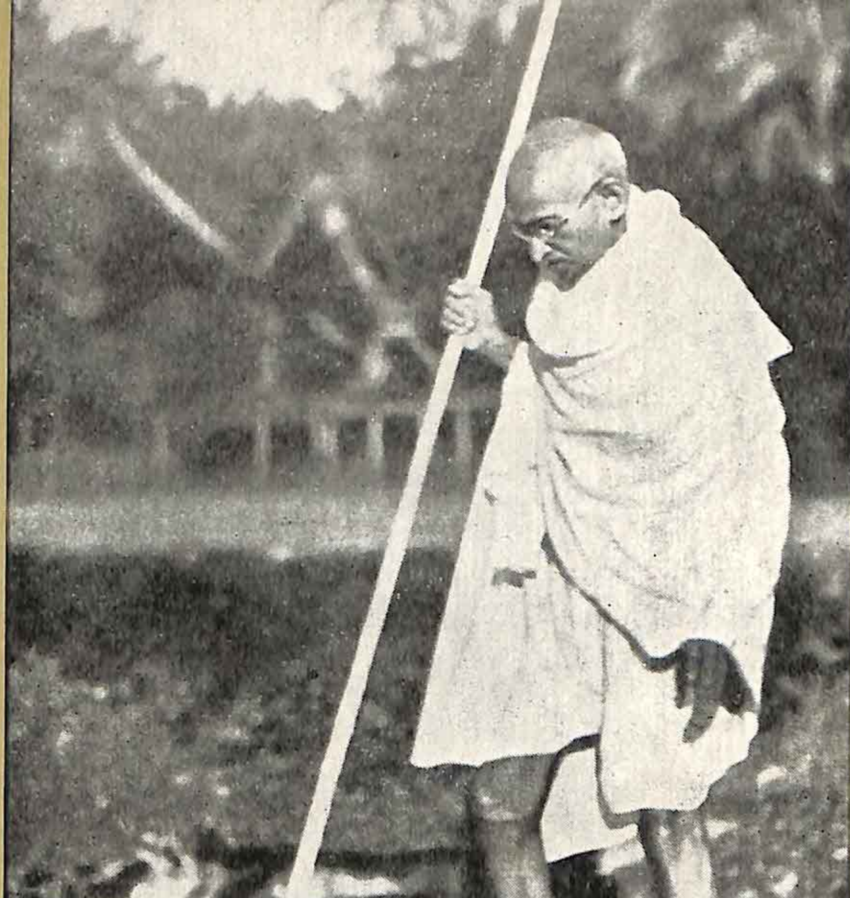


নোয়াখালিতে মহাত্মা

নোয়াখালিতে মহাত্মা

আশীর্বাণী

মহাত্মা গান্ধী

গ্রন্থপরিচিতি

অধ্যাপক নির্মলকুমার বসু

গ্রন্থকার

সুকুমার রায়

ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি
কলিকাতা ১২

গান্ধী-শতবার্ষিকী সংস্করণ : ১৯৬৯-৭০

দাম : ৮·০০

শ্রীপ্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক কর্তৃক ৯ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৯
হইতে প্রকাশিত ও এস. রায় কর্তৃক বিদ্যুৎ প্রিণ্টিং প্রেস
১৭ ভীম ঘোষ লেন, কলিকাতা ৬ হইতে মুদ্রিত

ভ্রাতৃকলহবিধ্বস্ত নোয়াখালির গ্রামাঞ্চলে যাঁহার অমৃতময়ী
সান্ত্বনার মধুর স্পর্শ সর্বহারা নরনারীর হৃদয়ে শান্তি
আনিয়া দিয়াছিল, সেই মহাপ্রাণের নামে
এই কাহিনী উৎসর্গ করিলাম

আশীর্বাদ

মো. ক. গান্ধী

গান্ধীজীর বাংলাভাষায়
প্রদত্ত আশীর্বাণী

১২ই আগস্ট ইং ১৯৪৭ সাল

সোদপুর খাদি-প্রতিষ্ঠান আশ্রম

গ্রন্থপরিচিতি

[গান্ধীজীর নোয়াখালি-সহচর অধ্যাপক শ্রীনির্মলকুমার বসু কর্তৃক লিখিত]

গান্ধীজীর নোয়াখালি পরিভ্রমণের সময়ে সাংবাদিকগণের মধ্যে শ্রীযুক্ত সুকুমার রায়ও ছিলেন। গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ঘোরার সময়ে গান্ধীজীর অহিংস প্রচেষ্টার প্রভাব কেমনভাবে জনসাধারণের মনে ছড়িয়ে পড়ছে, সুকুমারবাবু স্বাধীনভাবে সে বিষয়ে নিরীক্ষণ করেছেন। ওঁর পর্যবেক্ষণক্ষমতার উপরে আমার আস্থা আছে, বইএর ভাষা এবং বর্ণনাভঙ্গিও ভাল। বইখানি গান্ধীজীর ভ্রমণের প্রামাণিক অনুলিপি হিসাবে ব্যবহৃত হবে, এই আশা পোষণ করি।

সোদপুর, গান্ধীশিবির।
১২. ৮. ১৯৪৭

প্রকাশকের কথা

সোদপুর খাদি-প্রতিষ্ঠান আশ্রমে গান্ধী-শিবিরে মহাত্মাজীকে পুস্তকখানি দেখান হয়। গান্ধীজী বিশেষ কর্মব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও আগ্রহসহকারে প্রায় কুড়ি মিনিট ধরিয়া পুস্তকখানির পৃষ্ঠা উল্টাইয়া দেখেন। তিনি গ্রন্থের আলোচ্য বিষয় ও আদর্শ সম্পর্কে জানিতে চাহিলে পাঠ করিয়া শুনানো হয়।

হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে মৈত্রী-স্থাপনের মহান প্রচেষ্টায় নোয়াখালির গ্রাম হইতে গ্রামান্তর পরিক্রমার অবিকৃত এবং পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস নিরপেক্ষভাবে হিন্দু ও মুসলমান জনসাধারণের গোচরে আনিবার উদ্দেশ্য লইয়া গ্রন্থখানি লিখিত,—ইহা জানিয়া তিনি প্রীত হন।

মহাত্মাজীর আশীর্বাদ প্রার্থনা করা হইলে তোমাদের প্রচেষ্টা সার্থক হউক বলিয়া তিনি গ্রন্থখানির প্রথম পৃষ্ঠায় 'আশীর্বাদ' বাংলা ভাষায় লিখিয়া দেন। গ্রন্থকারের সংগ্রহ-ভঙ্গি পাঠ করিয়া গান্ধীজীর নোয়াখালি-সহচর অধ্যাপক শ্রীনির্মলকুমার বসু গ্রন্থ-পরিচিতি লিখিয়া দিয়াছেন।

আমাদের প্রচেষ্টার সাফল্যের পথে—'বাপু'র আশীর্বাণী এবং তাঁর সহচরের শুভেচ্ছাই সহায়।

১৫ই আগস্ট, ১৯৪৭ প্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক

শতবার্ষিকী সংস্করণের নিবেদন

দেশে-বিদেশে সর্বত্র গান্ধী-শতবার্ষিকী পালিত হইতেছে। এই উপলক্ষে গান্ধীজীর নিজের লেখা এবং গান্ধীজীর উপর বহু বই প্রকাশিত হইয়াছে। 'নোয়াখালিতে মহাত্মা' পুস্তকখানির রচয়িতা বন্ধুবর সাংবাদিক গান্ধীজীর নোয়াখালি-ভ্রমণের সাথী ছিলেন। তিনি সাংবাদিক রূপে প্রতিদিনের কর্মসূচী এবং ঘটনা লিপিবদ্ধ করেছিলেন। তাতেই এই বই হয়েছিল।

গান্ধী-সাহিত্যের আজ পাঠকমহলে নূতন করে চাহিদা হওয়ায় গান্ধী-শতবার্ষিকীতে পুনঃপ্রকাশ করা হইল। নিবেদন ইতি—

প্রকাশক

সূচীপত্র

ভূমিকা

সূচনা

পূর্ববঙ্গের অত্যাচার-কাহিনী যেদিন দেশদেশান্তরে ছড়াইয়া পড়িল, সেদিন বিমূঢ় মানব ভাবিয়া পাইল না ইহার কি প্রতিকার সম্ভব! অসহায় মানবের ব্যথাতুর ক্রন্দনধ্বনি রাষ্ট্রশক্তির প্রাণে স্পন্দন জাগাইল না; অত্যাচারে জর্জরিত, অশিক্ষিত অদৃষ্টবাদী পল্লীবাসীরা ভাবিতে লাগিল ইহাই বুঝি তাহাদের ভাগ্যের লিখন। এই লিখন খণ্ডাইবার মত শক্তিমান পুরুষ বোধ হয় ইহজগতে আর নাই। প্রাণভয়ে ভীত, সন্ত্রস্ত নরনারী সাতপুরুষের ভিটা ছাড়িয়া পলায়ন করিতে লাগিল।

অপরদিকে অন্যায়ের এই পুঞ্জীভূত গ্লানি আষাঢ়ের কৃষ্ণমেঘের ন্যায় ছড়াইয়া অনতিবিলম্বে বজ্রপাতের সম্ভাবনায় ভরিয়া উঠিয়াছিল। প্রতিশোধ-স্পৃহায় সারাদেশ চঞ্চল হইয়া উঠিল। একদিকে ব্যথিতের আর্তনাদ ও অন্যদিকে প্রতিহিংসাকামীর হুঙ্কার।

ভারতের মহামানব মহাত্মা গান্ধী তখন দিল্লীতে। দিল্লীতে বসিয়া তিনি স্বাধীনতার দ্বারদেশে জাতির পথনির্দেশ করিতেছিলেন। ইংরাজের 'অধিকৃত' ভারতভূমি হিন্দু-মুসলমানের ভারতভূমি হইবে, ইহা মহাত্মার চিরদিনের স্বপ্ন। আজীবন তিনি এই কথাই বলিয়া আসিতেছেন, জাতি যখন স্বাধীনতার আলোকরশ্মি দেখিবে তখন আর এই আত্মঘাতী হানাহানি থাকিবে না। সকল বিরোধ ভুলিয়া তাহারা একই মায়ের সেবায় আত্মনিয়োগ করিবে। এই সময় দেবতার আসন টলিয়া উঠিল। মানসচক্ষে মহাত্মা দেখিলেন অপমানিত, লাঞ্ছিত নারীর অশ্রুজল! তাঁহার কর্ণে আসিয়া বাজিল ব্যথিতের মর্মবিদারী আর্তনাদ।

দিল্লীতে প্রার্থনা-সভায় গান্ধীজী বলিলেন, "যেদিন হইতে আমি নোয়াখালির খবর শুনিয়াছি, সেদিন হইতে আমি আমার কর্তব্যের কথা ভাবিতেছি। ঈশ্বর আমাকে পথ দেখাইবেন। লোকে আমাকে ভালবাসে। একটিমাত্র পথেই আমি ইহার জন্য অন্তরের ধন্যবাদ জানাইতে পারি। তাহা হইল ঈশ্বর আমাকে যে সত্য দান করিয়াছেন এবং যে সত্যের অনুশীলনে আমার জীবন উৎসর্গ

করিয়াছি সেই সত্যকে জনসাধারণের সমক্ষে এবং তাহাদের মধ্য দিয়া জগতের সম্মুখে তুলিয়া ধরা।"

নোয়াখালির প্রতিক্রিয়া হিসাবে হইলেও বিহারের বর্বরতার নিন্দায় কেহ বিরত হন নাই, ঘটনার সাথে সাথেই উহা দমনের জন্য কঠোরতম ব্যবস্থা অবলম্বনে বিহারের কংগ্রেস মন্ত্রিমণ্ডলী কুণ্ঠাবোধ করেন নাই। এক সপ্তাহের মধ্যেই কংগ্রেস গভর্নমেণ্ট পুলিস, মিলিটারী ও কংগ্রেস-কর্মীদের সহযোগিতায় বীভৎসতা বন্ধ করিয়াছেন। তাহা ছাড়া বিহারবাসীদের অন্যায়ের জন্য মহাত্মার অনশনের সঙ্কল্প প্রকাশ এবং অন্তর্বর্তী সরকারের ভাইস-প্রেসিডেণ্ট পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু কর্তৃক আকাশ হইতে বোমাবর্ষণের ইঙ্গিতেও দ্রুত অবস্থা সম্পূর্ণরূপে শান্ত হওয়ায় সাহায্য করে। সুতরাং একথা কেহ বলিতে পারিবেন না যে, বিহারের গভর্নমেণ্ট সংখ্যালঘুদের ধন-প্রাণ রক্ষার কোন চেষ্টাই করেন নাই, অথবা কোনপ্রকার পক্ষপাতমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া শাসন-পরিচালনায় অযোগ্যতার পরিচয় দিয়াছেন। বিহারের কংগ্রেস গভর্নমেণ্ট কর্তব্যপালনে পরাঙ্মুখ হন নাই, ঘটনার সংবাদ চাপিবার বা ঢাকিবার কোন প্রয়াস দেখান নাই এবং শান্তিস্থাপনেও অনুচিত কালহরণ করেন নাই। অথচ নোয়াখালির অত্যাচারের কাহিনী দেশবাসী জানিতে পারিল প্রায় এক সপ্তাহ পর। তখন হইতেই নোয়াখালির অবস্থাকে ক্রমাগত লঘু করিয়া দেখাইবার জন্য মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছেন এবং বিহারের অবস্থার উপর অস্বাভাবিক গুরুত্ব আরোপ করিয়া কংগ্রেস মন্ত্রিমণ্ডলীর নিন্দায় পঞ্চমুখ হইয়া উঠিয়াছেন।

সঙ্কল্প

২৭শে অক্টোবর মহাত্মা গান্ধী নোয়াখালি গমনের সঙ্কল্প প্রকাশ করেন। এইদিন দিল্লীতে প্রার্থনান্তিক বক্তৃতায় গান্ধীজী বলেন, "আমি আগামীকাল সকালে কলিকাতা রওনা হইব। সেখান হইতে নোয়াখালি যাইব মনস্থ করিয়াছি। নারীর দুঃখের কাহিনী সর্বদাই আমাকে বিচলিত করিয়া ফেলে। আমি তাহাদের চোখের জল মুছাইতে যাইতেছি, তাহাদের সাহস দিতে যাইতেছি। তাহারা কোনই অপরাধ করে নাই।"

মহাত্মার শরীর তখন সুস্থ ছিল না। তাহা সত্ত্বেও কর্তব্যের তাগিদে তিনি শারীরিক আরাম উপেক্ষা করিয়া পরদিনই নোয়াখালির পথে কলিকাতা রওনা হওয়াই স্থির করিলেন। গান্ধীজী তাঁহার শারীরিক অবস্থার উল্লেখ করিয়া

বলেন যে, তাঁহার শরীর ভাল নয়। নোয়াখালি যাওয়া খুবই কষ্টকর। তথাপি কর্তব্য তাঁহাকে করিতেই হইবে। সেই কর্তব্য সহজসাধ্য করিবার জন্য ভগবানের উপর বিশ্বাস রাখা আবশ্যক। ইহার অর্থ এই নয় যে, ঈশ্বর সমস্ত কঠোরতা দূর করিয়া দিবেন। তবে তিনি ইহাকে সহজভাবে গ্রহণ করিবার সামর্থ্য দিতে পারেন।

মনুষ্যহৃদয়ের মূলগত নৈতিক ভিত্তির উপরে এবং অধ্যাত্মশক্তির উপর চরম বিশ্বাস লইয়াই মহাত্মাজী জীবনের বাস্তব পটভূমিকার বিচিত্র ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে সমস্ত প্রয়োগ পরীক্ষা করিয়া আসিতেছেন, নোয়াখালি তাহারই একটি নবতম পরীক্ষাগার। এই অটুট বিশ্বাসের উপর দাঁড়াইয়াই মহাত্মা দক্ষিণ আফ্রিকায় আন্দোলন পরিচালনা করিয়াছেন, অক্ষুণ্ণ গতিতে ডাণ্ডি অভিযানে অগ্রসর হইয়াছেন, 'তিন কাঠিয়া' প্রথার মূলোচ্ছেদের জন্য বিহারে 'চম্পারণ সত্যাগ্রহীর' বেশে অভিযান চালাইয়াছেন, আবার সেই বিশ্বাসবোধই মহাত্মাকে নোয়াখালির অখ্যাত পল্লীপ্রান্তে অভিযান চালাইবার প্রেরণা জোগাইয়াছে। আত্মশক্তিতে বলীয়ান সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী সেই শাশ্বত সম্পদ সম্বল করিয়াই নিঃশঙ্কচিত্তে নিঃসঙ্গ অভিযান চালাইয়াছেন এমন এক ভয়াবহ ও বিপদসঙ্কুল অঞ্চলের অভিমুখে ব্রিটিশ সামরিক শক্তি যাহার উপকণ্ঠে আসিয়া স্তম্ভিত হইয়াছিল। মনুষ্যচরিত্রের নীতিগত ভিত্তিতে এবং অধ্যাত্মশক্তির চূড়ান্ত প্রতিষ্ঠায় অচল আস্থা ব্যতীত এ অভিযান সম্ভব হইত না। যে মনুষ্যত্ব প্রত্যক্ষদৃষ্টিতে পশুত্বের নিম্নে নামিয়া গিয়াছে, অধ্যাত্মশক্তির আহ্বানে পুনরায় তাহাকে মনুষ্যত্বের স্তরে টানিয়া তোলা যায় কিনা ইহাই মহাত্মাজীর পরীক্ষা। এই পরীক্ষাকেই তিনি 'হরিজনে' তাঁহার 'অহিংসার কঠোরতম অগ্নিপরীক্ষা' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। এই বয়সে এইরূপ দুর্গম গ্রামাঞ্চলে একক এই অভিযান এক অভূতপূর্ব ব্যাপার।

মহাত্মা গান্ধীর একক শ্রীরামপুর অভিযান এবং আশ্রমকর্মিগণকে বিভিন্ন উপদ্রুত এলাকায় কেবলমাত্র আত্মিকশক্তি সম্বল করিয়া প্রেরণের নির্ভীক সংকল্প যেদিন প্রথম সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইল, সেইদিনই তাহা সমগ্র দেশের আগ্রহ ও আশঙ্কা-ব্যাকুল দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। তাঁহার আদর্শ ও কর্মপন্থা সম্বন্ধে বহু ব্যক্তি ও সংবাদপত্র বিভিন্নভাবে আলোচনা করিয়াছেন; কিন্তু সে সম্বন্ধে মহাত্মাজীর অন্তরের কথা জনসাধারণের গোচর হইল সেদিন, যেদিন হরিজন পত্রিকায় 'ধর্মবিশ্বাসের নিঃশঙ্ক অভিযান' শীর্ষক একটি প্রবন্ধে তিনি ইহার বিশদ ব্যাখ্যা প্রদান করিলেন।

আশ্রমবাসিগণ যখন মহাত্মাজীর চূড়ান্ত নির্দেশের জন্য উন্মুখ হইয়া প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, ঠিক সেই সময় নীরবতা ভঙ্গ করিয়া তিনি বলিলেন, আশ্রমের পুরুষ ও নারী কর্মিগণকে একক এক একটি উপদ্রুত গ্রামে গিয়া তথাকার নির্যাতিত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রাণ ও মানের রক্ষক রূপে অবস্থান করিতে হইবে এবং প্রয়োজন হইলে নিজের জীবনের বিনিময়ে তাহা রক্ষা করিতে হইবে ; এই দুর্বহ দায়িত্ব গ্রহণ করিতে যদি কেহ অনিচ্ছুক হন তিনি স্বচ্ছন্দে অন্য কোন গঠনমূলক কার্যে আত্মনিয়োগ করিতে পারেন ; নিজের সম্বন্ধে মহাত্মাজী দৃঢ় ও নির্ভীক কণ্ঠে বলেন, তাঁহার সিদ্ধান্ত অমোঘ ও অপরিবর্তনীয়।

জনৈক শঙ্কিত শুভেচ্ছু সম্ভাব্য সঙ্কট সম্বন্ধে মহাত্মাজীকে সতর্ক করিবার জন্য বলিলেন, রক্তপিপাসু নরহন্তা যাহারা, যুক্তির তাহারা যে কোন ধারই ধারে না, তাহার প্রমাণ আশ্রমকর্মিগণের মধ্যেই একজন সেদিন নিহত হইয়াছেন। সে সম্ভাবনাসমূহ স্বীকার করিয়া লইয়াই মহাত্মাজী বলিলেন, মানুষের সেই জিঘাংসা জয় করিবার জন্যই তাঁহার অভিযান, সেই প্রবৃত্তি প্রশমিত করিবার জন্যই তাঁহার সাধনা। মহাত্মাজী তাই হরিজন পত্রিকার প্রবন্ধে তাঁহার কর্ম-প্রচেষ্টাকে অহিংসার কঠোরতম অগ্নিপরীক্ষা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। প্রশ্ন উঠিতে পারে, পূর্ববঙ্গের এক সঙ্কীর্ণ অঞ্চলের কোন এক সঙ্কীর্ণতর স্থানে যাহা সংঘটিত হইতেছে মহাত্মাজী কেন তাহার উপর এতখানি গুরুত্ব আরোপ করিলেন, নিজের মহামূল্য জীবন কেন তাহার জন্য বিপন্ন করিতে প্রস্তুত হইলেন, সন্তানপ্রতিম স্নেহভাজন শিষ্যগণকে মৃত্যুর কবলেও উৎসর্গ করিতে উদ্যোগী হইলেন কেন ? এই সন্দিগ্ধ প্রশ্নের সুস্পষ্ট উত্তর মহাত্মাজী তাঁহার প্রবন্ধেই প্রদান করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, পূর্ববঙ্গের এই সমস্যা স্থানীয় সমস্যা নহে, ইহা নিখিল ভারতীয় সমস্যা। তিনি তাঁহার ঋষিকল্প দূরদর্শিতা ও সূক্ষ্মদৃষ্টির সাহায্যে বিপদের বৃহত্তর রূপ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন এবং তাহা করিয়াছেন বলিয়াই ভারতের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সচেতন হইয়া পূর্ব বাংলার এই সর্বনাশা সমস্যার সমাধানকল্পে সর্বশক্তি নিয়োগ করিয়াছেন।

দুরভিসন্ধি ও দুষ্ট প্ররোচনার দ্বারা জনকয়েক স্থূলদর্শী ও স্বার্থান্বেষী ব্যক্তি মানুষের অন্তর্নিহিত সুপ্ত পশুত্বকে জাগ্রত করিয়া তুলিয়াছে। ক্ষিপ্ত ও বিক্ষুব্ধ নৃসিংহ-মূর্তি যখন তাহার শোণিতাক্ত করাল নখদংষ্ট্রা লইয়া উন্মাদ তাণ্ডবে প্রমত্ত, দুর্বলচিত্ত দুষ্ট প্ররোচক জানে না, কোন্ মন্ত্রবলে তাহাকে শান্ত করিবে।

তাই দুরভিসন্ধিমূলক প্ররোচনার দ্বারা গণচিত্ত মন্থনের ফলে যে কালকূট উদ্ভূত হইয়াছে, তাহার বিধ্বংসী ও বিষময় প্রভাব হইতে সম্প্রদায়, দেশ এবং জাতিকে বাঁচাইবার জন্য মহাত্মাজী অগ্রসর; তাঁহার অটল প্রতিজ্ঞা, হয় তিনি এই কালকূট নিঃশেষে পান করিয়া নীলকণ্ঠ হইবেন, নয় বিষে জর্জরিত মৃত্যুবরণ করিবেন। তাঁহার দিব্যদৃষ্টির সম্মুখে যে দৃশ্য প্রসারিত, তাহা চোখের সম্মুখে রাখিয়া মানবমঙ্গলেচ্ছু মহাত্মার পক্ষে ইহা ছাড়া আর গত্যন্তর কোথায় ছিল। তিনি দেখিতেছেন প্রেমের স্পর্শে জিঘাংসা যদি শমিত না হয়, সত্যের স্পর্শে মনুষ্যত্ব যদি পুনরুদ্বুদ্ধ না হয়, তাহার পরিণাম কী অভাবনীয় ভয়াবহ! পশুত্বের প্রহারে পশুত্ব ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিবে, হিংসার তাড়নায় জিঘাংসা জাগ্রত হইয়া উঠিবে এবং তাহার পর? তাহার পর পূর্ব বাংলার একটি জেলার কোন একটি সঙ্কীর্ণ অঞ্চলে যাহা সংঘটিত হইতেছে, আরও বীভৎসরূপে আরও নগ্ন বর্বরতায় সমগ্র ভারত প্রত্যক্ষ করিবে তাহারই পৈশাচিক অনুষ্ঠান। তাহার ফল হইবে সমাজের সর্বনাশ, দেশের দুর্বিপাক, জাতির বিপর্যয় ও মনুষ্যত্বের মৃত্যু। এই ভয়াবহ ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই মহাত্মাজী বলিয়াছেন—

"যদি প্রতিশোধ-প্রবৃত্তিই জয়ী হয়, তাহা হইলে পূর্ববঙ্গে মুসলমানগণ যেসব নৃশংস কার্য করিয়াছে বলিয়া প্রকাশ, জয়লাভ করিবার জন্য হিন্দুদিগকে তাহা হইতে অধিকতর নৃশংস হইতে হইবে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ হিটলারের অস্ত্র লইয়াই হিটলারের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁহারা নৃশংসতায় হিটলারকেও অতিক্রম করিয়া যান।"

মহাত্মাজীর এই উক্তি নিরাপদ স্থানে অবস্থিত কোন নিঃসম্পর্কিত নেতার প্রগলভ ভাষণ নয়; ইহা সত্যসন্ধ ঋষির ভবিষ্যদ্বাণী, মানববন্ধু মহাত্মার সতর্ক সঙ্কেত।

পরিক্রমার পথে

গান্ধীজীর গ্রাম হইতে গ্রামান্তর ভ্রমণের সঙ্কল্পে নোয়াখালির মুসলমানরা প্রথমে ভীত ও শঙ্কান্বিত হইয়া পড়িয়াছিল, সাধারণ অশিক্ষিত পল্লীবাসী মুসলমানরা গান্ধীজীকে সশস্ত্র পুলিস-বেষ্টিত হইয়া গ্রামে প্রবেশ করিতে দেখিয়া এই ভাবিয়া ভয় পাইয়াছিল যে, গান্ধীজী হয়ত তাহাদের ধরাইয়া দিতে আসিয়াছেন। ইহা ভিন্ন গান্ধীজীর ভ্রমণের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সরলপ্রাণ পল্লীবাসী মুসলমানদের মনে ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টি করিবার লোকের অভাব ছিল না।

তাই প্রথম প্রথম সাধারণ মুসলমানরা গান্ধীজীকে পরিহার করিয়াই চলিত। কিন্তু মুসলমানদের হৃদয় জানিবার জন্য গান্ধীজীর আগ্রহ ও ধৈর্য অপরিসীম।

প্রার্থনা-সভায় গান্ধীজী কর্তৃক কোরান-ব্যাখ্যার প্রতিবাদ করিয়া বিভিন্ন প্রদেশ ও স্থানীয় লীগ নায়কদের নিকট হইতে বহু পত্র তাঁহার নিকট পৌঁছিয়াছে। বহু গ্রামেও নেতৃস্থানীয় মুসলমানরা গান্ধীজীর সহিত দেখা করিয়া প্রার্থনা-সভায় তাঁহার কোরান ব্যাখ্যা করা যে মুসলমানদের ধর্মনীতি-বিরুদ্ধ কাজ তাহা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহাদের সকলেরই যুক্তির সারমর্ম এই যে—হিন্দুদের প্রার্থনা-সভায় মুসলমানদের যোগ দেওয়া মুসলিম সংস্কৃতি ও ধর্মবিরুদ্ধ কাজ। তাঁহারা গান্ধীজীকে হিন্দুদের 'অবতার' বলিয়া মনে করেন। সুতরাং হিন্দু হইয়া মুসলমান ধর্মগ্রন্থ কোরান ব্যাখ্যা করিয়া মুসলমানদের শুনান তাঁহার পক্ষে অনধিকারচর্চা নহে কি? গান্ধীজী ধৈর্যের সহিত তাঁহাদের সমস্ত যুক্তি শ্রবণ করেন। মৃদু হাস্য ও ঘন ঘন মস্তক সঞ্চালন করিয়া তাঁহাদের অন্তরে যে অভিযোগ সঞ্চিত হইয়া আছে তাহা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশে উৎসাহ দেন। গান্ধীজী তাঁহাদের অন্তর জানিতে চাহেন। সেখানে তাঁহার জন্য ধিক্কারই জমা থাক অথবা তাঁহার জন্য প্রেমই সঞ্চিত হইয়া থাক, তিনি প্রশান্ত ও স্থিরচিত্তে তাহা গ্রহণ করেন। তাঁহাদের হৃদয় না জানিলে তিনি তাহা জয় করিবেন কি প্রকারে। যখনই তাঁহাকে তাঁহাদের সহিত কথাবার্তা, আলাপ-আলোচনা করিতে দেখিয়াছি তখনই একটি জিনিস বিশেষ-ভাবে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। সেটি হইতেছে মুসলমানদের হৃদয় জানিবার জন্য গান্ধীজীর অসীম আগ্রহ। তাঁহাদের অভিযোগের উত্তরে গান্ধীজী বলিয়াছেন—রক্তেমাংসে গঠিত অন্যান্য মানুষের মত তিনিও একজন অতি সাধারণ মানুষ। তিনি অবতার বা ধর্মগুরু নহেন। প্রার্থনা-সভায় মুসলমান-দের সম্পর্কে তিনি বলেন—যদি কোন্ মুসলমান-ভাই সভায় যোগদান করা পছন্দ না করেন, তাহা হইলে তিনি আসিবেন না। গান্ধীজী তাঁহাদের আরও বলেন—বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ হইতে প্রার্থনার সময় আবৃত্তি করা হয়। একজন মুসলমান বন্ধুর অনুরোধক্রমেই তিনি মুসলমান ধর্মগ্রন্থ হইতে একটি অংশ প্রার্থনা-সভায় আবৃত্তি করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। কারণ বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে পার্থক্য আছে এইরূপ ধারণা বদ্ধমূল হইলেও আসলে ঈশ্বর এক; খোদাও যে, রামও সে। কোরানশরীফেও লিখিত আছে, খোদার নাম গণনা করিয়া শেষ করা যায় না। তাঁহার অনেক মুসলমান বন্ধু আছেন তাঁহারা কখনই তাঁহার কোরান-

ব্যাখ্যা বা কোরান হইতে আবৃত্তি করিয়া মুসলমানদের শুনানকে অনধিকার-চর্চা বলিয়া মনে করেন না। তাঁহারাও খাঁটি মুসলমান। প্রার্থনা-সভায় যোগদান করিলে মুসলমানদের ধর্মচ্যুতির কোন সম্ভাবনা আছে বলিয়া তিনি বিশ্বাস করেন না। তিনি দেখিতে চাহেন, হিন্দুরা খাঁটি হিন্দু হউন এবং মুসলমানরা খাঁটি মুসলমান হউন।

মৌলভী ও নেতৃস্থানীয় মুসলমানগণ যাঁহারা গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাদের অভিযোগ পেশ করেন, গান্ধীজীর উত্তর তাঁহাদের মধ্যে কাহারও নিকট মনঃপূত হয়, আবার কেহ কেহ যে মোটেই সন্তুষ্ট হইতে পারেন না তাহাও বেশ বুঝা যায়। এই তো গেল ধর্মান্ধ মোল্লা ও নেতৃস্থানীয় মুসলমানদের কথা। কিন্তু গান্ধীজীর উপস্থিতি সরল অশিক্ষিত পল্লীবাসী মুসলমানদের মনে ধীরে ধীরে কিভাবে ক্রিয়া করিয়াছে তাহাই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। গান্ধীজীর এই পরিক্রমা তাহারা সূচনা হইতে কিভাবে গ্রহণ করিতে করিতে চলিয়াছে তাহাই দেখিবার বিষয়। কারণ তাহারাই গ্রামের মেরুদণ্ডস্বরূপ। তাহারা তাহাদের অনুরূপ দরিদ্র হিন্দু প্রতিবেশীদের সহিত একসঙ্গে নীড় বাঁধিয়া স্থায়িভাবে গ্রামে বসবাস করিতেছে।

গান্ধীজী যে জাতিধর্মনির্বিশেষে সকল মানুষের দরদী বন্ধু, মানুষমাত্রেরই কল্যাণকামী, নোয়াখালির মুসলমান সম্প্রদায়ের নিকট তাহা ক্রমশঃই স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। গান্ধীজী যে গ্রামেই গিয়াছেন সেখানেই সকলের সহিত অবাধে মেলামেশা করিয়াছেন। মুসলমানদের বাড়ীতে তাঁহার নিমন্ত্রণের সংখ্যা ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছিল। তিনি কখনই কাহাকেও বিমুখ তো করেনই নাই, বরং অত্যন্ত আগ্রহের সহিত সকলের আমন্ত্রণ রক্ষা করিয়াছেন। তাহাদের বাড়ী গিয়া তাহাদের সুখ-দুঃখের খোঁজ-খবর লইয়াছেন। পরম আত্মীয়ের ন্যায় তাহাদের সহিত কথাবার্তা বলিয়াছেন। বাটীর শিশু ও বালক-বালিকাদের সহিত রসিকতা করিয়া সময় সময় গাম্ভীর্যপূর্ণ আবহাওয়াকে হালকা, হাস্যমুখর ও আনন্দমধুর করিয়া তুলিয়াছেন।

পল্লীবাসী মুসলমানরা গান্ধীজীর দরদী হৃদয়ের পরিচয় পাইয়া ক্রমশঃই তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইতেছিলেন। প্রার্থনা-সভায় মুসলমানগণ অধিক সংখ্যায় যোগদান করিতেছিলেন। প্রার্থনা-সভায় ও গান্ধীজীর পরিক্রমার পথে "রাম ও রহিম," "কৃষ্ণ ও করিম", "ঈশ্বর ও আল্লা," প্রভৃতি নামকীর্তনে মুসলমানদের

প্রতিবাদের তীব্রতাও ক্রমে শিথিল হইয়া আসিতেছিল। মুষ্টিমেয় স্বার্থান্বেষীদের অপপ্রচার ও দুর্বৃত্তপ্রকৃতির কতক লোকের পক্ষে দুষ্কর্মের প্রশ্রয় দেওয়া ছাড়া সাধারণ পল্লীবাসী মুসলমানদের মধ্যে ক্রমশঃই সহিষ্ণুতার ভাব দেখা দিতেছিল। এমন সময় গান্ধীজীর ডাক আসিল বিহার হইতে।

গান্ধীজী প্রথম হইতেই বলিয়া আসিয়াছেন যে, বিহার সরকারের সহিত তিনি বরাবর যোগাযোগ রক্ষা করিয়া চলিতেছেন এবং বিহার সরকারের কাজে তিনি সন্তুষ্ট আছেন বলিয়াই বিহার যাওয়া প্রয়োজন মনে করেন নাই। প্রয়োজনবোধে তিনি নিশ্চয়ই বিহার যাইবেন। গান্ধীজী পুনঃপুনঃ এ সঙ্কল্পও প্রকাশ করেন যে, সাধনায় সিদ্ধিলাভ না হওয়া পর্যন্ত তিনি নোয়াখালি ত্যাগ করিবেন না। আবশ্যক হইলে তিনি নোয়াখালির মাটিতেই প্রাণ দিবেন।

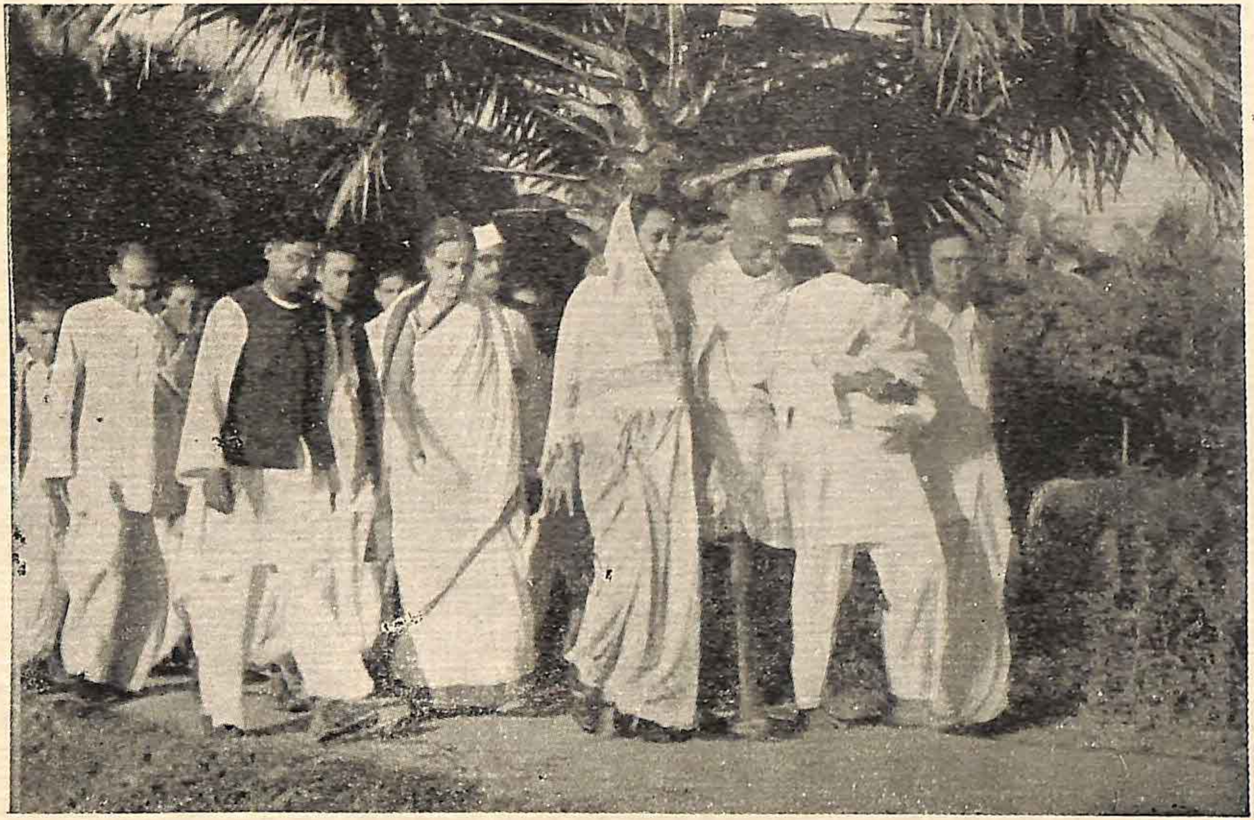
বিহার রওনা হওয়ার প্রাক্কালে গান্ধীজী বলিলেন—যেজন্য আমি নোয়াখালি ও ত্রিপুরায় আসিয়াছিলাম, সেই একই উদ্দেশ্যে আজ বিহারে যাইতেছি।... ... আমি আশা করিয়াছিলাম বাংলায় থাকিয়াই বিহারের হিন্দুদের যথেষ্ট প্রভাবান্বিত করিতে পারিব। কিন্তু বিহার হইতে ডাঃ সৈয়দ মামুদ এক দীর্ঘ পত্রসহ তাঁহার সেক্রেটারীকে পাঠাইয়া আমাকে বিহার যাইতে অনুরোধ করিয়াছেন। তাঁহার পত্র পাইয়াই আমি পূর্ববঙ্গের কাজ অসমাপ্ত রাখিয়াই বিহার রওনা হইয়াছি।

মহাত্মার পূর্ববঙ্গে আরব্ধ কাজ এখনও শেষ হয় নাই। পূর্ববঙ্গ ছাড়িয়া আসিলেও গান্ধীজী সেই একই পরীক্ষায় ব্যাপৃত আছেন—কেবল অবস্থার চাপে পড়িয়া তাঁহাকে মাঝে মাঝে পরীক্ষাগারের পরিবর্তন করিতে হইতেছে।

মহাত্মার এই পরীক্ষা সাফল্যের গৌরবে মণ্ডিত হইয়া উঠুক ভারতের জাতীয়তাবাদী ও শান্তিকামী নরনারীমাত্রের তাহাই অন্তরের একান্ত কামনা। তাহারা উন্মুখ হইয়া সেইদিনের প্রতি চাহিয়া আছে।

কলিকাতা: ১৩৫৪ বঙ্গাব্দ

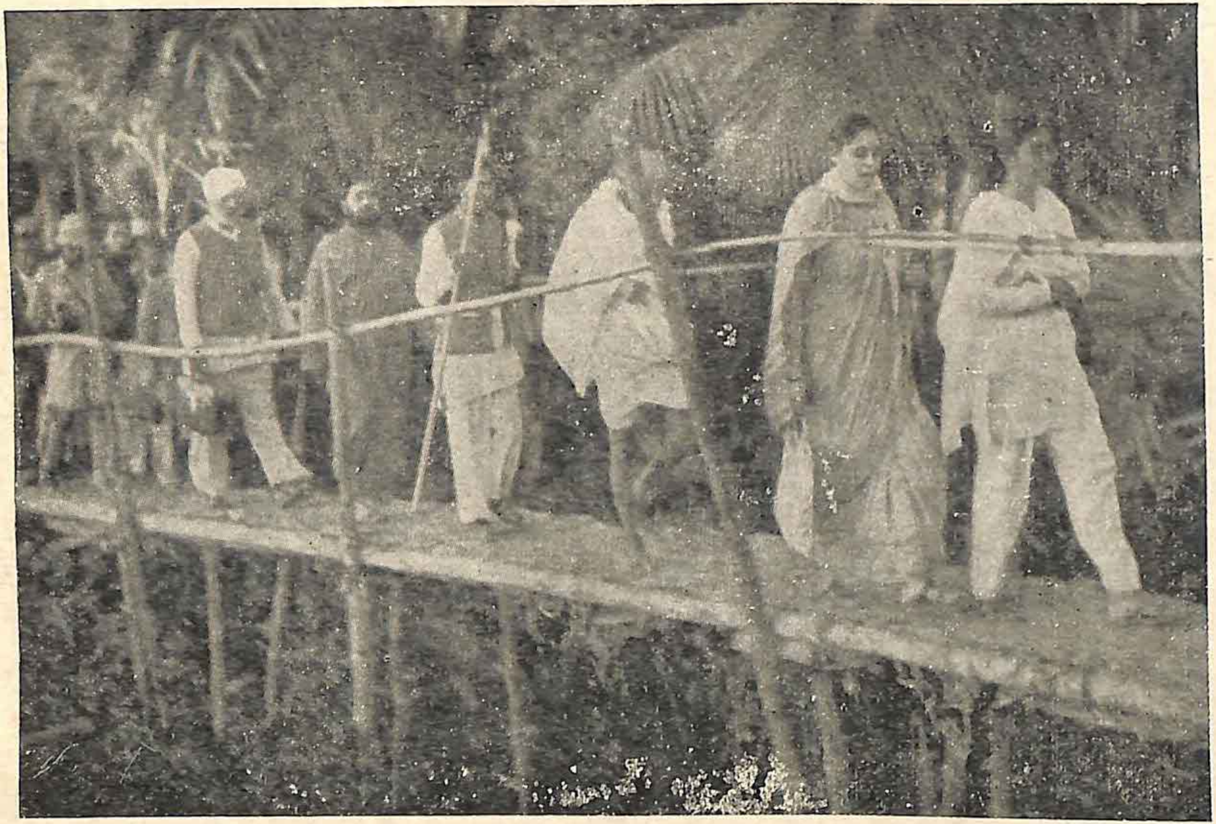
গ্রন্থকার



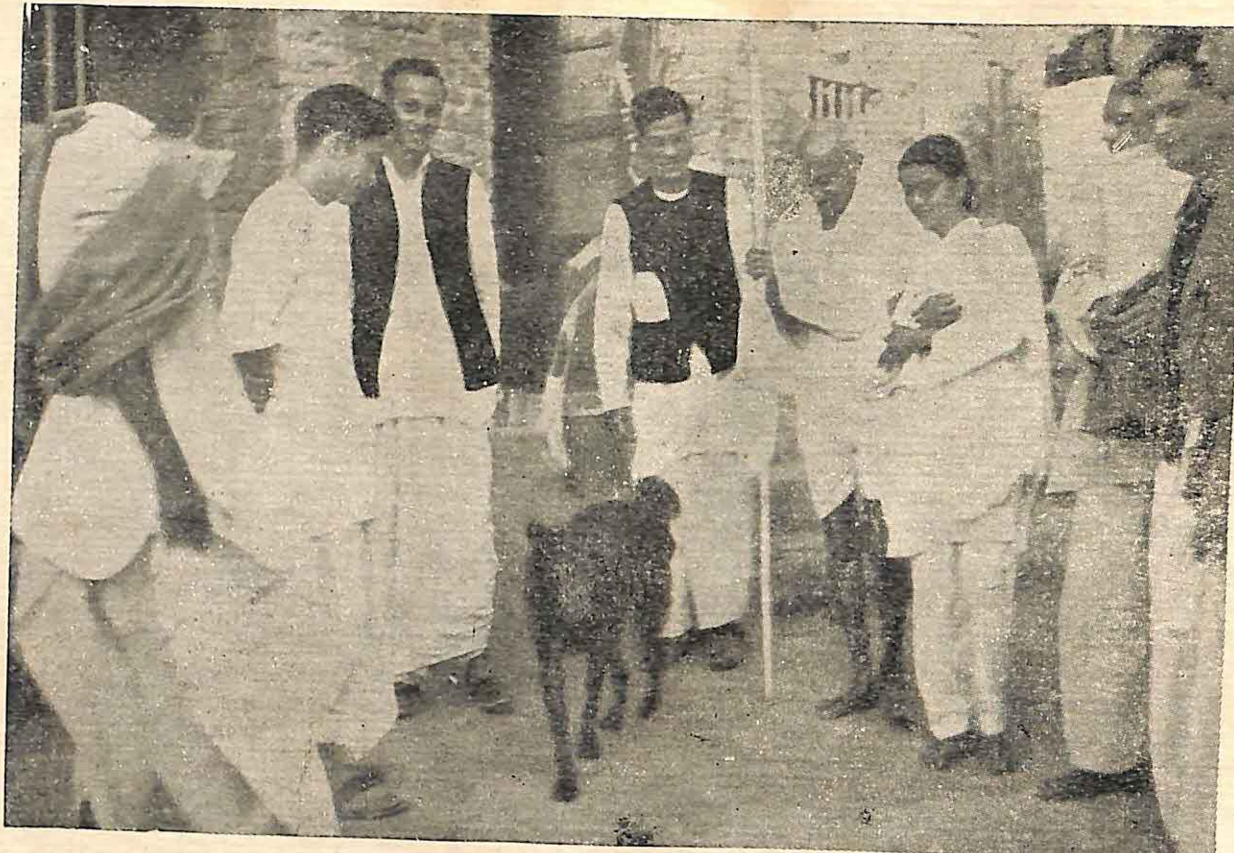
নোয়াখালি পরিক্রমায় গান্ধীজীর সঙ্গে অধ্যাপক নির্মলকুমার বসু ও গ্রন্থকার



নোয়াখালির জঙ্গলীপথে গান্ধীজী সীমান্ত গান্ধী আবদুল গফরখান্ সঙ্গে গ্রন্থকার ও সুধীর ঘোষ



রামধুন গাহিতে গাহিতে গান্ধীজী সাথীদের লইয়া বাঁশের সাঁকো পার হইতেছেন



নোয়াখালি পরিক্রমায় গান্ধীজীর প্রভুভক্ত কুকুর ও গ্রন্থকার

হাঙ্গামার সংক্ষিপ্ত বিবরণ

১৯৪৬ সালের ১০ই অক্টোবর নোয়াখালিতে প্রায় ২০০ বর্গমাইল স্থান ব্যাপিয়া দুইদলে বিভক্ত ২০,০০০ হাজারের অধিক লোক অন্যান্য খণ্ডদলের সাহায্যে ব্যাপক ও বেপরোয়া আক্রমণ আরম্ভ করে। রাজনৈতিক উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য পূর্বপরিকল্পিত পন্থা অনুযায়ী এই আক্রমণ আরম্ভ করা হইয়াছিল। আক্রমণকারীদের সর্বজনমান্য নেতৃবৃন্দ বক্তৃতার দ্বারা ও অস্ত্রাদি সরবরাহ করিয়া তাহাদের উৎসাহ দিয়াছিলেন। আক্রমণ সামরিক কায়দায় ও সরকার-নিয়ন্ত্রিত পেট্রোলাদি সহযোগে চালান হইয়াছিল। অবিকল সামরিক আক্রমণের অনুরূপভাবে পূর্বেই সেতু, পথ ও ডাকঘর প্রভৃতি বিনষ্ট করিয়া যোগাযোগের পথ বিচ্ছিন্ন করিয়া দেওয়া হয়। আক্রমণের কয়েকদিন পূর্ব হইতেই রামগঞ্জ থানার অধিবাসী জনৈক ভূতপূর্ব এম. এল. এ. কয়েকটি স্থানে বড় বড় সভায় উত্তেজনাকর বক্তৃতা দেন। তিনি নোয়াখালি জেলার একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি। আক্রমণের ভয়াবহ পরিণতির জন্য স্থানীয় অধিবাসীদের মতে এই এম. এল. এ.-র দায়িত্বই সর্বাপেক্ষা বেশী।

সর্বাত্মক আক্রমণের প্রথম পর্যায় সুসম্পন্ন হওয়ার পূর্বে যাহাতে সংবাদ বাহিরে না পৌছায়, আক্রমণকারীদের প্রাদেশিক নেতৃবৃন্দ তাহার এমন সুব্যবস্থা করিয়াছিলেন যে, আক্রমণ সুরু হওয়ার ৫ দিন পর প্রথম উহার সংবাদ রাজধানীতে পৌছায়। নোয়াখালির অত্যাচারের কাহিনী প্রচারিত হইলে প্রাদেশিক ও সর্বভারতীয় নেতৃবৃন্দ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করিয়া যে সমস্ত বিবৃতি দেন এবং সংবাদপত্র ও সংবাদ-প্রতিষ্ঠানের মারফত যে সমস্ত সংবাদ ও প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণ প্রকাশিত হয় তাহা হইতেই বীভৎসতার নগ্নরূপ প্রকটিত হইয়া উঠে।

বঙ্গীয় প্রেস এ্যাডভাইসারী কমিটি ১৫ই অক্টোবর সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য নিম্নোক্ত বিজ্ঞপ্তি দেন :—

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার কংগ্রেসদলের নেতা শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার দত্ত ও

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপরিষদের কংগ্রেসদলের সহকারী নেতা শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত যুক্তভাবে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সভাপতির নিকট এক 'তার' করেন। বঙ্গীয় প্রেস এ্যাডভাইসারী কমিটি উহার মর্ম প্রকাশ করেন।

তারে বলা হয় যে, নোয়াখালি জেলার রামগঞ্জ থানার অধীন কয়েকটি গ্রামে আগুন লাগাইয়া দেওয়ায় নিরীহ গ্রামবাসীদের প্রাণ ও সম্পত্তি নাশ হইয়াছে। বেগমগঞ্জ ও লক্ষ্মীপুর থানার কোনও কোনও অঞ্চলেও হাঙ্গামা দেখা দিয়াছে। সহস্র সহস্র গুণ্ডাপ্রকৃতির লোক গ্রামবাসীদের আক্রমণ করিয়া তাহাদিগকে গোহত্যা করিতে ও নিষিদ্ধ খাদ্য ভক্ষণ করিতে বাধ্য করিয়াছে। তাহাদের ঘরবাড়ী সব জ্বালাইয়া দেওয়া হইয়াছে। শত শত গ্রামবাসীকে পোড়াইয়া মারা হইয়াছে ও আরও শত শত লোককে অন্যভাবে হত্যা করা হইয়াছে। বহু স্ত্রীলোককে অপহরণ করা হইয়াছে ও বলপূর্বক বিবাহ করা হইয়াছে। উপদ্রুত গ্রামসমূহে উপাসনা-স্থানগুলি সবই অপবিত্র করা হইয়াছে। অসহায় গ্রামবাসিগণ ত্রিপুরা জেলাতে চলিয়া আসিতেছে। নিরীহ গ্রামবাসীদের প্রাণনাশ ও সম্পত্তির ব্যাপক ধ্বংস নিবারণ করার জন্য জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট ও নোয়াখালির পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেট কিছুই করেন নাই। প্রায় দুইশত বর্গমাইল পরিমিত উপদ্রুত অঞ্চলে কাহাকেও যাইতে দেওয়া হইতেছে না, ঐ এলাকা হইতে কাহাকেও আসিতেও দেওয়া হইতেছে না। এই সকল অঞ্চলে যাইবার পথগুলিতে মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত গুণ্ডারা সতর্ক পাহারা দিতেছে। এখনও যে সকল লোক বাঁচিয়া আছে ও যে সকল স্ত্রীলোককে অপহরণ করা হইয়াছে তাহাদিগকে অবিলম্বে উদ্ধার করা একান্ত প্রয়োজন। সামরিক সাহায্য ব্যতীত তাহাদের উদ্ধার করা অসম্ভব। পার্শ্ববর্তী ত্রিপুরা জেলায় গোলযোগ বিস্তৃতি লাভ করিতেছে, ফলে ত্রিপুরার দক্ষিণাঞ্চলে অবস্থা অত্যন্ত বিপজ্জনক হইয়া উঠিতেছে। ১০ই অক্টোবর হইতে এই গোলযোগ আরম্ভ হয় ও সুসংগঠিত পরিকল্পনানুযায়ী নরহত্যা, লুঠতরাজ ও অগ্নিসংযোগের তাণ্ডব চলে। নোয়াখালি, ত্রিপুরা ও চট্টগ্রাম জেলায় অবিলম্বে সৈন্য মোতায়েন করা একান্ত প্রয়োজন। উদ্ধার ও পুনঃ-সংস্থাপন আশু কর্তব্য। কয়েকটি স্থানের অধিবাসীদের যেরূপ ব্যাপকভাবে ধর্মান্তরিত করা হইয়াছে; যে বিপুল সংখ্যক লোক নিহত হইয়াছে, যে বিরাট পরিমাণ ক্ষতি হইয়াছে ও যে সংখ্যক স্ত্রীলোক অপহৃতা হইয়াছে, তাহাতে কলিকাতার দাঙ্গা নিতান্ত তুচ্ছ বলিয়া মনে হইবে। সর্বশেষ সংবাদে প্রকাশ, নোয়াখালির আরও কয়েকটি থানায় হাঙ্গামা ছড়াইয়া

পড়িতেছে। ত্রিপুরা জেলার হাজিগঞ্জ, ফরিদগঞ্জ, ও লাক্সাম থানার কোনও কোনও স্থানেও গোলযোগ দেখা দিয়াছে। যে পুলিস ও সৈন্যদল মোতায়েন করা হইয়াছে তাহা নিতান্তই অপ্রচুর। গুণ্ডার দল সংবাদ আদান-প্রদানের সকল পথ বিচ্ছিন্ন করিয়াছে ও রাস্তাঘাট ও সেতুসমূহ ধ্বংস করিয়া চলিতেছে। অবিলম্বে এই ব্যাপক হত্যা ও ধ্বংসলীলা বন্ধ না করা হইলে চট্টগ্রাম বিভাগ সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হইয়া যাইবে। উপদ্রুত অঞ্চলসমূহে সামরিক আইন জারী করা একান্ত প্রয়োজন।

বাংলা সরকারের ১৫ই অক্টোবর বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয় যে, নোয়াখালি জেলার রামগঞ্জ, লক্ষ্মীগঞ্জ এবং বেগমগঞ্জে অরাজকতা চলিতেছে। ফেণীর অবস্থা আয়ত্তে আনা হইয়াছে এবং উহা এখন শান্ত আছে।

উপদ্রুত অঞ্চলসমূহে শান্তি ফিরাইয়া আনিবার জন্য কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে। দুই জায়গায় পুলিস গুলী চালাইয়াছে এবং ১৪৪ ধারা জারী করা হইয়াছে।

ত্রিপুরা জেলার হাজিগঞ্জ এলাকায় গোলযোগের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। ১৩ই এবং ১৪ই অক্টোবর রাত্রিতে পুলিস গুলী চালাইয়া ৫ জন লুণ্ঠনকারীকে নিহত করে। লুণ্ঠনকারীদের ৩ জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

আরও সশস্ত্র পুলিস নোয়াখালি এবং ত্রিপুরায় পাঠান হইয়াছে।

অসামরিক সরবরাহসচিব আজ সকালে পূর্ববঙ্গ অভিমুখে রওনা হইয়াছেন।

এক সাংবাদিক সম্মেলনে বাংলার প্রধান মন্ত্রী মিঃ সুরাবর্দী বলেন যে, উপদ্রুত অঞ্চলে হাঙ্গামা ও অত্যাচার যথার্থই গুরুতর। তিনি আরও বলেন যে, হাঙ্গামা দমনের জন্য দুই দফা সৈন্য প্রেরণ করা হইয়াছে। নোয়াখালিতে যে সকল সৈন্য গিয়াছে, উপদ্রুত এলাকায় যাইতে তাহাদের কিছু অসুবিধা হইতে পারে; কেননা খালসমূহ বাঁধ দিয়া বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং সেতুসমূহ বিধ্বস্ত ও রাস্তাগুলি অবরুদ্ধ করা হইয়াছে।

পরিষদে প্রশ্নোত্তর

১৯৪৭ সালের পয়লা মে, বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে অক্টোবর হাঙ্গামার সময় নোয়াখালি ও ত্রিপুরা জেলায় **প্রাণহানি ও ক্ষতির সরকারী হিসাব** সম্পর্কে প্রশ্নোত্তরকালে ঐ দুইটি জেলার মৃত্যুসংখ্যা ও ক্ষতির সরকারী হিসাব জানিতে পারা যায়।

পরিষদে কংগ্রেসদলের ডেপুটি লীডার শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের এক প্রশ্নের উত্তরে স্বরাষ্ট্রসচিবের পার্লামেণ্টারী সেক্রেটারী মিঃ কে. নসরুল্লা জানান যে, নোয়াখালি ও ত্রিপুরা জেলায় হাঙ্গামা সম্পর্কে মোট ২৮৫ জন মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। তন্মধ্যে মিলিটারী ও পুলিসের গুলীতে ৬৭ জন মারা যায়। হাঙ্গামায় নোয়াখালিতে ১৭৮ জন ও ত্রিপুরায় ৪০ জনের মৃত্যু হয়।

দুইটি জেলায় মোট ৪৪৩৬টি গৃহ লুণ্ঠিত ও ২৫৯৯টি গৃহ ভস্মীভূত হয়। ইহা ছাড়া ত্রিপুরা জেলায় ৬৫২০টি কুটীর ভস্মীভূত হয়।

উপরি-উক্ত জেলা দুইটিতে বলপূর্বক কত লোককে ধর্মান্তরিত করা হইয়াছে এই প্রশ্নের উত্তরে মিঃ নসরুল্লা বলেন যে, নোয়াখালির হিসাব জানা যায় নাই, তবে এই সংখ্যা নিশ্চয়ই হাজার হাজার হইবে। ত্রিপুরায় এইরূপ ধর্মান্তরিত লোকের সংখ্যা ছিল ৯৮৯৫।

অপর এক প্রশ্নের উত্তরে মিঃ নসরুল্লা বলেন যে, হাঙ্গামা সম্পর্কে নোয়াখালিতে ১০৬১ জনকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং তন্মধ্যে ইতিমধ্যে ৯০৯ জনকে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। ত্রিপুরায় ১১৩৬ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়, তন্মধ্যে এযাবৎ ৯১২ জনকে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে।

উল্লিখিত জেলা দুইটিতে অপহৃতা নারীর সংখ্যা কত, শ্রীযুক্ত দত্ত তাহা জানিতে চাহিলে, মিঃ নসরুল্লা বলেন যে, নোয়াখালি হইতে দুইজন স্ত্রীলোক অপহৃতা হইয়াছিল বলিয়া সংবাদ পাওয়া যায়। তন্মধ্যে একজনকে পাওয়া গিয়াছে। ত্রিপুরা হইতে এইরূপ ৫টি ঘটনার সংবাদ পাওয়া যায়। ইহাদের সকলকেই পাওয়া গিয়াছে।

নোয়াখালি ও ত্রিপুরা জেলায় মৃত্যুসংখ্যা ও ক্ষয়-ক্ষতির সরকারী হিসাবের বিস্তৃত বিবরণ নিম্নে দেওয়া হইল :—

নোয়াখালি

লক্ষ্মীপুর থানা এলাকায় ৯২৯টি গৃহ লুণ্ঠিত এবং ৩৯২টি গৃহ ভস্মীভূত হয়। হাঙ্গামার ফলে ৩৩ জনের মৃত্যু হয় এবং পুলিস ও মিলিটারীর গুলীতে ১ জন মারা পড়ে।

রামগঞ্জ থানা অঞ্চলে ২৩৮টি গৃহ ভস্মীভূত ও ৬১০টি গৃহ লুণ্ঠিত হয়। হাঙ্গামায় ৬৯ জন নিহত হয় এবং পুলিস ও মিলিটারীর গুলীতে ২১ জন মারা পড়ে।

বেগমগঞ্জ থানা অঞ্চলে হাঙ্গামার ফলে ৩১ জন নিহত হয় এবং ১৯৭টি গৃহ লুণ্ঠিত ও ৭৯টি গৃহ ভস্মীভূত হয়। পুলিস ও মিলিটারীর গুলীতে ৫ জনের মৃত্যু হয়।

রায়পুর থানা এলাকায় হাঙ্গামার ফলে ২৬ জনের মৃত্যু হয় এবং পুলিস ও মিলিটারীর গুলীতে ৬ জন নিহত হয়। ১২৩টি গৃহ ভস্মীভূত ও ৪৭৮টি গৃহ লুণ্ঠিত হয়।

সন্দীপ থানা অঞ্চলে হাঙ্গামায় ২৪ জন নিহত হয়, পুলিস ও মিলিটারীর গুলীবর্ষণের ফলে ৯ জন মারা পড়ে। ৪৯টি গৃহ ভস্মীভূত ও ৫২টি গৃহ লুণ্ঠিত হয়।

নোয়াখালির মোট হিসাব এইরূপ :—৮৮১টি গৃহ ভস্মীভূত ও ২,২৬৬টি গৃহ লুণ্ঠিত হয় ; হাঙ্গামায় ১৭৮ জন নিহত হয় এবং পুলিস ও মিলিটারীর গুলীতে ৪২ জন মারা পড়ে।

ত্রিপুরা

চাঁদপুর থানায় ১০৫৫টি গৃহ ও ৩,৩৫৩টি কুটীর ভস্মীভূত এবং ১,৫৮০টি গৃহ লুণ্ঠিত হয়। এই থানায় হাঙ্গামায় ১৬ জনের এবং পুলিসের গুলীতে ২ জনের মৃত্যুর সংবাদ পাওয়া যায়।

চৌদ্দগ্রাম থানা অঞ্চলে ৫টি গৃহ ও ৫টি কুটীর ভস্মীভূত এবং ৪৮টি গৃহ লুণ্ঠিত হয়। পুলিসের গুলীতে ৪ জনের মৃত্যু হয়।

ফরিদগঞ্জ থানা অঞ্চলে হাঙ্গামার ফলে ১৯ জনের মৃত্যু এবং হাঙ্গামাকালে ৬৩৪টি গৃহ এবং ৩০৩৫টি কুটীর ভস্মীভূত হয়, ৩৯৩টি গৃহ লুণ্ঠিত হয়। পুলিসের গুলীতে ৬ জন এবং মিলিটারীর গুলীতে ২ জনের মৃত্যু হয়।

লাকসাম থানায় ৭৭টি গৃহ লুণ্ঠিত এবং ৪টি গৃহ ও ৯টি কুটীর ভস্মীভূত হয়।

হাজিগঞ্জ থানায় ২০টি গৃহ ও ১১৮টি কুটীর ভস্মীভূত এবং ২৩টি গৃহ লুণ্ঠিত হয়। পুলিস ও মিলিটারীর গুলীতে ৯ ব্যক্তি মারা পড়ে।

বুড়িচঙ্গে ৪৯টি গৃহ লুণ্ঠিত হয়।

কচুয়া থানায় হাঙ্গামা সম্পর্কে ৫ জনের মৃত্যুসংবাদ পাওয়া যায়।

দেবীদ্বার থানা হইতে পুলিসের গুলী-চালনার ফলে ২ ব্যক্তির মৃত্যু-সংবাদ পাওয়া যায়।

ত্রিপুরা জেলার হাঙ্গামায় মোট হিসাবে এইরূপ :—১,৭১৮টি গৃহ ও ৬,৫২০টি কুটীর ভস্মীভূত এবং ২১৭০টি গৃহ লুণ্ঠিত হয়। হাঙ্গামার ফলে ৪০ জনের মৃত্যু হয় এবং পুলিস ও মিলিটারীর গুলীতে ২৫ জন মারা পড়ে।

রাষ্ট্রপতি কৃপালনী

রাষ্ট্রপতি আচার্য কৃপালনী নোয়াখালির উপদ্রুত অঞ্চল পরিদর্শন করিয়া ফিরিয়া আসিবার পর তথাকার অবস্থা সম্পর্কে ২৬শে অক্টোবর এক সাংবাদিক সম্মেলনে একটি বিবৃতি প্রদান করেন। অবস্থা স্বচক্ষে পরিদর্শন করিয়া ও বিভিন্ন সূত্র হইতে স্বয়ং তথ্য সংগ্রহ করিয়া আক্রমণের উদ্যোক্তা, তাহাদের উদ্দেশ্য ও অনুসৃত কর্মপন্থা এবং ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ সম্বন্ধে তিনি কতকগুলি সিদ্ধান্তে আসিয়া উপনীত হন। তিনি বলেন, তাঁহার গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ সত্য ও সঠিক ; সাক্ষীদিগকে তাঁহাদের নিরাপত্তা সম্বন্ধে নিশ্চয়তা দিলে নিরপেক্ষ ট্রাইবুন্যালের সম্মুখে তাঁহার সিদ্ধান্তগুলির সত্যতা অতি সহজে প্রমাণিত হইতে পারে।

আচার্য কৃপালনী নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তসমূহে পৌছেন :—

(১) নোয়াখালি ও ত্রিপুরা জেলায় হিন্দুদের উপর পূর্ব হইতেই পরিকল্পনা করিয়া আক্রমণ চালানো হয়। মুসলিম লীগ সাক্ষাৎভাবে এই আক্রমণ না বাধাইলেও মুসলিম লীগের প্রচারকার্যের ফলে ইহা সংঘটিত হইয়াছে। স্থানীয় লোকদের সাক্ষ্য হইতে ইহাই প্রমাণিত হইয়াছে যে, এই আক্রমণে বিভিন্ন গ্রামের বিশিষ্ট লীগ-নেতাদের অনেকখানি হাত ছিল।

(২) বিপদের আশঙ্কা জানাইয়া কর্তৃপক্ষকে সতর্ক করা হইয়াছিল। সংশ্লিষ্ট এলাকাসমূহের বিশিষ্ট হিন্দুরা প্রথমে মৌখিকভাবে পরে লিখিতভাবে কর্তৃপক্ষকে সতর্ক করিয়াছিলেন।

(৩) যে আয়োজন উদ্যোগ চলিতেছিল, তাহার সহিত কয়েকজন মুসলমান সরকারী কর্মচারীর যোগাযোগ ছিল। কয়েকজন উৎসাহ দিয়াছিলেন।

মুসলমানদের মধ্যে সাধারণভাবে একটা বিশ্বাস ছিল যে, হিন্দুদের বিরুদ্ধে কোন কিছু করিলে গভর্নমেণ্ট কিছু বলিবেন না।

(৪) কয়েক শত লোকের এক একটা দল বিভক্ত হইয়া হিন্দু-গ্রাম অথবা হিন্দু-মুসলমানমিশ্রিত গ্রামের হিন্দু বাড়ীগুলি আক্রমণ করাই ছিল আক্রমণকারীদের কার্যপদ্ধতি। দলে এক-একজন দলপতি ও মুখপাত্র

থাকিত। তাহারা প্রথমে মুসলিম লীগের এবং কোথাও কোথাও বা কলিকাতার দাঙ্গায় ক্ষতিগ্রস্তদের নাম করিয়া চাঁদা আদায় করিত। এইভাবে জবরদস্তি করিয়া তাহারা বহু টাকা আদায় করে এবং আদায়ের পরিমাণ কোথাও কোথাও দশ হাজার টাকাও ছাড়াইয়া যায়। চাঁদা দিয়াও হিন্দুরা নিস্তার পায় নাই। চাঁদা আদায় করার পর ঐ দলই বা পরবর্তী দল আসিয়া হিন্দু-বাড়ীগুলি লুঠ করিতে থাকে। অধিকাংশ লুণ্ঠিত বাড়ীতেই আগুন ধরাইয়া দেওয়া হয়। দুর্বৃত্তেরা কেবলমাত্র নগদ টাকা, অলঙ্কার ও অন্যান্য মূল্যবান দ্রব্য লুণ্ঠন করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই; গৃহস্থদের ব্যবহারে যাহা কিছু লাগিতে পারে—আহার্য, বাসনপত্র, কাপড়চোপড় কিছুই বাদ দেয় নাই। অনেক স্থলে লুণ্ঠিত গরুবাছুর ইত্যাদি গৃহপালিত জন্তুগুলিও নিজেরাই তাড়াইয়া লইয়া যায়। কোথাও কোথাও কোন বাড়ী লুঠ করার আগে বাড়ীর লোক-জনদের ইসলামধর্ম গ্রহণ করিতে বলা হয়। কিন্তু ধর্মান্তর গ্রহণ করিয়াও তাঁহারা লুণ্ঠন ও অগ্নিসংযোগ হইতে রেহাই পান নাই।

(৫) আক্রমণকারী জনতা **লীগ জিন্দাবাদ, পাকিস্থান জিন্দাবাদ, লড়্‌কে লেঙ্গে পাকিস্থান, মারকে লেঙ্গে পাকিস্থান** ইত্যাদি মুসলিম লীগের ধ্বনি করে।

হিন্দুদের এই কথাও বলা হয় যে, কলিকাতার দাঙ্গায় নিহত মুসলমানদের প্রতিশোধ তুলিবার জন্যই এই হত্যা, লুণ্ঠন ও গৃহদাহ চালানো হইতেছে। যাহারা বাধা দেয়, তাহাদের সকলকেই কোতল করা হইয়াছে। দুর্বৃত্তদের হাতে বন্দুক থাকায় কোথাও কোথাও বাধাদানকারীদের গুলী করিয়া মারা হইয়াছে। এই সকল বন্দুক হয় মুসলমান জমিদারদের ছিল, আর না হয় হিন্দুদের নিকট হইতে অপহরণ বা বলপূর্বক কাড়িয়া লওয়া হইয়াছিল। কোথাও কোথাও হিন্দুরা বাধা দান না করা সত্ত্বেও নিহত হইয়াছে।

আমার হাতে সময় অল্প থাকায় কত লোক নিহত হইয়াছে তাহার সংখ্যা নির্ণয় করা সম্ভব হয় নাই। আমার বিশ্বাস গভর্নমেণ্টও সংখ্যা নির্ণয় করেন নাই। জনৈক সরকারী কর্মচারী আমাকে বলেন যে, মাত্র একশত জন মারা গিয়াছে। আরও উচ্চপদস্থ অপর একজন সরকারী কর্মচারী আমাকে বলেন যে, নিহতের সংখ্যা ৫ শতের কাছাকাছি হইবে।

(৬) পার্শ্ববর্তী মুসলমান গ্রামসমূহের অধিবাসীরাই লুঠতরাজ, গৃহদাহ, হত্যাকাণ্ড ও পাইকারীভাবে ধর্মান্তরিতকরণ চালায়। যে যে গ্রামে হিন্দু-

মুসলমান একত্রে বাস করিত, সেই গ্রামের মুসলমানরাই হিন্দুদের বিরুদ্ধে এই সকল কাজে যোগ দেয়। যাহারা এই সকল কাজে যোগদান করিয়াছিল, তাহাদের অনেককেই আক্রান্ত ব্যক্তিরা সনাক্ত করিতে পারিবে। তাহারা আমাকে বহু নামের তালিকা দিয়াছে। বাহির হইতে যদি কোন লোক আসিয়াও থাকে, তাহাদের সংখ্যা খুবই নগণ্য।

(৭) লুঠতরাজ, গৃহদাহ ও হত্যাকাণ্ডের পরও ইসলামধর্ম গ্রহণ না করা পর্যন্ত হিন্দুদের বিপদ কাটে না। প্রাণের দায়ে বাধ্য হইয়া হিন্দুরা পাইকারী-ভাবে ইসলামধর্ম গ্রহণ করে। নূতন ধর্মগ্রহণের চিহ্নস্বরূপ তাহাদের গ্রামের মুসলমানদের ব্যবহৃত সাদা টুপি পরিতে দেওয়া হয়। টুপিগুলির অনেকগুলিই নূতন এবং এইগুলিতে পাকিস্থানের মানচিত্র এবং 'পাকিস্থান জিন্দাবাদ' এবং 'লড়্‌কে লেঙ্গে পাকিস্থান' ছাপ মারা ছিল।

হিন্দুদের শুক্রবারের জুম্মা নমাজে লইয়া যাওয়া হয় এবং তাহাদের নমাজ ও কলমা পড়িতে বাধ্য করা হয়। মহিলাদের শাঁখা ভাঙ্গিয়া ও সিঁদুর মুছিয়া ইসলামে দীক্ষা দেওয়া হয়। ধর্ম পরিবর্তনের চিহ্নস্বরূপ তাহাদের পীর কর্তৃক মন্ত্রপূত বস্ত্র স্পর্শ করিতে বলা হয়। মহিলাদের কলমা পাঠ করিতে হয়। হিন্দুগৃহের সমস্ত দেবমূর্তি ভাঙ্গিয়া ফেলা হইয়াছে এবং উপদ্রুত অঞ্চলের সমস্ত হিন্দু দেবালয় লুণ্ঠিত ও অগ্নিদগ্ধ করা হইয়াছে।

(৮) বলপূর্বক অনেকগুলি বিবাহও হইয়াছে। বর্তমানে এইরূপ বিবাহের সংখ্যা নিরূপণ করা অসম্ভব। শ্রীযুক্তা কৃপালনীর নিকট হইতে বিস্তৃত রিপোর্ট পাইয়া নোয়াখালির ইউরোপীয় ম্যাজিস্ট্রেট একটি বালিকাকে উদ্ধার করেন। দত্তপাড়ায় একটি উদ্ধার-শিবিরে জনৈক স্ত্রীলোক শ্রীযুক্তা কৃপালনীকে সমস্ত ঘটনা বলিয়াছিলেন। বহু নারী অপহৃতা হইয়াছে। কিন্তু আমার হাতে সময় অল্প বলিয়া আমার পক্ষে তাহার সঠিক সংখ্যা নির্ণয় করা সম্ভব হয় নাই।

(৯) ধর্ষিতার সংখ্যা নির্ণয় করাও আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। কিন্তু অনেক স্ত্রীলোক শ্রীযুক্তা কৃপালনীর নিকট তাহাদের প্রতি অত্যাচারের নিদর্শন-স্বরূপ বিবাহিত জীবনের প্রতীক শাঁখা ভাঙ্গিয়া দেওয়ার এবং সিঁদুর মুছিয়া দিবার কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন। একস্থানে দুর্বৃত্তেরা স্ত্রীলোকদের মাটিতে ফেলিয়া পায়ের আঙ্গুল দিয়া তাহাদের সিঁদুর মুছিয়া দেয়।

(১০) এই সকল অঞ্চলের হিন্দুরা ইসলামধর্ম গ্রহণ করুক বা না করুক—কোন অবস্থাতেই নির্ভয়ে বাস করিতে পারিতেছে না।

(১১) লীগ প্রহরীরা উপদ্রুত গ্রামসমূহের প্রবেশপথগুলি আগলাইয়া আছে। কোন কোন ক্ষেত্রে নবদীক্ষিতদের ছাড়পত্র লইয়া গ্রামের বাহিরে যাইতে দেওয়া হইয়াছে। এই সকল ছাড়পত্র আমি দেখিয়াছি।

(১২) হাঙ্গামার সময় যাহারা উপদ্রুত গ্রামের বাহিরে ছিল, তাহারা নিজেদের গ্রামে যাইতে সমর্থ হয় নাই।

(১৩) বহু পরিবারের পুরুষ স্ত্রীলোক বালক-বালিকা নিখোঁজ। তাহাদের সন্ধান লইবার কোন উপায় নাই। গ্রামের পোস্ট-অফিসসমূহেও কোন কাজ হইতেছে না।

(১৪) হাঙ্গামার সময় পুলিস নিষ্ক্রিয় ছিল। তাহারা এখন টহল দিতেছে। তাহারা বলে যে, একমাত্র আত্মরক্ষার প্রয়োজন ছাড়া তাহাদের প্রতি গুলী চালাইবার হুকুম ছিল না এবং এখনও নাই। তাহাদের আত্মরক্ষার কোন প্রয়োজন দেখা দেয় নাই, কারণ তাহারা হাঙ্গামাকারীদের কাজে বাধা দেয় নাই।

২০শে তারিখ পর্যন্ত যে অগ্নিসংযোগ চলিতেছিল তাহার প্রমাণ আমি দিতে পারি। আমি ১৯শে ও ২০শে তারিখে বিমান হইতে চাঁদপুর ও নোয়াখালি অঞ্চলে আগুন জলিতে দেখি। প্রধান মন্ত্রীও ২০শে তারিখে এই আগুনগুলি দেখিয়াছিলেন। কেবলমাত্র ভস্মীভূত গৃহ এবং অসহায় হিন্দুদের আমি দেখিতে পাই। স্বর্বস্বান্ত হিন্দুদের পরিধেয়ও নাই, খাদ্যও নাই।

আমি সরকারী কর্মচারীদের মুখেই শুনিয়াছি যে, ২৫শে তারিখ পর্যন্ত নোয়াখালি অঞ্চলে মাত্র ৫০ জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

একটি প্রশ্নের উত্তরে আচার্য কৃপালনী বলেন যে, পূর্ববঙ্গে যাহা ঘটিতেছে তাহা অর্থনৈতিক কারণে ঘটিতেছে না। কারণ একটিও ধনী মুসলমানের গৃহ লুণ্ঠিত হয় নাই। তাঁহার নিকট ইহা সম্পূর্ণ সাম্প্রদায়িক এবং সম্পূর্ণ একতরফা বলিয়া প্রতিভাত হইয়াছে।

উপসংহারে তিনি প্রত্যেক বাঙ্গালী হিন্দুকে শান্ত ও সংযত থাকিতে অনুরোধ করিয়া বলেন যে, পূর্ববঙ্গের উপদ্রুত অঞ্চলের মর্মান্তিক ঘটনাবলী ভাষায় বর্ণনার অতীত হইলেও তাঁহারা যেন প্রতিশোধের কথা চিন্তা না করেন।

পণ্ডিত নেহরু

পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু কংগ্রেসের অধিবেশনে সাম্প্রদায়িক অবস্থা সম্পর্কিত প্রস্তাবের সমর্থন প্রসঙ্গে বলেন যে, তিনি রক্তপাত ভয় করেন না এবং সাহসের সহিত এই অবস্থার সম্মুখীন হইতে হইবে। তিনি আরও বলেন যে, মুসলিম লীগের ফ্যাসিস্ট নীতি "হিন্দু ফ্যাসিবাদ" নামে আরও একটি প্রতিদ্বন্দ্বী ফ্যাসিবাদের জন্ম দিয়াছে। কংগ্রেস যেরূপ বৃটিশ ফ্যাসিবাদ দূর করিয়াছে, তেমনি এই দ্বিমুখী ভারতীয় ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধেও কংগ্রেস লড়াই করিবে। মুসলিম লীগের কার্যকলাপ হিটলারী পদ্ধতি অনুসারে চলিতেছে।

মীরাট মিউনিসিপ্যাল বোর্ডের পক্ষ হইতে এক সম্বর্ধনা-সভায় পণ্ডিত নেহরু বলেন যে, বাংলা, বিহার, ও যুক্তপ্রদেশের অংশবিশেষে যাহা ঘটিয়াছে তাহা শুধু নির্দোষ নরনারী ও শিশুদের উপরই আক্রমণ নহে, ভারতের প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতিকেও আঘাত করা হইয়াছে।

সর্বশক্তি প্রয়োগ করিয়া এই সকল কাপুরুষোচিত আক্রমণ বন্ধ করিতে তিনি জনসাধারণকে অনুরোধ করেন। তিনি বলেন, একথা ঠিক যে, সৈন্যদল হাঙ্গামা কিছুটা দমন করিতে সক্ষম হইয়াছে। কিন্তু সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা দমনের যথার্থ উপায় হইল দেশের অভ্যন্তরে শান্তি, প্রীতি ও সদিচ্ছার বাণী বহন করিয়া লওয়া। দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন নেতৃবৃন্দকেই তাহা করিতে হইবে। পণ্ডিত নেহরু বলেন, আমি স্বীকার করি যে, যাহারা অপরাধ করিয়াছে, তাহারা সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা দ্বারাই পরিচালিত হইয়াছে। তাহারা সরল পল্লীবাসী, এবং এই ধরনের কার্য যে নিষ্ফল, তাহা তাহারা জানে। বিহারে আমরা তাহাদের নিকট সরাসরি উপস্থিত হইয়াছিলাম এবং অবস্থা আয়ত্তে আনিতেও সক্ষম হইয়াছিলাম। যদি আপনারা আন্তরিকভাবে চেষ্টা করেন, তবে নিশ্চয়ই সফল হইবেন। যদি এজন্য প্রাণ বিসর্জন দিতে হয়, তথাপি এই ত্যাগ সার্থক হইবে।

২৭শে ডিসেম্বর পণ্ডিত নেহরু মহাত্মাজীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য নোয়াখালি যান। শ্রীরামপুরে বক্তৃতাপ্রসঙ্গে তিনি মন্তব্য করেন যে, পূর্ববঙ্গের ঘটনাবলী তাহাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ মসীলিপ্ত করিয়াছে। কোন বিশেষ সম্প্রদায় বা ধর্মাবলম্বী লোকের জন্য কংগ্রেস স্বাধীনতা চায় না, কংগ্রেস সকলের জন্যই স্বাধীনতা চায়। জনসাধারণ এই উদ্দেশ্যের সাফল্যের জন্য সংগ্রাম না করিয়া আত্মকলহে প্রবৃত্ত হইয়াছে দেখিয়া তিনি দুঃখ প্রকাশ করেন।

কলিকাতা প্রত্যাবর্তন করিলে ডাঃ বিধান রায়ের গৃহে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে পণ্ডিত নেহরু বলেন যে, গান্ধীজী তাঁহার কাজের কিছু ফললাভ হইতেছে দেখিয়া তিনি (গান্ধীজী) আশান্বিত হইয়াছেন। পণ্ডিত নেহরু আরও বলেন যে, তিনি আশ্রয়প্রার্থীদের স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করার পরামর্শ দিয়াছেন।

সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল

কলিকাতা ও নোয়াখালি দাঙ্গা সম্পর্কে মন্তব্যপ্রসঙ্গে সর্দার প্যাটেল বলেন যে, যাহারা ইহার সূত্রপাত করিয়াছিল তাহারা যদি উহার ক্ষয়-ক্ষতির তালিকা প্রস্তুত করে, তাহা হইলে দেখিবে যে, উহাতে কোন লাভ হয় না, আরও রক্তপাতেরই সৃষ্টি হয়। কলিকাতার পর পূর্ববঙ্গেও হাঙ্গামা বাধে। উহা গুণ্ডাদের কাজ বলিয়া গ্রহণ করিতে তিনি পারেন না। ইহা গুণ্ডাদের কাজ নহে। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য ঐরূপ করা হইয়াছে। বলপূর্বক ধর্মান্তরকরণ হত্যা হইতেও মর্মান্তিক।

বাংলার দুর্ভিক্ষে ৩০ লক্ষ লোকের মৃত্যুতে তিনি যতটা ব্যথিত হইয়াছিলেন, এইরূপ বলপূর্বক ধর্মান্তরকরণে তিনি তাহা অপেক্ষা অধিক ব্যথিত হইয়াছেন। বলপূর্বক ধর্মান্তরিত হওয়া অপেক্ষা মৃত্যু শ্রেয়ঃ।

ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় নোয়াখালি ও ত্রিপুরা জেলার উপদ্রুত অঞ্চলে সফর করিয়া আসিয়া এক বিবৃতিতে বলেন যে, ব্যাপকভাবে ধর্মান্তরিত করাই সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের উপর সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের সঙ্ঘবদ্ধ আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য ছিল। যে সহস্র সহস্র নরনারীকে বলপূর্বক ধর্মান্তরিত করা হইয়াছে, তাঁহারা হিন্দু ছিলেন, তাঁহারা এখনও হিন্দু এবং আমৃত্যু হিন্দু থাকিবেন। তাঁহারা কিছুমাত্র প্রায়শ্চিত্ত না করিয়া হিন্দুসমাজে পুনরায় ফিরিয়া আসিতে পারিবেন।

ডাঃ মুখোপাধ্যায়ের বিবৃতি নিম্নে দেওয়া হইল ঃ

"নোয়াখালি ও ত্রিপুরা জেলায় উপদ্রুত অঞ্চলের ঘটনাবলীর মধ্যে এমন একটি বৈশিষ্ট্য আছে, যাহা ভারতবর্ষের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ইতিহাসে অভূতপূর্ব। অবশ্য ইহাকে কোনক্রমেই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বলা চলে না। ইহা সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের উপর সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের সঙ্ঘবদ্ধ ও সুপরিকল্পিত

আক্রমণ। এই আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য ছিল ব্যাপকভাবে ধর্মান্তরিতকরণ এবং লুণ্ঠন, গৃহদাহ এবং সমস্ত বিগ্রহ ও দেবমন্দির অপবিত্রকরণ। কোন শ্রেণীর লোককেই রেহাই দেওয়া হয় নাই। যাহারা অপেক্ষাকৃত ধনী, তাহাদের বিরুদ্ধে অত্যাচারের মাত্রা আরও কঠোর হয়। হত্যাকাণ্ডও পরিকল্পনার অঙ্গ ছিল; কিন্তু যাঁহারা অত্যন্ত প্রভাবশালী এবং যাঁহারা প্রতিরোধ করেন, প্রধানতঃ তাঁহাদের জন্যই এই ব্যবস্থা ছিল। নারীহরণ, ধর্ষণ এবং বলপূর্বক বিবাহও এই সকল কুকার্যের অঙ্গ ছিল। কিন্তু এই প্রকার নারীর সংখ্যা কত, তাহা সহজে স্থির করা সম্ভব নহে। যে সকল ধ্বনি উচ্চারিত হয় এবং যে সকল কার্যপদ্ধতি অবলম্বিত হইয়াছিল তাহাতে দেখা যায় যে, এ সমস্তই সমূলে হিন্দু-লোপ ও পাকিস্থান প্রতিষ্ঠার একটি পরিকল্পনার অন্তর্গত ছিল। মুসলিম লীগের জন্য এবং ধর্মান্তরিতকরণ অনুষ্ঠানের ব্যয় ইত্যাদি অন্যান্য কারণে চাঁদা চাওয়া হইয়াছিল। ইহা হইতে দেখা যায় যে, আক্রমণকারিগণ ও তাহাদের দলপতিরা মুসলিম লীগের আদর্শে উদ্বুদ্ধ ছিল। তাহা ছাড়া তাহারা আরও জানিত যে, প্রদেশে তাহাদের নিজেদের গভর্নমেণ্ট রহিয়াছে এবং তাহাদের স্ব-সম্প্রদায়ভুক্ত স্থানীয় রাজকর্মচারীরাও সাধারণতঃ তাহাদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন। এই প্রকার ধারণার বশবর্তী হইয়া কুকার্যে তাহাদের সাহস আরও বাড়িয়া যায়।

* * * * *

এই সকল কুকীর্তির নায়ক একদল গুণ্ডা ছিল অথবা তাহাদের অধিকাংশই বাহির হইতে আসিয়াছিল—এরূপ বলিলে মিথ্যা বলা হইবে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্থানীয় লোকরা এইসব পৈশাচিক কাণ্ড করে এবং সাধারণভাবে এই সকল কার্যের প্রতি লোকের সহানুভূতি ছিল। কয়েক ক্ষেত্রে মুসলমানরা লোকের প্রাণ বাঁচাইতে সাহায্য করিয়াছে; কিন্তু তাহাদের সংখ্যা অতি নগণ্য। এভাবে যাহাদের জীবন রক্ষা পায়, তাহারা পলায়নে অসমর্থ হইলে তাহাদিগকে ধর্মান্তরিত হইয়া গ্রামে থাকিতে হইয়াছে এবং এখনও হইতেছে এবং তাহাদের ধনসম্পত্তিও লুণ্ঠন হইতে রক্ষা পায় নাই। ভাবী বিপদের আশঙ্কা পূর্বাহ্নেই কর্তৃপক্ষের গোচরে আনা হইয়াছিল। কিন্তু যাহারা দিনের পর দিন বিদ্বেষ ও হিংসা প্রচার করিতেছিল, সেইসব প্রকাশ্য প্ররোচকদের কার্যকলাপ বন্ধ করিতে তাঁহারা চেষ্টা করেন নাই। যখন সত্যসত্যই হাঙ্গামা বাধিয়া উঠিল এবং কয়েকদিন যাবৎ চলিতে লাগিল, কর্তৃপক্ষ তখন লোকের ধনপ্রাণ রক্ষা

করিতে অপারগ হইলেন। এই অক্ষমতা দ্বারা তাঁহারা নিজেরাই নিজেদের নিকট ধিক্কৃত হইয়াছেন এবং স্ব স্ব পদে বহাল থাকা সম্বন্ধে অযোগ্যতার প্রমাণ দিয়াছেন। বস্তুতঃ তাঁহারা যতক্ষণ উপস্থিত থাকিবেন, ততক্ষণ স্বাভাবিক অবস্থা ফিরাইয়া আনা সহজ হইবে না। এই প্রকার একটা অঘটন ঘটিয়া যাইবার পরও নোয়াখালিতে মাত্র প্রায় ৫০ জনকে এবং ত্রিপুরায় জনকতককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

সহস্র সহস্র লোক বিপজ্জনক এলাকার অন্তঃস্থল হইতে পলাইয়া গিয়া অত্যাচারীদের নাগালের ঠিক বাহিরে জেলার ভিতরেই আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। তাহাদের অবস্থা সহজেই অনুমেয়। যে সকল স্থান এখনও উপদ্রুত হয় নাই, সেই সকল স্থান হইতেও অধিবাসীরা হাজারে হাজারে পলাইয়া আসিয়া আশ্রয়-কেন্দ্রগুলিতে আশ্রয় লইয়াছে। কুমিল্লা, চাঁদপুর, আগরতলা ইত্যাদি স্থানে আশ্রয়কেন্দ্র খোলা হইয়াছে। সর্বশ্রেণীর স্ত্রী-পুরুষ শিশুসহ এই সকল আশ্রয়-কেন্দ্রে আশ্রিতের সংখ্যা ৫০ হাজার হইতে ৭৫ হাজার হইবে।

এই সকল লোক ছাড়া আরও প্রায় ৫০ হাজার বা ততোধিক লোক এখনও বিপজ্জনক এলাকায় রহিয়াছে। এই এলাকাকে বেওয়ারিশ এলাকা বলা যাইতে পারে। এই এলাকায় অবরুদ্ধ ব্যক্তিদিগকে একদিনও বিলম্ব না করিয়া উদ্ধার করিতে হইবে। তাহাদের সকলকেই ধর্মান্তরিত করা হইয়াছে এবং তাহারা এখনও অত্যাচারীদের হাতের মুঠার ভিতরে। তাহারা এখন নামেমাত্র মানুষ। তাহাদের আধ্যাত্মিক মৃত্যু ঘটিয়াছে। তাহাদের অধিকাংশই সর্বস্বান্ত এবং তাহাদের শরীর, মন দুইই ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। তাহাদের মধ্যে তপসিলী বা অন্যান্য শ্রেণী-নির্বিশেষে সমস্ত শ্রেণীর হিন্দু আছে। তাহাদের উপর যে অপমান ও নির্যাতন চলিয়াছে, তাহার সীমা নাই। তাহাদের নাম পরিবর্তন করা হইয়াছে, তাহাদের স্ত্রীলোকেরা অপমানিত হইতেছে, তাহাদের ধনসম্পত্তি লুণ্ঠিত হইয়াছে; তাহাদের মুসলমানের মত পোশাক পরিতে, আহার করিতে ও জীবনযাত্রা যাপন করিতে বাধ্য করা হইতেছে। পরিবারের পুরুষদিগকে মসজিদে যাইতে হয়। মৌলভী বাড়ীতে আসিয়া তাহাদিগকে শিক্ষা দেয়। আহার্যের জন্য—এমন কি অস্তিত্ব পর্যন্ত টিকাইয়া রাখিবার জন্য তাহাদিগকে তাহাদের অবরোধকারীদের দয়ার উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে হয়। তাহারা যাহাতে তাহাদের সমাজ হইতে চিরতরে বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইতে পারে, সেজন্য

তাহাদিগকে দ্রুত পরিবর্তনের ভিতর দিয়া লইয়া যাওয়া হইতেছে। তাহাদের মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া গেলেই তাহাদের আত্মসমর্পণ সম্পূর্ণ হইবে।

তাহারা প্রতিবাদ করিতে সাহসী হয় না; এমন কি বাহির হইতে যেসব হিন্দু তাহাদের গৃহে আসে, তাহাদের সহিত তাহারা দেখা পর্যন্ত করিতে সাহস করে না—যদি না আগন্তুকদের সহিত সশস্ত্র প্রহরী থাকে। পূর্বে যাহারা নেতৃস্থানীয় হিন্দু ছিল, তাহাদের পুরাতন এবং নূতন উভয়বিধ নাম ব্যবহার করিয়া প্রচারপত্র বিলি করা হইতেছে যে, তাহারা স্বেচ্ছায় নূতন ধর্ম গ্রহণ করিয়াছে এবং সকলকে ভবিষ্যতেও বর্তমানের মত অবস্থায় থাকিতে অনুরোধ করিতেছে; তাহারা স্বেচ্ছায় ধর্মান্তর গ্রহণ করিয়াছে বলিয়া মহকুমা হাকিমদের নিকট আবেদন পাঠান হইতেছে। বাহিরে যাইতে হইলে তাহারা স্থানীয় মুসলিম নেতাদের স্বাক্ষরিত ছাড়পত্র লইয়া বাহিরে যাইতে পারে। আমরা যখন নোয়াখালির নিকট চৌমুহনীতে ছিলাম তখন তাহাদের কয়েকজন তথায় উপস্থিত হইতে সমর্থ হয়। দুইজন মুসলিম লীগ মন্ত্রী ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আমাদের সহিত তথায় আলোচনা করিতেছিলেন। আগন্তুকরা তাঁহাদের সম্মুখেই নিজেদের মর্মবিদারী কাহিনী বর্ণনা করে।

এখন সর্বাপেক্ষা জরুরী সমস্যা হইতেছে, যে বহুসংখ্যক লোক এখনও সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের মুষ্টির ভিতরে রহিয়াছে, তাহাদিগকে উদ্ধার করা। গ্রামগুলি পাহারা দিয়া রাখায় এবং রাস্তাঘাট বন্ধ করিয়া রাখায় এতদিন কাহারও পক্ষে উপদ্রুত এলাকায় প্রবেশ করা দুঃসাধ্য ছিল। এখন মিলিটারী উপদ্রুত এলাকায় যাতায়াত করিতে থাকায় ঐ এলাকায় যাতায়াত ক্রমশঃ সহজ হইয়া আসিতেছে। কিন্তু কেবল যাতায়াত করিলেই চলিবে না; ঐ সঙ্গে আমাদের স্বেচ্ছাসেবকদিগকে প্রত্যেকটি গ্রামে প্রবেশ করিয়া অবরুদ্ধ এলাকায় সহস্র-সহস্র হৃতবল হিন্দুর মনে বিশ্বাস ও নিরাপত্তার ভাব ফিরাইয়া আনায় সাহায্য করিতে হইবে।

সামরিক কর্তৃপক্ষ উপদ্রুত প্রত্যেকটি গ্রামে প্রবেশ করিবেন সিদ্ধান্ত করায় ভালই হইয়াছে। একে তো যাতায়াতের অসুবিধার জন্য তাঁহারা ইচ্ছামত দ্রুত যাতায়াত করিতে পারিবেন না, তদুপরি উপদ্রুত অঞ্চল হইতে যদি কয়েকজন স্থানীয় সরকারী কর্মচারীকে সরানো না হয়, তবে সামরিক কর্তৃপক্ষও পুরোপুরি কাজ করিতে পারিবেন না। অবিলম্বে পিটুনী-করও বসাইতে হইবে। ১৯৪২ সালের আন্দোলনের সময় কেবলমাত্র হিন্দুদের উপর পাইকারী জরিমানা ধার্য

হইয়াছিল। বর্তমান দুর্বিপাকে মুসলমানরা সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়কে রক্ষা করিতে না পারায়ও পিটুনী-কর ধার্য করা সঙ্গত। বিষয়টি যখন আমি কয়েকজন স্থানীয় সরকারী কর্মচারীর সহিত আলোচনা করিতেছিলাম, তখন আমাকে বলা হয় যে, অনেক মুসলমান তাহাদের প্রতিবেশীকে সাহায্য করিয়াছিল। এ সম্বন্ধে আমার প্রস্তাব এই যে, কেহ যদি করমকুবের দরখাস্ত করে, তবে দরখাস্তকারীকে প্রমাণ করিতে হইবে যে, সে সত্যই তাহার প্রতিবেশীকে সাহায্য করিয়াছিল। পাইকারী জরিমানালব্ধ অর্থ এবং সরকারী তহবিল হইতেও দুর্গতদিগকে যতদূর সম্ভব শীঘ্র ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে।

পুনর্বসতির প্রশ্নও অবিলম্বে বিবেচনা করিতে হইবে। শীঘ্রই ফসল কাটিবার সময় আসিবে। যাহারা অন্যত্র আশ্রয় লইয়াছে, তাহারা তাহাদের ভাগের ফসল না পাইলে তাহাদিগকে অনশনে থাকিতে হইবে। নিরাপত্তার মনোভাব ফিরিয়া না আসিলে পুনর্বসতি সম্ভব হইবে না। যাহাদের ঘরবাড়ী ও সম্পত্তি বিনষ্ট হইয়াছে, তাহাদিগকে ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে। ঘরবাড়ী প্রস্তুত না হওয়া পর্যন্ত তাহাদিগকে গ্রামের নিকট বিশেষভাবে নির্মিত আশ্রয়শিবিরে স্থান দিতে হইবে। গ্রামে নিজেদের ঘরবাড়ী ও মন্দির পুনর্নির্মিত না হওয়া পর্যন্ত হিন্দুদের ভয় দূর হইবে না।

* * * *

আমাদের সহস্র সহস্র ভ্রাতা-ভগিনী এইভাবে নতিস্বীকারে বাধ্য হইয়া হিন্দুসমাজের গণ্ডীর বাহিরে চলিয়া গিয়াছেন বলিয়া আমি মনে করিতে পারি না। তাঁহারা হিন্দু ছিলেন, তাঁহারা এখনও হিন্দু এবং তাঁহারা আমরণ হিন্দু থাকিবেন। আমি প্রত্যেককেই বলিয়াছি, হিন্দুসমাজে ফিরিয়া আসিতে হইলে তাহাদিগকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে—কোন ব্যক্তিই এরূপ কোন কথা তুলিতে পারিবেন না। এই নির্দেশের বহুল প্রচার করিতে হইবে। প্রায়শ্চিত্তের কথা উঠিতেই পারিবে না।

যখনই কোন মহিলাকে উপদ্রুত অঞ্চল হইতে উদ্ধার করা হইবে, বলপূর্বক তাঁহাকে বিবাহ করা হইলেও তিনি বিনা বাধায় স্বীয় পরিবারে ফিরিয়া যাইবেন। যে সকল কুমারীকে উদ্ধার করা হইবে, যতদূর সম্ভব তাহাদিগকে বিবাহ দিতে হইবে।

যদি হিন্দুসমাজও দূরদৃষ্টির সহিত বর্তমান বিপদ উত্তীর্ণ না হইতে পারে, তবে ইহার ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন।

আমরা চৌমুহনী ও নোয়াখালিতে উদ্ধার, সাহায্য ও পুনর্বসতির জন্য প্রতিনিধিমূলক একটি কমিটি গঠন করিয়াছি। উপযুক্ত প্রহরায় ৫ জন করিয়া স্বেচ্ছাসেবকের দশটি দল উপদ্রুত অঞ্চলের অভ্যন্তরে যাত্রা করিবে।

আমি এই বিবৃতিতে পূর্ববঙ্গের একটি ক্ষুদ্র অংশের অবস্থা মাত্র বিবৃত করিয়াছি। আমরা যাহা দেখিয়াছি ও শুনিয়াছি, সভ্য শাসনের ইতিহাসে তাহার তুলনা নাই। বাংলার অন্যান্য অংশে অবস্থা অতি উত্তেজনাপূর্ণ এবং কলিকাতাসহ কয়েক স্থানেই হাঙ্গামা চলিতেছে। শাসনযন্ত্র সম্পূর্ণরূপে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে এবং ইহার জন্য গভর্নর ও মন্ত্রিসভাই দায়ী। আমরা বারবার সতর্ক করিয়াও বিফল হইয়াছি। আমরা ভালভাবেই দেখিতে পাইতেছি যে, বর্তমান শাসন অব্যাহত থাকিলে এই প্রদেশে ধনপ্রাণ আরও বিপন্ন হইবে।

এই বিপদের সময় হিন্দুদিগকে এ কথাটি হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে যে, তাহারা যদি সঙ্ঘবদ্ধ না হয়, তবে তাহাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন হইবে। সম্ভবতঃ বিধাতার ইহাই অভিপ্রায় যে, বিশৃঙ্খলা এবং ধ্বংস হইতেই হিন্দুদের সত্যকার জাগরণ আসিবে।

এই দুঃসময়েও আমরা যেন ভুলিয়া না যাই যে, আমরা ৩ কোটি হিন্দু বাংলাদেশে বাস করিতেছি। আমরা যদি সঙ্ঘবদ্ধ হই এবং আমাদের একটি অংশ যদি কোন বিপদেই ভ্রূক্ষেপ না করিয়া দৃঢ়সঙ্কল্পের সহিত সঙ্কটের সম্মুখীন হইতে প্রস্তুত হয়, তবে আমরা সমস্ত আক্রমণকারীকে পরাভূত করিয়া আমাদের মাতৃভূমিতে আমাদের সম্মানের আসন পুনরধিকার করিতে পারিব।"

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু

নোয়াখালি ও ত্রিপুরার উপদ্রুত অঞ্চল পরিদর্শন করিয়া কলিকাতা প্রত্যাবর্তন করিবার পর ৪ঠা ডিসেম্বর এক সাংবাদিক সম্মেলনে শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু নিম্নলিখিত বিবৃতি দেন :—

নোয়াখালি ও ত্রিপুরা জেলার কোন কোন অঞ্চল পরিভ্রমণের পর আমি কয়েকটি সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি। আমার এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই যে, সেখানে যাহা ঘটিয়াছে তাহার পিছনে সুসংবদ্ধ পরিকল্পনা ছিল। গুণ্ডা ও বাহিরের লোক এই পরিকল্পনা রচনায় ও পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করায় অংশ গ্রহণ করিয়া থাকিতে পারে, কিন্তু প্রধানতঃ স্থানীয় নেতৃবৃন্দসহ স্থানীয় লোকেরাই ঐ সব কাণ্ড করিয়াছে। স্থানীয় নেতৃবৃন্দের মধ্যে কোন কোন

ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্টও আছেন। কাজেই যাহা ঘটিয়াছে তাহার জন্ত স্থানীয় লোক ও স্থানীয় নেতৃবৃন্দকেই দায়ী করিতে হইবে।

আমার পরিভ্রমণকালে আমি কতিপয় দায়িত্বসম্পন্ন ব্যক্তির নিকট হইতে যে প্রমাণ পাইয়াছি তাহাতে আমি একথা বলিতে পারি যে, স্থানীয় কর্মচারীরা কি ঘটিতে যাইতেছে তাহা জানিতেন; তাহা ছাড়া, উভয় জেলার কতিপয় ব্যক্তি তাহাদের এ সম্বন্ধে সতর্কও করিয়া দিয়াছিলেন। স্থানীয় কর্মচারীদের সম্বন্ধে আমি আরও বলিতে চাই যে, তাঁহারা হয় প্রত্যক্ষভাবে ইহাতে উৎসাহ জোগাইয়াছেন, নতুবা নিষ্ক্রিয় দর্শকের মতো স্থবির হইয়াছিলেন। আমার দৃঢ় ধারণা যে, লোকের মনোবল ও আস্থা যে লুপ্ত হইয়াছে তাহার কারণ ঐ সব কর্মচারী এখনও তাঁহাদের স্ব স্ব পদে বিরাজ করিতেছেন। উপদ্রুত অঞ্চল যতটা দেখিয়াছি তাহাতে আমি একথা বলিতে পারি যে, গভর্নমেণ্ট যদি সঙ্গে সঙ্গে ও দৃঢ়তার সহিত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেন, তবে হাঙ্গামা নিবারণ, অন্ততঃ হিংসোন্মত্ততা দমন করিতে পারিতেন। আমার ধারণা গভর্নমেণ্টের উপেক্ষা অথবা দৃঢ়তার অভাবে কিংবা এই উভয় দোষেই বর্তমান অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে এবং এই কারণেই উপদ্রুত অঞ্চলের লোকেরা অসহায় বোধ করিতেছে।

নোয়াখালির উদ্দেশ্যে কলিকাতা ত্যাগের পূর্বে আমি গভর্নমেণ্টের একজন মন্ত্রীর নিকট এই প্রস্তাব করিয়াছিলাম যে, অন্যান্য ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলিও অবলম্বন করা উচিত:

(১) যেসব লোক হত্যা, লুঠ, অগ্নিসংযোগ এবং নারীনিগ্রহ করিয়াছে, তাহাদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার করিতে হইবে।

(২) আশ্রয়প্রার্থী এবং অধিকৃত অঞ্চলের হিন্দু পরিবারগুলির পুনর্বসতির বন্দোবস্ত করিয়া স্বাভাবিক জীবনযাপনের উপযুক্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

প্রথমটি সম্বন্ধে আমি বলিয়াছি যে, বহু পরিচিত ও সনাক্তকৃত অপরাধীদের এখনও ধরা হয় নাই। দ্বিতীয়টি সম্বন্ধে আমি একথা বলিতে বাধ্য যে, সংখ্যা-লঘু সম্প্রদায়ের স্বাভাবিক জীবনযাপন সম্ভব করিয়া তুলিতে গভর্নমেণ্ট. বলিতে গেলে, কিছুই করেন নাই। বরং সাহায্য বন্ধ করিবার হুমকি দেখাইয়া গভর্নমেণ্ট অবস্থার অবনতি ঘটাইয়াছেন। এই সাহায্য-বন্ধের প্রস্তাবকে আমি আশ্রয়প্রার্থীদিগকে বিপজ্জনক অঞ্চলে প্রত্যাবর্তনে বাধ্য করার ব্যবস্থা বলিয়াই

অভিহিত করিতে পারি। অধিকাংশ উপদ্রুত অঞ্চলের অবস্থাই এমন যে, বর্তমানে সেসব জায়গায় প্রত্যাবর্তন একরকম অসম্ভব। ইহা সকলেই জানে যে, কেহ কেহ তাহাদের বাড়ি ফিরিবার জন্য মনস্থির করিয়া সেখানে যায় বটে, কিন্তু তাহারা আক্রান্ত ও নিহত হয়।

নারীহরণ সম্পর্কে দেখা যায়, হাঙ্গামার সময় যাহারা উপদ্রুত অঞ্চলে ছিল তাহাদের অভিযোগ এই যে, নারী অপহরণকারী অথবা অপহৃতা নারী সন্ধানের ব্যাপারে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ সহায়তা করেন নাই। কোন কোন অপহৃতা বালিকার মাতার সহিত আমার আলাপের সুযোগ হইয়াছিল এবং আমি তাহাদের যে অবস্থা দেখিয়াছি তাহা প্রকাশের ভাষা আমার নাই।

আমি যাহা দেখিয়াছি এবং শুনিয়াছি তাহাতে আমার এই ধারণা জন্মিয়াছে যে, অপহৃতা নারীদের অনুসন্ধানে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ তেমন গা করেন নাই। স্থানীয় লোকের ধারণা যে, স্থানীয় পুলিস যদি মিলিটারীর সহযোগিতা করিত, তবে মিলিটারী এ ব্যাপারে বিশেষ সহায়ক হইতে পারিত।

এখন উপায় কি? আমি ইতিপূর্বে একাধিকবার বলিয়াছি যে, বর্তমান গভর্নমেণ্টের নিকট হইতে আমি বিশেষ কিছু প্রত্যাশা করি না। দিল্লী হইতে প্রত্যাবর্তনের পর আমি জনসাধারণকে ইহা উপলব্ধি করিতে বলিয়াছিলাম যে, তাঁহাদের নিজেদেরই আত্মরক্ষার জন্য যত্নবান হইতে হইবে এবং সর্ববিধ নিরাপত্তার ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে।

পূর্ববর্তী এক বিবৃতিতে শ্রীযুক্ত বসু বলেন,—নোয়াখালি জেলায় অক্টোবর মাসের ১০ই তারিখে হাঙ্গামা আরম্ভ হয়, এবং ঐ তারিখ হইতেই ব্যাপকভাবে লুণ্ঠন, গৃহদাহ, হত্যাকাণ্ড, নারীহরণ ও বলপূর্বক ধর্মান্তরিতকরণ আরম্ভ হয়। প্রায় ৫ হাজার আশ্রয়প্রার্থী নোয়াখালির উপদ্রুত অঞ্চল হইতে কুমিল্লায় আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। আমি স্বয়ং তাহাদের নিকট অনুসন্ধান করিয়া যাহা জানিতে পারি, তাহাতে আমার উল্লিখিত উক্তি সমর্থিত হইয়াছে। নোয়াখালি জেলার উপদ্রুত অঞ্চলের পরিধি প্রায় ৫ শত বর্গমাইল। গভর্নর আশা করেন যে, নিহত ব্যক্তিদের সংখ্যা শতকের কোঠায় একটি নিম্নতম অঙ্কের মধ্যে আছে। তিনি কি সূত্রে এই হিসাব পাইয়াছেন, তাহা প্রকাশ করা হয় নাই। কিন্তু আমি যে সাক্ষ্যপ্রমাণ ও সংবাদ পাইয়াছি, স্টেটসম্যান ও অন্যান্য সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিবরণের সহিত মিলাইয়া দেখিলে দেখা যায় যে, নিহত ব্যক্তিদের সংখ্যা নিশ্চিতরূপে সহস্রের কোঠায় হইবে। একটি

স্থানেই, যথা শ্রীযুক্ত স্থরেন্দ্রকুমার বস্থর কাছারী ও বাটীতে একদিনে চারিশত লোক নিহত হইয়াছেন বলিয়া সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। হাঙ্গামার তৃতীয় দিবসে নোয়াখালি উকিল সমিতির সভাপতি রায়সাহেব রাজেন্দ্রলাল রায় সহ বহুসংখ্যক ব্যক্তি শ্রীযুক্ত রায়ের বাটীতে নিহত হইয়াছেন। যথাসময়ে সাহায্যের জন্ম আবেদন করা হইলেও আক্রান্ত ব্যক্তি ও পরিবারগুলিকে পুলিসের সাহায্য দেওয়া হয় নাই। একজন ভূতপূর্ব এম. এল. এ.-র নেতৃত্বে স্থসংগঠিত গুণ্ডাদল হাঙ্গামা বাধায়। গুণ্ডাদের দলে ভূতপূর্ব সামরিক লোকরাও ছিল। উল্লিখিত ব্যক্তিদের উদ্যোগ-আয়োজনের সংবাদ লিখিতভাবে স্থানীয় ম্যাজিস্ট্রেট ও পুলিসকে জানানো হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহারা কোন ব্যবস্থাই অবলম্বন করেন নাই। ত্রিপুরা জেলায় আক্রান্ত অঞ্চলের পরিধি ৪ শত বর্গমাইল। আমি ১৯শে ও ২০শে তারিখ উভয় জেলার উপদ্রুত স্থানগুলি বিমান হইতে পরিদর্শন করি এবং ১৫ হইতে ২০টি গ্রামে আগুন জ্বলিতে দেখি। স্পষ্টই বোঝা যায় যে, ঐ দুইদিনেই আগুনগুলি লাগানো হইয়াছিল।

শ্রীযুক্ত স্থরেন্দ্রমোহন ঘোষ

১৭ই অক্টোবর বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি শ্রীযুক্ত স্থরেন্দ্রমোহন ঘোষ নিম্নোক্ত বিবৃতি প্রকাশ করেন :—

"বাংলাদেশ এক চরম বিপর্যয়ের মধ্য দিয়া চলিয়াছে ; কলিকাতার পর এবার নোয়াখালির পালা। জানি না, ইহার পরের জন্য কোন্ অঞ্চল ঠিক হইয়া আছে। এইসব ঘটনাই স্থপরিকল্পিত বলিয়া মনে হয়, কোনটিই বিচ্ছিন্ন নহে। বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির পক্ষ হইতে আমি বলিতে পারি যে, আমাদের মহান প্রতিষ্ঠান অবস্থার গুরুত্ব সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত আছেন। মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভার আশ্রয়ে গত কয়েক বৎসর যাবৎ বিপরীতপন্থী, বিপ্লববিরোধী ও অসামাজিক শয়তানী ষড়যন্ত্র চলিতেছিল। ষড়যন্ত্রকারীরা আজ সভ্য মানুষের জীবনযাত্রা ও সভ্যতা বলিতে যাহা কিছু বুঝা যায় তাহার বিরুদ্ধে একরকম পুরাদস্তুর যুদ্ধঘোষণা করিয়াছে।

"ভারতে কংগ্রেস, সভ্যতা ও প্রগতির বাহক এবং সংগ্রামের ক্ষেত্রে সাড়া দিতে কংগ্রেস কুণ্ঠিত হইবে না। ইউরোপে হিটলার ও মুসোলিনীর অধীনে যে শয়তানী ষড়যন্ত্রের উদ্ভব হইয়াছিল, তাহাকে ধ্বংস করা হইয়াছে। এবং

আজ যদি ভারতে ও বাংলায় তাহার পুনরুদ্ভব হয়, তাহা হইলে শেষ পর্যন্ত উহাও ধ্বংস হইবে। শত বিপর্যয় কাটাইয়াও বাংলার প্রাণ অবশিষ্ট থাকিবে এবং সভ্যতা এই আক্রমণ সহ্য করিয়াও টিকিয়া থাকিবে।

"যাঁহারা প্রগতি ও সভ্যতার সমর্থক, তাঁহারা যে সম্প্রদায়েরই হউন না কেন, আমি তাঁহাদের নিকট আবেদন জানাইতেছি, তাঁহারা সংগঠিত হইয়া তাঁহাদের সামাজিক কর্তব্য পালন করুন। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে রক্ষা করা প্রত্যেক সম্প্রদায়ের পবিত্র কর্তব্য। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ধর্ম যাহাই হউক না কেন, তাহাদিগের প্রাণ ও সম্পত্তি নিরাপদ রাখার প্রতিশ্রুতি দেওয়া আমাদের কর্তব্য—সভ্যতার ইহাই নিদর্শন। আমাদের এই পবিত্র দায়িত্ব ও কর্তব্য যেন আমরা না ভুলি।

"নোয়াখালি হইতে দুঃখদুর্দশার যে করুণ সংবাদ আসিতেছে তাহা সত্যই অত্যন্ত কলঙ্কজনক। জীবন ও সম্পত্তিনাশের পরিমাণ নির্ধারণ করা এখনও সম্ভবপর নহে। বলপূর্বক ধর্মান্তরিতকরণ এবং বলপূর্বক নিষিদ্ধ খাদ্য ভোজন করানো, নারীহরণ—এ সবই মধ্যযুগীয় বর্বরতা বলিয়া বোধ হয়। আমি জানি, এই অবস্থায় দেশবাসীরা কি অপমান ও কি বেদনা বোধ করিতেছেন, তথাপি লাঞ্ছিতদিগকে আমি বলিতে পারি, এই বলপূর্বক ধর্মান্তর ও বিবাহের কোনও নৈতিক বা সামাজিক মূল্য নাই। আমি আশা করি, সামান্য এদিক ওদিক হইলেই যে যুগে মানুষের ধর্ম পরিবর্তিত হইয়া যাইত বা বিবাহবন্ধন পাকা হইয়া যাইত সেই যুগের অবসান হইয়াছে। আমি ঐসকল অঞ্চলে আমার স্বদেশবাসিগণের নিকটও আবেদন জানাইতেছি, এই তথাকথিত ধর্মান্তর অথবা বিবাহের দরুন কাহারও বিরুদ্ধে যেন কোনও সামাজিক বাধা আরোপ করা না হয়।

"লীগ মন্ত্রিসভার ছত্রছায়াতলে সংগঠিত শয়তানীর চক্রান্তজাল ছিন্ন করিয়া সভ্যতারই জয় হইবে—পরিশেষে এই আশারই আমি পুনরাবৃত্তি করিতেছি।"

শ্রীযুক্তা সুচেতা কৃপালনী

শ্রীযুক্তা সুচেতা কৃপালনী নোয়াখালি অত্যাচারের কিছুদিন পরই (২০শে অক্টোবর) সেবাকার্যের জন্য সেখানে উপস্থিত হন। নোয়াখালিতে কিছুদিন সেবাকার্যে রত থাকিবার পর তিনি কর্মোপলক্ষে দিল্লী যান। তিনি পুনরায়

২রা ডিসেম্বর নোয়াখালিতে ফিরিয়া যান। নারীর অসম্মানে দুঃসহ বেদনায় ও ক্ষোভে-অপমানে ব্যথিত চিত্ত লইয়া তিনি নারী উদ্ধার ও নিপীড়িত নারীদের অশ্রুজল মোচন করিবার উদ্দেশ্যে নিজের জীবন বিপন্ন করিয়া ভয়াবহ সুদূর পল্লী-অঞ্চলে সেবাকার্যে আত্মনিয়োগ করেন।

দ্বিতীয়বার নোয়াখালিযাত্রার পূর্বে শ্রীযুক্তা কৃপালনী বলেন যে, নোয়াখালি হইতে চলিয়া আসার ইচ্ছা তাঁহার মোটেই ছিল না। তথায় ব্যাপকভাবে লুঠতরাজ, নারীহত্যা ও গৃহে অগ্নিসংযোগ বন্ধ হইয়াছে বটে ; কিন্তু সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের নরনারী তথায় নিজেদের অতি সামান্য মাত্রায় নিরাপদ মনে করিতে পারিতেছে না। এমন কি গান্ধীজী স্বয়ং জানাইয়াছেন, তিন সপ্তাহ অবস্থানের পরও তিনি কোনরূপ আলোকের সন্ধান পাইতেছেন না।

শ্রীযুক্তা কৃপালনী বলেন, "আমি দেখিয়াছি বহু গ্রামে সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের সমস্ত নরনারীকে বলপূর্বক ধর্মান্তরিত করা হইয়াছে। এইভাবে ধর্মান্তরিত নরনারীদের বহু মেয়েকে অপর সম্প্রদায়ের লোকের সহিত বিবাহ দিতে বাধ্য করা হইয়াছে অথবা তজ্জন্য চাপ দেওয়া হইতেছে। সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের লোক হিসাবেই তাহারা স্বগ্রামে বসবাস করিতে পারেন। তাহাদের অপর সম্প্রদায়ের ধর্মাচরণে যোগ দিতে এবং শাস্ত্রনিষিদ্ধ মাংস ভক্ষণ করিতে বাধ্য করা হইয়াছে।

"উপদ্রুত অঞ্চল হইতে আমি আজ দূরে অবস্থান করিতেছি বটে, কিন্তু পূর্ববঙ্গের হতভাগ্য নরনারীদের চিন্তায় আমার মন আচ্ছন্ন। তাহাদের উপর অত্যন্ত নির্মম অত্যাচার চলিয়াছিল এবং অদ্যাবধি তাহারা বহুবিধ দুঃখকষ্ট ও নির্যাতন ভোগ করিতেছেন। গান্ধীজীর নির্দেশানুসারে আমি ২রা ডিসেম্বর নোয়াখালি যাত্রা করিতেছি এবং নোয়াখালি ও তৎসন্নিহিত স্থানসমূহের অবস্থার উন্নতি না ঘটা পর্যন্ত আমি তথায় থাকিব।

"সফরকালে আমি প্রায় একমাস যাবত নোয়াখালি ওত্রিপুরা জেলার উপদ্রুত অঞ্চলগুলি পরিদর্শন করিয়া তথাকার অবস্থা সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছি। কিন্তু বড়ই দুঃখের সহিত আমাকে জানাইতে হইতেছে যে, তথায় অবস্থানকালে অবস্থার কোনরূপ উন্নতি ঘটে নাই। প্রায় চারি শত গ্রামে সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের নরনারী বসবাস করিতেছেন বটে, কিন্তু আসলে তাঁহারা বন্দী-জীবন যাপন করিতেছেন। সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের নরনারীদের অবাধ গতি-বিধি রোধ করার জন্য তাঁহাদের গৃহের সন্নিকটে প্রহরী মোতায়েন রাখা হইয়াছে।

সাধারণতঃ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের শিক্ষিত ও অবস্থাপন্ন লোকদের ক্ষেত্রে উল্লিখিত ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়। দুর্বৃত্তদল মনে করে ইহারা বাহিরে যাইতে সক্ষম হইলে অভ্যন্তরভাগে অনুষ্ঠিত ঘটনাবলী প্রকাশ হইয়া পড়িবে।

"বিক্ষিপ্ত নরহত্যা, নারীর উপর অত্যাচার; বলপূর্বক অর্থ আদায় এখনও চলিতেছে। সৈন্য ও পুলিস বাহিনীর উপস্থিতি সত্ত্বেও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নরনারীর বিশেষ কোনরূপ উপকার সাধিত হইতেছে না—কারণ অধিকাংশ দুর্বৃত্ত ও তাহাদের নেতারা এখনও পর্যন্ত অবাধে চলাফেরা করিতেছে।

"দুর্বৃত্তদের মধ্যে অনেকেই গ্রামের প্রতিপত্তিশালী ও নেতৃস্থানীয় লোক, স্কুলের শিক্ষক, আইনজীবী, ও ইউনিয়নবোর্ডের সদস্য ইত্যাদি আছেন। সুতরাং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকদের জব্দ ও পীড়ন করা তাহাদের পক্ষে অত্যন্ত সহজসাধ্য। কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকেরা ঘটনা সম্পর্কে থানায় এজাহার দেওয়াতে বাদীকে কঠোর নির্যাতন সহ্য করিতে হইয়াছে।

"কাহাকেও গ্রেপ্তার করিতে পুলিস একান্ত নারাজ। আমি অনেক ক্ষেত্রেই পুলিসের সহিত দুর্বৃত্ত-সর্দারের বিশেষ গলাগলি ভাব দেখিয়াছি। এই অবস্থা বিদ্যমান বলিয়াই আমি তথায় থাকাকালেও দেখিয়াছি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নরনারীগণ দলে দলে বাড়ীঘর ত্যাগ করিয়া যাইতেছেন। সেবা-প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রথম হইতেই ইহা উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নরনারীর মনে আস্থার মনোভাব ফিরাইয়া আনিতে হইলে উক্ত সম্প্রদায়ের স্বেচ্ছাসেবকগণের তথায় যাইয়া বসবাস ও তাহাদের মধ্যে কাজ করা অতীব প্রয়োজন।

"কিন্তু ইহাও সম্ভব হয় নাই। উপদ্রুত অঞ্চলে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বেচ্ছাসেবকদল থাকিলে উপকার হইবে এই বিষয়টি সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের স্থানীয় অধিবাসী ও কর্তৃপক্ষ মোটেই উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। আজে-বাজে আপত্তি তুলিয়া তাহারা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বেচ্ছাসেবকদের গ্রাম হইতে বিতাড়িত করিত। এমন কি, কয়েকজন স্বেচ্ছাসেবক নিহতও হইয়াছেন। তাঁহাদের মৃতদেহ পাওয়া সত্ত্বেও কোনরূপ তদন্তকার্য পরিচালিত হয় নাই।

"ধর্ষিতা ও অপহৃতা নারীর সঠিক সংখ্যা নির্ণয় করা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। তবে অনুসন্ধানের ফলে আমি জানিতে পারিয়াছি যে, তাঁহাদের সংখ্যা বহু। সুদূর পল্লী-অঞ্চলে এখনও অনুরূপ ঘটনা ঘটিতেছে। কতক সংবাদপত্রে এই মর্মে এক সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে যে, আমি বহু অপহৃতা নারীকে উদ্ধার

করিয়াছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, আমি একটি অপহৃতা বালিকাকে মাত্র উদ্ধার করিয়াছি।

"বহু অপহৃতা নারীকে দূরদেশে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে বলিয়া বিশ্বাস হয়। অপহৃতাদের উদ্ধারকার্যে কর্তৃপক্ষ সহযোগিতা প্রদান না করিলে আমার মনে হয়, অধিকাংশ অপহৃতা নারীর উদ্ধারসাধন সম্ভব হইবে না। অবশ্য এতাবৎ তদ্রূপ সহযোগিতা দানের কোনরূপ আভাস পাওয়া যায় নাই।

"কিছুকাল পূর্বে নোয়াখালির জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক প্রদত্ত বলিয়া একটি বিবৃতি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রকাশ, উহাতে নোয়াখালির শোচনীয় ঘটনাবলীর কতক তথ্যাদি জেলা ম্যাজিস্ট্রেট দিয়াছিলেন। এই বিবৃতির প্রতি তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইলে পত্রের দ্বারা তিনি আমাকে জানান যে, তাঁহার উক্তির ভুল অর্থ করা হইয়াছে। তাঁহার পত্রের কতকাংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল :—'প্রদত্ত রিপোর্টে আমাকে ইহা বলিতে বাধ্য করা হইয়াছিল যে, নারীহরণ ও বলপূর্বক বিবাহ প্রদানের সংখ্যা নিতান্ত অল্প এবং এই ধরনের কোন সংবাদ তাঁহাকে জানানো হয় নাই। আমি নিশ্চিতভাবে জানি, তদ্রূপ কোন বিবৃতি প্রদান করি নাই। আপনিও জানেন, আরতি নাম্নী বলপূর্বক বিবাহিতা একটি বালিকাকে আমি স্বয়ং ২৫শে অক্টোবর উদ্ধার করিয়াছি। আমার যতদূর স্মরণ আছে, মনে হয়, রিপোর্টার আমাকে প্রশ্ন করেন যে, ধর্ষিতা ও অপহৃতা নারীর সংখ্যা সম্ভবতঃ অল্প—উত্তরে আমি জানাই যে, তাহাদের সংখ্যা জানা যায় নাই। সম্ভবত আমি তাঁহাকে জানাইয়াছিলাম যে, উক্ত রূপ ঘটনা কমই হইয়াছে বলিয়া আমি আশা করি—আরতি নাম্নী বালিকাটিকে উদ্ধারের বিষয় আমি তাঁহাকে জানাইয়াছিলাম কিনা তাহা আমার মনে নাই।'

"হত্যা, লুণ্ঠন ও গৃহে অগ্নিসংযোগ ব্যতীত বহু স্থানে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে অর্থ নৈতিক ক্ষেত্রে বয়কট করা হইতেছে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কৃষকদের উৎপাদিত দ্রব্য সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের লোকেরা কিনিতে চাহে না বলিয়া বিক্রীত হয় না। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অধিকাংশ দোকানদারের দোকানপাট ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। যে কয়েকটি অবশিষ্ট আছে উহাতে ক্রেতার অভাব। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকদের অপর সম্প্রদায়ের দোকানদারের নিকট হইতেই দ্রব্যাদি ক্রয় করিতে হয়। দ্রব্যাদি ক্রয় করিতে গেলে প্রায়ই তাঁহাদের ফিরাইয়া দেওয়া হয়। অথবা অত্যধিক মূল্য দিতে হয়। কোন এক গ্রামে

একটি দিয়াশলাই আট আনা মূল্যে তাঁহাদের ক্রয় করিতে হয় বলিয়া আমি অবগত হইয়াছি।

"সুতরাং পূর্ববঙ্গের বর্তমান সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতির উন্নতিসাধন করিতে হইলে অতীত ঘটনাবলী এবং বর্তমানে যে সমস্ত ঘটনা ঘটিতেছে সেই সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের মনোভাবেরও আমূল পরিবর্তন প্রয়োজন। অধিক কি, স্বয়ং গান্ধীজী তিন সপ্তাহ অবস্থানের পরও কোনরূপ আলোকের সন্ধান প্রাপ্ত হন নাই। বাংলা সরকারের শুধু মৌখিক সহযোগিতার পরিবর্তে কার্যকরী সহযোগিতা পাইলেই তিনি সফলকাম হইতে পারিবেন। উক্তরূপ সহযোগিতা-প্রাপ্তির ফলে সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের স্থানীয় নরনারী সঙ্গত আচরণ করিতে আরম্ভ করিবেন। অন্যথায় পূর্ববঙ্গ দুষ্ট ক্ষতস্বরূপ থাকিয়া যাইবে।"

মিস মুরিয়েল লিস্টার বর্ণিত কাহিনী

নোয়াখালির সুদূর পল্লী-অঞ্চল পরিদর্শন করিয়া মিস মুরিয়েল লিস্টার যে বিবরণ প্রস্তুত করিয়াছিলেন, নিম্নোক্ত কাহিনী তাহা হইতেই বিবৃত হইয়াছে। লণ্ডনে মহাত্মা গান্ধী মিস লিস্টারের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন।

"পূর্ববঙ্গের আশ্রয়কেন্দ্র দেওয়ানজীবাড়ী হইতে আমি লিখিতেছি। গত কয়েক সপ্তাহে এই বে-সরকারী গৃহে বহু সহস্র লোক খাদ্য ও আশ্রয়লাভ করিয়াছে। আশ্রয়প্রার্থীদের মধ্যে প্রত্যেকেই এক মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা লইয়া এখানে আসিয়াছে। কিন্তু মহিলাদের অবস্থাই সর্বাপেক্ষা শোচনীয়। তাহাদের মধ্যে অনেকের পতি তাহাদের চোখের সম্মুখেই নিহত হইয়াছে। তাহাদিগকে বলপূর্বক ধর্মান্তরিত করা হইয়াছে। এই মহিলাদের চোখে যেন প্রাণহীনতার ছায়া পড়িয়াছে। এ ছায়া নৈরাশ্যের নয়, সেরূপ সক্রিয় ভাব তাহাদের নাই। এ যেন সম্পূর্ণ চেতনাহীন ভাব। ঠিক সম্মুখের দিকেই তাহাদের দৃষ্টি, কিন্তু সে দৃষ্টিতে চেতনা নাই, কোন আবেগ নাই। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ আহত হইয়াছেন। এক মাইল দূরে এই উদ্দেশ্যে নির্মিত সুন্দর সুসজ্জিত হাসপাতালে আমি তাহাদের দেখিলাম। দুর্বৃত্তদের প্রতিরোধ করিতে তাহারা চেষ্টা করিয়াছেন. কিন্তু তাহাদের সে চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে।

"মুসলমানগৃহে বিবাহিতরূপে যাহারা অবস্থান করিতেছেন, রিলিফ কর্মী এবং সরকারী কর্মচারিগণ তাহাদের উদ্ধার করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন,

কিন্তু তাহাদের চেষ্টায় বিশেষ ফল হইতেছে না। দুর্বৃত্তগণ এই মহিলাদের এই বলিয়া শাসাইতেছে যে, সরকারী কর্মচারীদের নিকট তাহাদের বলিতে হইবে, তাহারা এই নূতন অবস্থাই পছন্দ করেন ; নতুবা তাহাদের পরিবারসমেত সকলকেই হত্যা করা হইবে।

"জীবনের বিনিময়ে বহু সহস্র লোককে জোর করিয়া গো-মাংস ভক্ষণ করানো হইয়াছে।

"এই অঞ্চলে হাঙ্গামার কারণ বিশ্লেষণ করিয়া মিস লিস্টার বলেন, এই ব্যাপক অত্যাচার ও ধ্বংসকাণ্ডের সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে এই কথাই বলা চলে—ইহা পল্লীবাসীদের স্বতঃস্ফূর্ত অভিযান নয়। বাংলা দেশে যত গুণ্ডাই থাকুক না কেন, তাহাদের নিজেদের দ্বারা ইহা কখনই সম্ভব হইত না। পেট্রল ছড়াইয়া গৃহ পোড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। রেশনের এই জিনিস তাহাদের সরবরাহ করিল কে? পল্লী-অঞ্চলে ইহারা ষ্টিরাপ-পাম্প কোথা হইতে সংগ্রহ করিল? অস্ত্রশস্ত্র তাহাদের কে দিল?

"রিপোর্টে বলা হইয়াছে—একদিন এই গুণ্ডাগণ সদলে দেওয়ানজীবাড়ীতে হানা দেয় এবং এই গৃহ রক্ষা করার মূল্য হিসাবে মুসলিম লীগের জন্য এক লক্ষ টাকা দাবি করে। গৃহকর্তা ইহা দিতে অস্বীকার করেন। বাড়ীতে অনেক যুবক ছিল এবং চারিটি বন্দুক ছিল। পার্শ্ববর্তী গ্রামে একজনকে হত্যা করা হইয়াছে, এই সংবাদ শুনিয়া পরিবারের একজন যুবক পুলিসের সাহায্য পাইবার আশায় ২৩ মাইল দূরে নোয়াখালি শহরে যান। পরদিন পুলিস স্থপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এই গ্রামে আসেন এবং ইহাদের 'ভয় নাই' বলেন। কিন্তু যখন তিনি কথা বলিতেছিলেন, দুর্বৃত্তদল সেই সময়েই আবার হানা দেয়। তিনি ফাঁকা আওয়াজ করিয়া তাহাদের বিতাড়িত করেন, দুইজনকে গ্রেপ্তার করেন এবং সাহায্য পাঠাইবার প্রতিশ্রুতি দেন। দুই দিন পরে গুণ্ডাদল আবার শত শত লোক লইয়া উক্ত গৃহে হানা দেয়। তাহারা জানিত, এই গৃহে বন্দুক আছে, কিন্তু কয়টি তাহা জানিত না। গৃহ আক্রমণ করা উচিত কিনা, তখন তাহারা নিজেদের মধ্যে এই সম্পর্কে আলোচনা করিতেছিল, ঠিক সেই সময়েই ২২ জন সশস্ত্র পুলিস সেখানে উপস্থিত হয়। ইহাদের দেখিয়াই দুর্বৃত্তদল সরিয়া পড়ে। কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই গৃহ-মন্দির, বারান্দা এবং সর্বত্র পার্শ্ববর্তী গ্রামসমূহ হইতে আশ্রয়প্রার্থী আসিয়া পূর্ণ করে।

"যখন এই পর্যন্ত লিখিয়াছি, তিনজন মহিলা আমার কক্ষে প্রবেশ করিয়া নীরবে দাঁড়ান এবং তারপরে তাঁহারা কাঁদিয়া পড়েন। আধ ঘণ্টা পূর্বে চার মাইল দূরবর্তী শ্যামপুর গ্রাম হইতে তাঁহারা আসিয়াছেন। তাঁহাদের স্বামী-পুত্রও তাঁহাদের সঙ্গে আসিয়াছেন। তাঁহারা কলিকাতায় থাকেন, পূজার ছুটিতে গ্রামের বাড়ীতে আসিয়াছিলেন। এখানে আসিয়া তাঁহারা ব্যাপক বিভীষিকা দেখিতে পান। পূর্বদিন শ্যামপুরে সৈন্যদল আসিয়া পৌছিলে গ্রামের আতঙ্ক কতকটা প্রশমিত হয়। কিন্তু পূর্বদিন রাত্রিতে সৈন্যদল চলিয়া গেলেই দুর্বৃত্তদল আবার হানা দেয় এবং এই পরিবারের সমস্ত কিছু লুণ্ঠন করিয়া লইয়া যায়। পরিধানের বস্ত্র মাত্র সম্বল লইয়া আজ ইহারা এখানে আসিয়াছেন।

"হাঙ্গামার কারণ সম্পর্কে স্থানীয় লোকে নানা কথা বলিতেছেন। কেহ বলেন, ইহা নিছক ধর্মোন্মত্ততা। ইহারা গুজব শুনিয়াছেন, পৃথিবীর অন্তিম কাল নিকটবর্তী এবং একমাত্র মুসলমানগণই বাঁচিতে পারিবে। অন্য ধর্মাবলম্বী কাহাকেও হত্যা বা ধর্মান্তরিত করিলে স্বর্গে নিশ্চিত স্থান মিলিবে।

"মুসলিম লীগের কর্মসূচীমূলক যে দলিল বিভিন্ন হস্তে ঘুরিতেছে, তাহাও অনুরূপভাবে কাল্পনিক, খুব সম্ভবতঃ ইহা জাল। যে সকল ঘটনা এ পর্যন্ত ঘটিয়াছে, এই নির্দেশের সঙ্গে তাহার এত মিল আছে যে, অনেকে ইহাকে প্রকৃত দলিল বলিয়া মনে করেন।

* * * * *

"হাঙ্গামার ফলে দুর্দশাগ্রস্ত অনেকে বলিয়াছেন, আমাদের হিন্দু ও মুসলমানদের পাশাপাশি থাকিতে হইবে। যত শীঘ্র সম্ভব আমাদের পরস্পরের মধ্যে সহজ সম্পর্কটিকে ফিরাইয়া আনিতে হইবে। কিন্তু মানুষের প্রতি মানুষের পরস্পর বিশ্বাস যতদিন ফিরিয়া না আসিবে ততদিন সহযোগিতার ভাব আসিবে না। মানুষ ন্যায়বিচার পাইবে, এ বিশ্বাস নষ্ট হইয়াছে। নৈতিক আদর্শকে যে-কোন উপায়ে অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইবে। গুণ্ডারা আজ মনে করিতেছে, বাংলার এই অঞ্চলের তাহারাই শাসক। যাহারা এই ধ্বংসকার্য, অত্যাচার ও আক্রমণকে সমর্থন করিয়াছে, তাহাদের মুখে কোন ভয়ের চিহ্ন নাই। ভবিষ্যৎ শাস্তির কোন ভয় তাহারা করে না।

"এখানে আসিবার পথে রেলওয়ের তৃতীয় শ্রেণীর কামরায় প্রায় কুড়িজন মুসলমান কৃষকের সঙ্গে বসিয়াছিলাম। নিরীহ পল্লীকৃষক তাহারা, পরিবারের কর্তা। এই হাঙ্গামা সম্পর্কে আমরা প্রশ্ন করিলে তাহারা উত্তর দেয়—যে

দৃশ্য তাহারা দেখিয়াছে, তাহার জন্য তাহারা দুঃখিত। তাহাদের কথাগুলি আন্তরিকতাপূর্ণ ছিল। একজন বলে হিন্দুদিগকে রক্ষা করিবার জন্য আমাদের ইহার বিরুদ্ধে দাঁড়ান উচিত ছিল। আমাদের গৃহের স্ত্রীলোকগণ এমনই অভিভূত হইয়া পড়ে যে, তাহারা খাইতে পারে নাই। কিন্তু আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে আমরা কিছুই করিতে পারি নাই। এমন স্থান হইতে তাহারা সমর্থন পাইয়াছে যে, তাহাদের প্রতিরোধ করার শক্তিই আমাদের ছিল না।”

এ. ভি. ঠক্করের বিবৃতি

দিল্লীর হরিজন সেবক সঙ্ঘের সাধারণ সম্পাদক শ্রীযুক্ত এ. ভি. ঠক্কর নোয়াখালি সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিবৃতি দেন :—“গত ৭ই নবেম্বর গান্ধীজীর দলের সভ্য হিসাবে নোয়াখালিতে আসিবার পর ইহাই আমার প্রথম বিবৃতি। শৃঙ্খলারক্ষার খাতিরে আমার মনোভাব চাপিয়া রাখিতে হইবে এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, বিশেষ করিয়া তপসিলী সম্প্রদায়ের উপর যে অত্যাচার চলিয়াছিল, সেই সম্বন্ধে সম্যক অবগত না হইয়া আমি তাড়াতাড়ি কিছু প্রকাশ করিতে চাহি না। চারদিন যাবৎ আমি চরমণ্ডল গ্রামে আছি। এখানে আনুমানিক চারশত তপসিলী পরিবার এবং একশত সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের পরিবার আছে। আমার ইচ্ছা ছিল গান্ধীজীর দল হইতে পৃথক হইয়া এই চর-অঞ্চলে কাজ করা। এখানে অধিকাংশই নমঃশূদ্র, পাটনী এবং দাস পরিবারের বাস। ইহারা সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের হস্তে নির্যাতিত হইয়াছে এবং প্রকৃতপক্ষে এই অঞ্চল বেষ্টিত হইয়া রহিয়াছে।”

“পূর্ববঙ্গের এই অঞ্চল অত্যন্ত উর্বর এবং পান, সুপারি ও নারিকেল প্রভৃতি এখানে প্রচুর জন্মায়। জানুয়ারি মাস পর্যন্ত নৌকার সাহায্যে বহু নারিকেল এখান হইতে প্রেরণ করা সম্ভবপর। কারণ তখন পর্যন্ত খালগুলি একেবারে শুকাইয়া যায় না। চরমণ্ডল ও চর-অঞ্চলের গ্রামসমূহের নমঃশূদ্ররা অপেক্ষাকৃত সমৃদ্ধ।

“গুণ্ডাদলের আক্রমণে নোয়াখালি জেলার চারিটি থানা উপদ্রুত হইয়াছে। ঐ সমস্ত গুণ্ডাদল গত ১০ই অক্টোবর হইতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর প্রতিহিংসা লইবার পরিকল্পনা করিয়াছিল এবং তাহাদের এই পরিকল্পনা প্রায় এক সপ্তাহব্যাপী কার্যকরী ছিল।

“একটি কলেজের ছাত্র এই ঘটনার তিন সপ্তাহের পর গান্ধীজীকে এক তারে

জানায় যে, তাহার গ্রামবাসীরা অনাহারে রহিয়াছে এবং তাহাদের বস্ত্রের আবশ্যক ; কারণ তাহাদের সমস্ত বাড়ী লুণ্ঠিত এবং অগ্নিদগ্ধ হইয়াছে ; ধর্মান্তরিত করার কথা বাহুল্য মাত্র। ঘটনার ছয় সপ্তাহ পরেও এই ভীতি বর্তমান। অন্যূন আড়াই শত পরিবারের ঘরবাড়ী লুণ্ঠিত ও অগ্নিদগ্ধ হইলেও চরমণ্ডল গ্রাম হইতে একটিও এজাহার দেওয়া হয় নাই।

"দুর্ভাগ্যের বিষয় এই অরাজকতা দমনের জন্য গভর্নমেণ্ট সেইরূপ কার্যকরী কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছেন না। স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ কোন কোন সশস্ত্র গুর্খা ও শিখের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দায়ের করিতেছেন। যদিও লুণ্ঠন, অগ্নিসংযোগ, হত্যা ও ধর্মান্তরকরণ সম্বন্ধে প্রাথমিক রিপোর্ট দাখিলের জন্য উচ্চপদস্থ একজন কর্মচারীকে প্রেরণ করা হইয়াছে, কিন্তু এযাবৎ উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ সম্বন্ধে সরকারীভাবে কোন ঘোষণা করা হয় নাই। এইরূপ অবস্থা চলিতে থাকিলে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে অন্য দলের নিকট নত হইয়া থাকিতে হইবে। বহিরাগত সাহায্য-প্রতিষ্ঠানসমূহকে উত্তেজনা প্রসারের অজুহাতে বাহির করিয়া দিবার কথা শুনা যাইতেছে, কিন্তু ইহার কোন ভিত্তি নাই।

"গান্ধীজী উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে শান্তি ও মৈত্রী স্থাপনের জন্য তাঁহার যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু মন্ত্রী সামসুদ্দিন আমেদকে এই লোকটির হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য নিয়োগ করা হইয়াছে, কারণ সমগ্র ভারতের দৃষ্টি আজ নোয়াখালির দিকে।

"গান্ধীজীর এই কার্যে নানা কারণে বাধার সৃষ্টি হইতেছে।

(ক) এখনও অরাজকতা চলিতে থাকায় স্বীয় নিরাপত্তার জন্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সৎ ব্যক্তিরা দুর্বৃত্তের নাম প্রকাশ করিতে পারিতেছেন না।

(খ) হিন্দু নেতৃবৃন্দ এখনও শাসকবর্গের আন্তরিকতার উপর নির্ভর করিতে না পারিয়া শান্তি কমিটিতে যোগদান করিতেছেন না।

(গ) সশস্ত্র পুলিস এবং সৈন্যদের বিরুদ্ধে সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় অভিযোগ আনিতেছে।

(ঘ) সশস্ত্র বাহিনী অপসারণের জন্য মন্ত্রীদের নিকট মুসলমান নারীদের উপর অত্যাচার হইতেছে বলিয়া অভিযোগ করা হইতেছে।

(ঙ) গান্ধীজী এবং মন্ত্রিসভা উভয়ই বিভিন্ন অঞ্চল হইতে পুলিস এবং সৈন্য-বাহিনী অপসারণের জন্য ইচ্ছুক, কিন্তু উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গী ভিন্নরূপ।"

"যদিও আমি অহিংসা-নীতির সমর্থক, তথাপি পুলিস এবং সৈন্যদলের যে আবশ্যক তাহা আমি অবশ্যই বলিব, কারণ তাহারা যদি বিভিন্ন দলে উপদ্রুত অঞ্চলে ছড়াইয়া না পড়িত, তবে এই আংশিক স্বাভাবিকতাও ফিরিয়া আসিত না। এখনও ইতস্ততঃ হত্যাকাণ্ড চলিতেছে এবং গুণ্ডাদল প্রকাশ্যে বলিতেছে যে, সৈন্যবাহিনী এবং পুলিস চলিয়া গেলে যাহারা নালিশ করিয়াছে, তাহাদের উপর প্রতিশোধ লওয়া হইবে।"

বাংলার শ্রমসচিব মিঃ সামসুদ্দীন আমেদের স্বীকৃতি

চৌমুহনীতে অনুমান ২৫ হাজার হিন্দু-মুসলমানের সম্মুখে মহাত্মা গান্ধীর প্রার্থনা-সভায় বাংলা সরকারের শ্রমসচিব মিঃ সামসুদ্দীন আমেদ বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলেন, হিন্দু-মুসলমান যদি এইরূপ পরস্পর পরস্পরকে হত্যায় মত্ত হয় তাহা হইলে পাকিস্থান বা হিন্দুস্থান কিছুই পাওয়া যাইবে না—বাংলায় লীগ মন্ত্রি-মণ্ডলী প্রতিষ্ঠিত বলিয়া যদি মুসলমানেরা মনে করেন যে, তাঁহারা যাহা খুশি করিতে পারেন তাহা হইলে তাঁহারা ভুল করিয়াছেন—এইরূপ 'অরাজকতা মোগল, পাঠান বা কোন গভর্নমেণ্টই বরদাস্ত করেন নাই—একথা অবশ্য স্বীকার্য যে, কোন কোন অঞ্চলে অত্যাচারের ঝটিকা বহিয়া গিয়াছে—লুঠতরাজ, ধর্মান্তরিতকরণ, নারীর শ্লীলতাহানি ও হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হইয়াছে—জমিদারদের উপরই যদি প্রতিশোধ লওয়া হইয়া থাকে, তাহা হইলে বলপূর্বক ধর্মান্তরিত করা হইল কেন? আক্রান্ত অঞ্চলে কেবলমাত্র সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের লোকেরাই নির্যাতিত হইয়াছে।

বক্তৃতা-প্রসঙ্গে তিনি বলেন, মহাত্মা আজ এখানে আসিয়াছেন—ইহা যেমন আনন্দের বিষয়, তেমনি ইহা মনে করিয়া আমরা ব্যথিত হইয়া উঠিতেছি যে, বাংলায় হিন্দু ও মুসলমান পরস্পর যখন সংগ্রামে রত, মহাত্মা সেই সময়ই বাংলায় আসিয়াছেম এবং ঐ দুর্দৈবই মহাত্মাকে এখানে টানিয়া আনিয়াছে।

মিঃ আমেদ বলেন, পাকিস্থান বা হিন্দুস্থানের নামে হিন্দু-মুসলমান যদি পরস্পর পরস্পরের হত্যায় প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে হিন্দুস্থান বা পাকিস্থান কিছুই সম্ভবপর হইবে না। বর্তমানে ভারতে অন্তর্বর্তী গভর্নমেণ্ট এবং প্রদেশে স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠিত হইলেও একথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, আমরা প্রকৃত

স্বাধীনতা পাই নাই। ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট বর্তমানে ক্ষমতাত্যাগে রাজী হইয়াছেন, কিন্তু এই পারস্পরিক হত্যাকাণ্ড তাহাদিগকে এই অজুহাত দেখাইবার সুযোগ দিবে যে, ভারতীয়গণ নিজেদিগকে শাসন করিবার উপযুক্ত নয়। আমরা ভারত ত্যাগ করিয়া গেলে হিন্দু-মুসলমান পরস্পর পরস্পরের গলা কাটিবে। উভয় সম্প্রদায়ের নেতারা অতীতে আলাপ-আলোচনা করিয়াছেন, কিন্তু কোন মীমাংসায় পৌছিতে পারেন নাই। উহারা গোল-টেবিল বৈঠকে গিয়াছেন, সেখানেও নিজেরা-নিজেরা ঝগড়া করিয়াছেন। তদানীন্তন প্রধান মন্ত্রী র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ডকে তাঁহারা ভারতের উপর তাঁহাদের বাঁটোয়ারা চাপাইয়া দিবার সুযোগ দিলেন। ঐ বাঁটোয়ারা হিন্দু-মুসলমান কাহাকেও সন্তুষ্ট করিতে পারে নাই।

আজ মুসলমানেরা পাকিস্থান চাহিতেছে—নোয়াখালিতে তাহারা জনসংখ্যায় শতকরা ৭৫ হইতে ৮০ জন—নোয়াখালিতে তাহারা যাহা করিয়াছে তাহার দ্বারা কি তাহারা ইহাই বুঝাইতে চায় যে, এখানে হিন্দুরা স্ত্রী-পুত্র-পরিজন ও ধনসম্পত্তিসহ নিরাপদে বাস করিতে পারিবে না? আজ মুসলিম লীগ মন্ত্রিমণ্ডলী বাংলায় প্রতিষ্ঠিত—মুসলমানেরা যদি মনে করিয়া থাকেন যে, প্রধানমন্ত্রী ও অপর কয়েকজন মন্ত্রী যখন মুসলিম লীগভুক্ত, তখন মুসলমানেরা যাহা খুশি করিতে পারে, তাহা হইলে তাঁহারা গুরুতর ভুল করিয়াছেন—এই শ্রেণীর অরাজকতা কোন গভর্নমেণ্টই বরদাস্ত করিবে না—ভারতের ইতিহাসে কখনও, এমন কি যখন মোগল বা পাঠান রাজত্ব দেশে প্রতিষ্ঠিত ছিল তখনও এইরূপ জুলুম-জবরদস্তি ও অত্যাচার-উৎপীড়ন হইতে পারে নাই—এই অবস্থার মধ্যে কোন গভর্নমেণ্টেরই কাজ চালানো সম্ভবপর নয়। মন্ত্রীমহাশয় বলেন, আমরা জানিতে পারিয়াছি যে, এই সকল অঞ্চলে সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের উপর অত্যাচার হইয়াছে—একথা অস্বীকার করিয়া কোন লাভ নাই যে রামগঞ্জ হইতে চাঁদপুরের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল এবং তথা হইতে বেগমগঞ্জ পর্যন্ত অত্যাচারের ঝড় বহিয়া গিয়াছে—লুঠতরাজ, বলপূর্বক ধর্মান্তরিতকরণ ও হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হইয়াছে—আমি নিজে কোন কোন বিধ্বস্ত অঞ্চল পরিদর্শন করিয়াছি এবং ব্যক্তিগতভাবে দুর্গতদের সঙ্গে আলাপ করিয়াছি; কাজেই অপর কাহারও কথা বিশ্বাস করার আমার প্রয়োজন নাই—বলপূর্বক ধর্মান্তরিত করা হইয়াছে—সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের লোকদিগকে জোর করিয়া লুঙ্গি ও টুপি পরানো হইয়াছে—উহাদের নাম বদলান হইয়াছে—উহাদের নারীদের শ্লীলতাহানি করা

হইয়াছে—চাঁদপুর মহকুমায় চরহাইম এলাকায় একটি বাজার সমগ্রভাবে পোড়ানো হইয়াছে—সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের বহু বাড়ীও পুড়িয়া গিয়াছে। কুমিল্লা, নোয়াখালি, চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ ও বরিশালে—যে সকল স্থানে হিন্দুরা সংখ্যালঘিষ্ঠ—সেই সকল স্থানে যদি তাহারা ধনসম্পত্তিসহ মানমর্যাদা বজায় রাখিয়া নিরাপদে বাস করিতে না পারে, তাহা হইলে আজ যাঁহারা পাকিস্থানের স্বপ্ন দেখিতেছেন, তাঁহাদের কি তাহাতে কোন সুবিধা হইবে? ঐ সকল জেলার মুসলমান নেতাদের ও অপর যে সকল নেতা ঐ সকল অঞ্চলে ভ্রমণ করিতেছেন, হিন্দুদের মান-মর্যাদা, ধনপ্রাণ রক্ষা, অপরাধীদিগকে বাহির করিয়া দণ্ডদানের ব্যবস্থা করাও তাঁহাদের কর্তব্য।

মিঃ আমেদ বলেন—এরূপ বলা হইয়াছে যে, মুসলমান দাঙ্গাকারীরা জমিদারদের উপর প্রতিশোধ লইয়াছে। তাহাই যদি সত্য হয়, তাহা হইলে বলপূর্বক ধর্মান্তরিত করা কেন হইল? নোয়াখালিতে হিন্দু-মুসলমান পরস্পর পরস্পরকে হত্যা করে নাই; কেবলমাত্র সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ই সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়কে আক্রমণ করিয়াছিল। কোন কোন ক্ষেত্রে উহারা বাধাদান করিয়াছিল মাত্র।

সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়কে সম্বোধন করিয়া মন্ত্রী মহাশয় বলেন—আপনাদের উপর জুলুম হইয়াছে, ইহা অবশ্য স্বীকার্য, তবে ইসলাম কখনও জুলুম শিক্ষা দেয় না। ইসলাম গ্রহণের আকাঙ্ক্ষা লোকের অন্তর হইতে যদি স্বতঃস্ফূর্তভাবে উদিত হয় তবেই উহা গ্রাহ্য হইতে পারে। জোর করিয়া উহা কাহারও উপর চাপানো যাইতে পারে না। যাহাদিগকে জোর করিয়া মুসলমান করা হইয়াছে, তাহারা কোনক্রমেই মুসলমান হন নাই।

মন্ত্রীমহাশয় আরও বলেন, মুসলমানেরা যেন ইহা স্মরণ রাখেন যে, সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের ভয়ে যদি ৫ বা ১০ জন হিন্দুও ঐ অঞ্চল ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান, তাহা হইলে চিরকালের জন্য ইসলামের সুনামে কলঙ্ক লিপ্ত হইবে। পরস্পর মারামারি করিয়া পাকিস্থান, হিন্দুস্থান কিছুই পাওয়া যাইবে না; যদি হিন্দু-মুসলমান এইরূপ পারস্পরিক হত্যাকাণ্ডে মত্ত থাকে, তাহা হইলে তাহারা ভারতকে সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানের ম্যাণ্ডেটশাসিত দেশে পরিণত করিবে। এই সকল অঞ্চলের প্রত্যেক মুসলমানের উচিত, পল্লীত্যাগকারী হিন্দুদিগকে পুনরায় পল্লীতে আনিয়া বসানো ও তাহাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা। তিনি বলেন—আমি এই আশাই অন্তরে পোষণ করিতেছি যে, এই পৈশাচিক

হত্যাকাণ্ড ও ধ্বংসস্তূপ হইতে অধিকতর সমৃদ্ধ ও প্রভূত স্বাধীনতা-সম্পন্ন ভারতের আবির্ভাব হইবে এবং হিন্দু-মুসলমান শান্তি ও সম্প্রীতিতে বসবাস করিতে পারিবে।

উল্লিখিত বক্তৃতাদানের জন্য লীগের মুখপত্র দৈনিক 'আজাদে' মিঃ সামসুদ্দীন আমেদকে আক্রমণ করা হয়। আক্রমণের উত্তরে—মিঃ আমেদ এক বিবৃতিতে বলেন যে, সংবাদপত্রে তাঁহার যে বক্তৃতা প্রকাশিত হইয়াছে, তিনি তাহার প্রতিবাদ করিতে চান না, কারণ সংবাদপত্রে যাহা প্রকাশিত হইয়াছে, উক্ত অংশ তাঁহার বক্তৃতার অন্তর্ভুক্ত ছিল।

২৯শে অক্টোবর পূর্ববঙ্গের পথে মহাত্মা গান্ধী দিল্লী হইতে কলিকাতা আসিয়া পৌছেন। সোদপুরে এক সপ্তাহ অতিবাহিত করিবার পর গান্ধীজী পূর্ববঙ্গ অভিমুখে রওনা হন। শ্রীযুত সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত, শ্রীমতী হেমপ্রভা দেবী ও অন্যান্য বিশিষ্ট কর্মীবৃন্দও গান্ধীজীর সহিত যান।

তিনি সদলে ৭ই নভেম্বর চৌমুহনী পৌছেন। এই শহরটি নোয়াখালি হইতে সোয়া আট মাইল দূরবর্তী। ৮ই নভেম্বর চৌমুহনী হইতে গান্ধীজী রামগঞ্জ থানার গোপেরবাগ এবং লক্ষ্মীপুর থানার দত্তপাড়া পরিদর্শন করেন এবং পরদিন তিনি শেষোক্ত স্থানে তাঁহার শিবির স্থানান্তরিত করেন।

দত্তপাড়া শিবির হইতে তিনি ১১ই নভেম্বর রামগঞ্জ থানার এলাকাধীন নোয়াখোলা, সোনাচাকা, খিলপাড়া ও ১২ই নভেম্বর গোমাতলী এবং ১৩ই নভেম্বর লক্ষ্মীপুর থানার নন্দীগ্রাম পরিদর্শন করেন।

অতঃপর ১৪ই নভেম্বর রামগঞ্জ থানার এক মাইল দূরবর্তী কাজিরখিলে তাঁহার শিবির স্থানান্তরিত হয়। কাজিরখিল হইতে তিনি ১৫ই নভেম্বর নন্দনপুর, ১৬ই করপাড়া, ১৭ই দশঘরিয়া পরিদর্শন করেন। এইভাবে তিনি উপক্রত অঞ্চলের ১২টি গ্রামে যাইয়া তথাকার ধ্বংসলীলা দেখেন এবং গ্রামবাসীদের দুঃখদুর্দশার কাহিনী শ্রবণ করেন। তিনি দুর্গতদের সান্ত্বনা দেন এবং তাহাদিগকে ভয় পরিহার করিয়া সাহসী হইতে উদ্বুদ্ধ করেন।

এই দীর্ঘস্থায়ী পরিভ্রমণের পর গান্ধীজী একাকী একটি গ্রামে বাস করিবার সঙ্কল্প করেন এবং অহিংসার কর্মপদ্ধতি পরীক্ষা করিতে ইচ্ছা করেন। এই উদ্দেশ্যে রামগঞ্জের প্রায় তিন মাইল পশ্চিমে অবস্থিত শ্রীরামপুর গ্রাম তিনি নির্বাচিত করেন এবং ২০শে নভেম্বর বেলা প্রায় সাড়ে এগারটার সময় কাজিরখিল শিবির ত্যাগ করিয়া নৌকাযোগে একাকী তাঁহার নির্জন বাসস্থানের দিকে রওনা হন।

উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে শান্তি-সংস্থাপনের উদ্দেশ্যে তাঁহার দলের অন্যান্য কর্মী এবং শ্রীযুত সতীশচন্দ্র দাশগুপ্তও যাহাতে তাঁহার অনুসৃত পথে কার্যারম্ভ করেন, তিনি এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। সতীশবাবু অক্টোবর মাসের তৃতীয় সপ্তাহে যেসব কর্মীকে উপক্রত অঞ্চলে সেবাকার্যের জন্য কলিকাতা হইতে পাঠান তাঁহারা, সোদপুর হইতে তাঁহার সহিত আগত কর্মীরা এবং শ্রীচতুর্ভুষণ

চৌধুরীর নায়কত্বে ফেণী মহকুমায় মুথীরহাটে অবস্থিত খাদি প্রতিষ্ঠানের কর্মীরা তাঁহার দলে ছিলেন।

এইসব কর্মীরা এগারটি গ্রামে ছড়াইয়া গেলেন।

মহাত্মা গান্ধীসহ শান্তিমিশনের কর্মিগণ নিম্নলিখিত গ্রামসমূহে তাঁহাদের প্রধান কর্মকেন্দ্র স্থাপন করিয়া সেবা ও পুনঃসংস্থাপনের কাজে আত্মনিয়োগ করেন :—

(১) শ্রীরামপুর—মহাত্মা গান্ধী, তাঁহার স্টেনোগ্রাফার শ্রীপরশুরাম ও গান্ধীজীর সেক্রেটারী অধ্যাপক শ্রীযুত নির্মলকুমার বসু।

(২) চাঙ্গীরগাঁও—ডাঃ সুশীলা নায়ার ও শ্রীযুত সৌরীন্দ্রকুমার বসু।

(৩) কড়পাড়া—শ্রীমতী সুশীলা পাই ও শ্রীযুত দেবী চৌধুরী।

(৪) ভাটিয়ালপুর—শ্রীপিয়ারীলাল ও শ্রীবিশ্বরঞ্জন সেন।

(৫) পরকোট—শ্রীকানু গান্ধী ও শ্রীভূপালচন্দ্র কামার। শ্রীকানু গান্ধী পরে তাঁহার কর্মকেন্দ্র রামদেবপুরে স্থানান্তরিত করেন।

(৬) পানিয়ালা—শ্রীমতী আভা গান্ধীর পিতা শ্রীঅমৃতলাল চ্যাটার্জি।

(৭) চরমণ্ডল—শ্রীঠক্কর বাপা, শ্রীমতী আভা গান্ধী ও শ্রীঅরুণাংশু দে। শ্রীঠক্কর বাপা পরে হাইমচরে এবং শ্রীমতী আভা গান্ধী ও শ্রীঅরুণাংশু দে শিরণ্ডীতে তাঁহাদের কর্মকেন্দ্র স্থাপন করেন।

(৮) মান্দোরা—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সরকার।

(৯) দশঘরিয়া—শ্রীপ্রভুদাস প্যাটেল ও শ্রীসাধনেন্দ্র মিত্র।

(১০) আমিষাপাড়া—শ্রীসুধীরচন্দ্র লাহা ও শ্রীউপেন্দ্রনাথ দাস। শ্রীযুত সতীশচন্দ্র দাশগুপ্তের পরিচালনাধীনে কাজিরখিলে প্রধান কর্মকেন্দ্র স্থাপিত হয়। কাজিরখিল ক্যাম্প রামগঞ্জ হইতে প্রায় ৫ মাইল দূরে অবস্থিত। কাজিরখিল কেন্দ্রের সহিত অন্যান্য সমস্ত কর্মকেন্দ্রের যোগাযোগ রক্ষা করিয়া চলিতে হয়। কাজিরখিল ক্যাম্প হইতে শ্রীযুত সতীশ দাশগুপ্তের সম্পাদনায় "শান্তিমিশন দিনলিপি" নামে একটি দৈনিকপত্র (সাইক্লোস্টাইলে ছাপা) প্রকাশিত হয়। এই পত্রে প্রধানতঃ কর্মীদের নির্দেশ দেওয়া হয় এবং গান্ধীজীর দৈনন্দিন কার্যাবলী লিপিবদ্ধ করা হইত। দৈনন্দিন সংবাদও কিছু কিছু থাকে। কাজিরখিল ক্যাম্পে ব্যাটারীর দ্বারা পরিচালিত একটি রেডিও বসানো হয়। প্রত্যহ প্রাতে ও অপরাহ্ণে এই বেতারযন্ত্রের সাহায্যে সংগৃহীত সংবাদসমূহ লিপিবদ্ধ করিয়া বিশেষ লোক মারফত দ্রুত মহাত্মাজীর নিকট প্রেরিত হইত।

'নোয়াখালি শান্তি মিশন ও রিলিফ প্রতিষ্ঠানের' উদ্যোগে আর একটি বিভাগ খোলা হয়। এই বিভাগের দ্বারা একটি দাতব্য চিকিৎসালয় পরিচালিত হয়। এই হাসপাতালে রাখিয়া রোগীদের পরিচর্যার ও চিকিৎসার ব্যবস্থাও করা হয়। উক্ত কেন্দ্রের বুনিয়াদী শিক্ষা-বিভাগের কাজও গঠনমূলক পরিকল্পনা অনুযায়ী পুরাদমে চলিতে থাকে।

সোদপুরে গান্ধীজী

পূর্ববঙ্গের উপদ্রুত অঞ্চল পরিদর্শনের পথে ২৯শে অক্টোবর সন্ধ্যায় মহাত্মা কলিকাতা পৌছেন। মহাত্মাজীকে লিলুয়া স্টেশনে নামানো হয়। স্টেশনে অবতরণ করিয়াই মহাত্মাজী বাংলার সাম্প্রদায়িক অবস্থার সর্বশেষ সংবাদ জানিতে চাহেন। নোয়াখালিযাত্রার পূর্ব পর্যন্ত তিনি সোদপুরে খাদি প্রতিষ্ঠানে অবস্থান করেন।

৩১শে অক্টোবর সোদপুরে প্রার্থনা-সভায় গান্ধীজী বলেন যে, পরদিন তাঁহার নোয়াখালিযাত্রা করা হইবে না। কারণ সেদিন তাঁহার নোয়াখালি-যাত্রার জন্য ব্যবস্থা করা হইবে না বলিয়া প্রধান মন্ত্রী মহাশয় বলিয়া পাঠাইয়াছেন। কাজেই শনিবার বা রবিবার তিনি রওনা হইতে পারিবেন বলিয়া আশা করেন। এই অবসরে এইস্থানে যতদূর সম্ভব তিনি তাঁহার কর্তব্য করিবেন। মানুষ আজ পশুর ন্যায় নিজেদের মধ্যে হানাহানি করিতেছে। এই বিবাদ কলিকাতা বা বাংলা বা ভারত বা জগতের কোন উপকারেই আসিবে না।

মহাত্মা আরও বলেন, জীবনের আরম্ভ হইতেই তিনি বিবদমান দলের মধ্যে শান্তি স্থাপন করিয়া আসিতেছেন। আইনজীবী হিসাবেও তিনি সর্বদা দুই পক্ষের মধ্যে মিটমাটের চেষ্টা করিতেন। তিনি আশাবাদী, এই আত্মঘাতী কলহ যাহাতে বন্ধ হইয়া পুনরায় উভয় সম্প্রদায় একপ্রাণ হয়, তজ্জন্য তাঁহার এই প্রার্থনার সঙ্গে সবাই যেন যোগ দেয়, ইহাই তাঁহার একমাত্র কাম্য।

৩রা নভেম্বর প্রার্থনান্তিক বক্তৃতায় বলেন যে, শিশুকাল হইতেই তিনি অন্যায়কে ঘৃণা করিতে শিখিয়াছেন। কিন্তু অন্যায়কারীকে কোনদিনই তিনি ঘৃণা করেন নাই। মুসলমানেরা যদি কোন অন্যায়ও করিয়া থাকেন তথাপি তাঁহারা তাঁহার বন্ধুই থাকিবেন।

বিহারের ঘটনাবলীর কথা উল্লেখ করিয়া মহাত্মা বলেন, বিহারের ঘটনাবলীর কথা শুনিয়া আমি অপরিসীম বেদনাবোধ করিতেছি। রক্তপাত করা হইয়াছে, অতএব রক্তপাত করিয়াই উহার প্রতিশোধ লইব—ইহা বর্বরের নীতি। ……কতিপয় মুসলমান উদ্বেগের দরুন পলায়ন করিতে চেষ্টা করিলে বিহারী হিন্দুরা তাহাদের হত্যা করিয়াছে—এই সংবাদ শুনিয়া আমি স্তম্ভিত হইয়াছি।

মহাত্মা বলেন, সমগ্র মানবসমাজকে নিজের পরিবারের লোক মনে করাই বিশ্বের সহিত মৈত্রী-প্রতিষ্ঠার সহজ উপায়।

৫ই নভেম্বর মহাত্মাজী প্রধান মন্ত্রী মিঃ সুরাবর্দীর বাসভবনে লীগ-নেতৃবৃন্দের সহিত তদানীন্তন পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনা করেন।

প্রার্থনা-সভায় গান্ধীজী এই আলোচনার উল্লেখ করিয়া বলেন যে, নোয়াখালি তাঁহাকে আহ্বান জানাইয়াছিল, এক্ষণে বিহার হইতেও তাঁহার ডাক আসিয়াছে। "আমি এইমাত্র শহীদ সাহেবের গৃহ হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়াছি। আমার সহিত সাক্ষাতের জন্য মন্ত্রিগণ ও লীগ-নেতৃবৃন্দ তথায় সমবেত হইয়াছিলেন। আমি বিহার যাই এই ইচ্ছাই তাঁহারা প্রকাশ করেন।………আমি ঈশ্বরের দাস—তাঁহার ইচ্ছানুসারেই কাজ করিব।

৬ই নভেম্বর গান্ধীজী সোদপুর হইতে স্পেশাল ট্রেনে নোয়াখালি যাত্রা করেন। শ্রমসচিব মিঃ সামসুদ্দিন আমেদ, প্রধান মন্ত্রীর পার্লামেণ্টারী সেক্রেটারী মিঃ কে. নসরুল্লা এবং অর্থসচিবের পার্লামেণ্টারী সেক্রেটারী মিঃ আবদুর রসিদ গান্ধীজীর সহিত গমন করেন।

নোয়াখালি যাওয়ার প্রাক্কালে গান্ধীজী মন্তব্য করেন, প্রয়োজন হইলে বাংলার মাটিতেই আমি প্রাণত্যাগ করিব—বাংলার মাটিতেই আমি অস্থিপঞ্জর ফেলিয়া যাইব।

নোয়াখালির পথে গোয়ালন্দ স্টেশনে দর্শনার্থী জনতাকে লক্ষ্য করিয়া গান্ধীজী বলেন যে, লাঞ্ছিত ও অত্যাচারিতদের অশ্রুমোচন ও তাহাদের সান্ত্বনা-দানের উদ্দেশ্যেই তিনি নোয়াখালি যাইতেছেন।……বাংলার হিন্দু-মুসলমান যতদিন না তাঁহাকে বলিবে যে, তাঁহার আর বাংলায় উপস্থিতির প্রয়োজন নাই ততদিন তিনি যাইবেন না।

৭ই নভেম্বর সকালে চাঁদপুরে কিয়োয়াই জাহাজে পরলোকগত হরদয়াল নাগের পুত্র সহ কুড়ি পঁচিশ জন কর্মী এবং কয়েকটি সাহায্য প্রতিষ্ঠানের

প্রতিনিধি গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাৎ করেন। ঐ সময় গান্ধীজী তাঁহাদের নিকট তাঁহার মনোভাব ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, "আমি ভাবিতেই পারি না যে একজন লোককেও বলপূর্বক ধর্মান্তরিত করা যায়, অথবা একজন নারীকে হরণ করা বা তাহার উপর পাশবিক অত্যাচার করা যায়। যতদিন আমরা মনে করিব যে, আমাদের উপর এজাতীয় অত্যাচার করা যাইবে, ততদিন আমাদের উপর অত্যাচার চলিতে থাকিবে। আমরা যদি বলি যে, পুলিস ও সৈন্য ছাড়া আমাদের আত্মরক্ষা করা যাইবে না, তাহা হইলে যুদ্ধারম্ভের পূর্বেই আমাদের হার মানিয়া লইতে হইবে। সৈন্য বা পুলিস ভীরুদের আদৌ রক্ষা করিতে সমর্থ নহে। আপনারা একযোগে পূর্ববঙ্গ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবেন, আমি এই প্রস্তাবের বিরোধী।"

এইদিন গান্ধীজী স্পেশাল ট্রেনে চাঁদপুর হইতে চৌমুহনী পৌছেন। হাজিগঞ্জে ট্রেন থামিলে আগ্রহাকুল নরনারীকে সম্বোধন করিয়া গান্ধীজী বলেন যে, যতদিন না এই প্রদেশের হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতির সহিত শান্তিতে বসবাস করিতে শিখিতেছে ততদিন তিনি বাংলা ত্যাগ করিবেন না।

পরে লাকসাম স্টেশনে গান্ধীজীর ট্রেনটি থামে। উভয় সম্প্রদায়ের নরনারীর বিপুল জনতা মহাত্মার দর্শনের জন্য ভোর হইতে অপেক্ষা করিতেছিল। তাহাদের উদ্দেশ্যে তিনি কয়েক মিনিট বক্তৃতা করেন। মহাত্মা তাহাদের লক্ষ্য করিয়া বলেন যে, তিনি এই প্রদেশের হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিবাদ-বিসম্বাদ মিটাইতে আসিয়াছেন। যতদিন একটি বালিকা পর্যন্ত দুর্বৃত্তের ভয় করিবে, ততদিন তিনি বাংলা ত্যাগ করিবেন না। প্রয়োজন হইলে তিনি এখানেই প্রাণত্যাগ করিবেন। তিনি আরও বলেন যে, আল্লা-হো-আকবর ধ্বনিতে ভীত হওয়া কাহারও উচিত নহে। ঐ ধ্বনির অর্থ "ভগবান সর্বশক্তিমান"। যদি কেহ ঐ ধ্বনি করিয়া কাহাকেও হত্যা করে তবে তাহার ভয় পাওয়া উচিত নহে, কারণ উহা ভগবানের শক্তি। কোন সত্যিকারের মুসলমান এই কুকার্যে অংশ গ্রহণ করেন নাই। তিনি মুসলমানদের ও দুর্বৃত্তদের চেনেন।

৮ই নভেম্বর চৌমুহনীতে গান্ধীজীর প্রার্থনা-সভা হয়। প্রার্থনা-সভায় বিপুল জনসমাগম হইয়াছিল। জনতার শতকরা ৮০ জনের উপর মুসলমান ছিলেন।

প্রার্থনান্তিক বক্তৃতায় গান্ধীজী আলি ভ্রাতৃদ্বয়ের সহিত তাঁহার পূর্ববঙ্গে সফরের কথা উল্লেখ করেন।

গান্ধীজী বলেন যে, অন্যান্য বার পূর্ববঙ্গ ভ্রমণের সময় তিনি প্রধান প্রধান

শহরগুলি ভ্রমণ করিয়াছেন, কিন্তু এইবার তিনি ভগ্নহৃদয়ে তাহাদের নিকট উপস্থিত হইয়াছেন। ভারতমাতা এমন কি পাপ করিয়াছেন, যাহার জন্য তাঁহারই সন্তান হিন্দু ও মুসলমান পরস্পর কলহ করিতেছে। তিনি জানিতে পারিয়াছেন যে, পূর্ববঙ্গের কোনও অঞ্চলে আজ কোনও হিন্দু রমণীই নিরাপদ নহে। বাংলাদেশে আসিবার পর হইতেই তিনি নৃশংসতার নানা প্রকার অদ্ভুত কাহিনী শুনিতেছেন। প্রধান মন্ত্রী শহীদ সাহেব এবং সামসুদ্দিন সাহেব স্বীকার করিয়াছেন যে, এইসব কাহিনীর মধ্যে অনেক সত্য বর্তমান। তিনি মুসলমানদের সহিত হিন্দুদের সংগ্রাম করার জন্য বলিতে আসেন নাই, কারণ তাঁহার কোন শত্রু নাই।......তিনি কোরান পাঠ করিয়াছেন। ইসলাম শান্তি চায়। মুসলমানদের অভ্যর্থনায় "ইসলাম আলায়কুম" সকলের প্রতিই সমভাবে প্রযোজ্য। নোয়াখালি এবং ত্রিপুরায় যাহা ঘটিয়াছে ইসলাম তাহা কখনও সমর্থন করে না। শহীদ সাহেব, অন্যান্য মন্ত্রিগণ এবং লীগ-নেতৃবৃন্দ কলিকাতায় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। তাঁহারা সকলেই এই ঘটনার নিন্দা করিয়াছেন।

১০ই নভেম্বর মহাত্মা গান্ধী দত্তপাড়ায় গমন করেন।

অপরাহ্ণে দত্তপাড়ায় এক বিরাট সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে মহাত্মাজী নোয়াখালির প্রত্যেকটি উপদ্রুত অঞ্চল স্বচক্ষে পরিদর্শনের সঙ্কল্প ব্যক্ত করেন। বিভিন্ন গ্রামে যে সকল রিলিফকেন্দ্র রহিয়াছে, উহার প্রত্যেকটিতেই তিনি কয়েকদিন অবস্থান করিবেন এবং সে সকল কেন্দ্র হইতে চতুর্দিকস্থ উপদ্রুত প্রত্যেকটি গ্রাম পরিদর্শনের কাজ শেষ করিবেন। তিনি আরও বলেন, "এক সপ্তাহ অবস্থানের সঙ্কল্প লইয়া আমি নোয়াখালিতে আসি নাই। অদূর ভবিষ্যতে নোয়াখালি ত্যাগের সঙ্কল্পও আমার নাই।"

১২ই নভেম্বর মহাত্মা গান্ধী রামগঞ্জ থানায় একটি গ্রাম পরিদর্শন করেন। বেলা ১১টায় তিনি নৌকাযোগে দত্তপাড়া হইতে যাত্রা করেন এবং শ্রীযুত সতীশ দাশগুপ্ত, শ্রীযুক্তা স্থচেতা কৃপালনী ও শ্রীযুত পিয়ারীলালকে সঙ্গে লইয়া উক্ত গ্রামে উপস্থিত হন। সেখানে ৫৪টি গৃহ ভস্মীভূত হইয়াছে। অগ্নি-সংযোগের পূর্বে একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের তিনটি গৃহ ছাড়া প্রত্যেকটি গৃহই লুণ্ঠন করা হয়।

মহাত্মা গান্ধীকে জানানো হয় যে, লুণ্ঠন ও গৃহদাহের পর বাড়ীর বাসিন্দাগণকে ধর্মান্তরগ্রহণে বাধ্য করা হয়। কয়েকদিন পর ১৫২ জন

গ্রামবাসীকে উদ্ধার করার চেষ্টা করা হইলে গুণ্ডারা তাহাদের উপর আক্রমণ চালায় এবং তাহাদিগকে গ্রামে ফিরাইয়া নেয়। তাঁহাকে আরও জানান হয় যে, এই আক্রমণে ১৫ জন নিহত ও ৩০ জন আহত হইয়াছে। উদ্ধারকারী দলের সহিত যে দুইজন সশস্ত্র সৈন্য ছিল, গুণ্ডাদের আক্রমণ সত্ত্বেও তাহারা গুলি চালায় নাই।

গ্রামের তিনটি বাড়ীতে তখনও স্ত্রীলোকেরা ছিলেন। গান্ধীজী তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাদের দুর্দশার কাহিনী অবগত হন। মহাত্মাজীর সহিত কথা বলার সময় তাঁহাদের চোখে অশ্রু নামিয়া আসে।

১২ই নভেম্বর গান্ধীজীর প্রার্থনা-সভায় বক্তৃতাকালে বসিকপুর ইউনিয়ন বোর্ডের ভাইস-প্রেসিডেন্ট মিঃ আব্দুল ওয়াহেব গ্রামে ফিরিয়া যাইবার জন্য আশ্রয়প্রার্থীদের অনুরোধ জানান। তিনি বলেন, হিন্দুগণকে রক্ষা করিতে মুসলমানেরা প্রস্তুত রহিয়াছে। হিন্দুরা পুনরায় গ্রামে ফিরিয়া আসুক, ইহাই তাহাদের ইচ্ছা। মুসলমানরা এখানে আসিয়া তাহাদের হিন্দু-ভাইগণকে গ্রামে ফিরাইয়া লইবে। মিঃ ওয়াহেব বলেন, বিগতকালের ঘটনাবলী আপনারা বিস্মৃত হউন।

মহাত্মা গান্ধী চৌধুরী পরিবারের বসতবাটী পরিদর্শন করেন। এই বাড়ীতে তিনটি বালক সহ পরিবারের আটজন পুরুষকে দুর্বৃত্তদল হত্যা করিয়াছে বলিয়া গান্ধীজীকে জানানো হয় এবং বাড়ীর ৩৫টি ঘর ভস্মীভূত হইয়াছে।

সঙ্গীদল সমভিব্যাহারে মহাত্মাজী বাড়ীর আঙ্গিনায় প্রবেশ করিলে পর প্রথমেই তাঁহার চক্ষে পড়িল তিনটি নরকঙ্কাল ও চতুর্দিকে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত মানুষের হাড় এবং ইহাদের পাশে পাহারায় রত এক তিব্বতী কুকুর। এই কুকুরটি এক সময়ে এই পরিবারের সকলেরই অত্যন্ত প্রিয় ছিল। যে বাড়ীতে এক সময়ে সকলেই পরস্পরের মধ্যে আত্মীয়তাসূত্রে আবদ্ধ পৃথক পৃথক পরিবারের ৮০ জন লোক বাস করিতেন, সেই স্থানে একমাত্র জীবিত প্রাণী কুকুরটি তখন একক জীবনযাপন করিতেছিল। পার্শ্ববর্তী গ্রামসমূহে গোলযোগ আরম্ভ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই বাড়ীর ৮জন প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের উপর পরিবারের কতক স্ত্রীলোককে সঙ্গে করিয়া সরাইয়া নেওয়ার ভার দেওয়া হয়। এই ৮জন ফিরিয়া আসার পূর্বেই ১২ই অক্টোবর শোচনীয় ঘটনা ঘটে।

মহাত্মাজী কিছুক্ষণ অস্থিপুঞ্জের সম্মুখে দাঁড়াইলেন। এই সময়ে একটি দগ্ধীভূত গৃহের পাকা ভিতের প্রতি মহাত্মাজীর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। এই

স্থানেই মৃতদেহগুলি অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। তাঁহাকে তিনটি অর্ধখনিত কবরও দেখান হয়। পরে শবগুলি এই কবরে পুঁতিয়া রাখা হয়। অতঃপর গান্ধীজীকে একটা শূন্য টিনের ঘরে লইয়া যাওয়া হয়। এই ঘরের সমস্ত জিনিসপত্র অপসারিত করা হয়; ঘরের মেঝেতে তখনও রক্তের চিহ্ন ছিল। মহাত্মাজীকে বলা হয় যে, ম্যাট্রিকুলেশন ক্লাসের একটি বালক তাহার পিতামহীর সহিত এই ঘরে বাস করিত। ঘরের সিমেণ্ট করা মেঝেটির সর্বত্র তাহার সমস্ত পুস্তক ও ছিন্ন খাতাপত্র ছড়ানো রহিয়াছিল।

ইহার পর মহাত্মাজীকে অপর একটি ঘরের বাঁধানো ভিত দেখাইতে লইয়া যাওয়া হয়। এই ঘরের দরজা ও জানালার কাঠামো অর্ধদগ্ধ এবং ইহার পাশেই ভস্মস্তূপের মধ্যে অপর একটি নরকঙ্কাল পড়িয়া ছিল। গান্ধীজী দুই দিকে শ্রেণীবদ্ধ অগ্নিদগ্ধ গৃহ, মোচড়ান ঢেউতোলা টিন, অগ্নিদগ্ধ দরজা ও জানালার ফ্রেম প্রভৃতি ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পান।

১৩ই নভেম্বর লক্ষ্মীপুর থানার অন্তর্গত এক গ্রামে সান্ধ্য-প্রার্থনার পর সমবেত গ্রামবাসীরা গ্রামে পুনঃ প্রত্যাবর্তন সম্পর্কে গান্ধীজীকে প্রশ্ন করে। উত্তরে গান্ধীজী তাহাদের নিকট ১৫ দিন সময় চাহিয়া লন। তিনি বলেন যে, তাহাদের আরও ১৫ দিন অপেক্ষা করিতে হইবে, পরে তিনি তাহাদের প্রত্যাবর্তন করিতে অথবা অন্যরূপ নির্দেশ দিবেন। তিনি জানান যে, বাংলার প্রধান মন্ত্রীকে তিনি এসম্পর্কে পত্র লিখিয়াছেন। উত্তর পাইলেই তিনি তাহাদের নির্দেশ দিতে সক্ষম হইবেন।

এইদিন গান্ধীজী দত্তপাড়ার ৫ মাইল দূরে নন্দীগ্রাম পরিদর্শন করেন। স্ত্রী-পুরুষ, বালক-বালিকা তখনও যাহারা গ্রামে ছিল, তাহারা দলবদ্ধ হইয়া যুক্ত-করে সাশ্রুনয়নে গান্ধীজীকে অভ্যর্থনা করে। তাহাদের অনেকেই আত্মীয়-স্বজন হারাইয়াছে।

গ্রামবাসীরা সাংবাদিকদের বলে যে, ১২ই অক্টোবর তাহাদের দুঃখের দিন আরম্ভ হয়। নন্দীগ্রাম ও তৎসংলগ্ন শ্রীপুর হইতে উপদ্রবকারীরা আনুমানিক ২৫ হাজার টাকা আদায় করে। দূরবর্তী ও নিকটবর্তী অঞ্চল হইতে আগত প্রায় ১০ হাজার লোক এই লুঠতরাজে যোগ দেয়। তাহারা বলে যে, লুণ্ঠনকারীদের মধ্যে স্ত্রীলোক এবং বালক-বালিকারাও ছিল। এই গ্রামে ৮জন নিহত হইয়াছে।

১৬ই নভেম্বর, বাংলার অসামরিক সরবরাহসচিব মিঃ আবদুল গফরান,

কৃষিমন্ত্রী মিঃ আহম্মদ হোসেন এবং পার্লামেণ্টারী সেক্রেটারী মিঃ নসরুল্লা ও মিঃ আবদুর রসিদ কাজিরখিলে মহাত্মা গান্ধীর সহিত তাঁহার শিবিরে সাক্ষাৎ করেন এবং আশ্রয়প্রার্থীদের পুনর্বসতি সম্পর্কে আলোচনা করেন। মিঃ আবদুল হাকিম এম. এল. এ., নিখিল ভারত লীগ কাউন্সিলের সদস্য মিঃ এ. জে. খদ্দর এবং স্থানীয় নেতা মৌলানা জহিদুল হক এই সাক্ষাৎকালে তাঁহাদের সঙ্গে ছিলেন। আলোচনাকালে তাঁহারা গান্ধীজীর সভায় মুসলমানদের অনুপস্থিতির বিষয় উল্লেখ করেন এবং বলেন যে, মুসলমানদের মনে গ্রেপ্তার হওয়ার ভয়ই ইহার একমাত্র কারণ।

এইদিন মহাত্মা গান্ধী প্রাদেশিক হিন্দু-মহাসভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন চৌধুরী ও আরও অনেকের সহিত নৌকাযোগে রামগঞ্জের ৫ মাইল দক্ষিণে করপাড়ায় স্বর্গীয় রাজেন্দ্রলাল রায়ের ভস্মীভূত ও পরিত্যক্ত গৃহ পরিদর্শন করেন। দাঙ্গার সময় এখানকার ৩০টি পরিবারের ঘরবাড়ী একেবারে ধ্বংস করা হয়।

গান্ধীজী রামগঞ্জে সকলের সম্মুখে প্রার্থনা-সভায় বক্তৃতা করেন। প্রার্থনা-সভায় যে সকল নরনারী যোগদান করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই হিন্দু। গান্ধীজী তাঁহাদের উদ্দেশে বলেন, এ কয়দিনের দুঃখদুর্দশার কাহিনী ছাড়া তিনি আর কিছুই বলিতে পারিবেন না। যেখানেই তিনি গিয়াছেন সেইখানেই তিনি ধ্বংসকার্যের মর্মান্তিক দৃশ্যই দেখিয়াছেন। তাঁহার নয়নে অশ্রু ছিল না। যাহারা অশ্রুত্যাগ করে, তাহারা কখনই অপরের অশ্রুমোচন করিতে পারে না। কিন্তু তাঁহার হৃদয় বেদনা-ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছে।

তিনি এই আশা লইয়া এখানে আসিয়াছেন যে, মুসলমানদের সহিত তিনি খোলাখুলিভাবে কথা বলিবেন; মুসলমানরা তাঁহাদের অন্যায় কার্যের জন্য অনুতাপ করিবেন এবং গৃহত্যাগ না করিবার জন্য তাঁহারা হিন্দুদিগকে অনুরোধ করিবেন। যদি তাঁহারা সত্যসত্যই অনুতপ্ত হন তাহা হইলে হিন্দুদের মধ্যে আস্থা ফিরিয়া আসিবে। পূর্ববঙ্গে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে তিক্ততার সৃষ্টি হইয়াছে। কারণ যাহাই হউক, মুসলমান ভ্রাতৃবৃন্দ তাঁহাকে এই কথা বলিতে দিবেন যে, তিনি যতদূর জানেন পূর্ববঙ্গে মুসলমানরাই আক্রমণকারী। প্রাসাদোপম গৃহাদি ধ্বংস করা হইয়াছে—এমন কি বিদ্যালয়ভবন ও মন্দিরসমূহ ধ্বংসের কবল হইতে রক্ষা পায় নাই। বলপূর্বক ধর্মান্তরিতকরণ এবং নারীহরণ অনুষ্ঠিত হইয়াছে। সেইজন্য হিন্দুরা তাহাদের ভয়ে ভীত। অন্যের মনে ভীতির সঞ্চার করিয়া মানুষ তাহার অধঃপতনেরই পরিচয় দেয়।

১৭ই নভেম্বর—কাজিরখিলে গান্ধীজীর আবাসস্থানের একমাইল দূরে মধুপুর হাইস্কুলের খেলার মাঠে গান্ধীজীর সান্ধ্য-প্রার্থনা হয়। প্রার্থনাস্থলে যাইবার সময় গান্ধীজী ধানক্ষেতের আঁকাবাঁকা পথ ধরিয়া চলেন। স্ত্রী-পুরুষ বালক-বালিকার প্রায় এক মাইল দীর্ঘ শোভাযাত্রা গান্ধীজীকে অনুসরণ করে।

গান্ধীজীর প্রার্থনা-সভায় যাহারা যোগ দিয়াছিল, তাহাদের অধিকাংশই আশ্রয়প্রার্থী। এক সময়ে তাহাদের সকলেরই অবস্থা ভাল ছিল। কিন্তু এক্ষণে তাহারা পথের ভিখারী। তাহাদের অধিকাংশের পরিধানে জীর্ণ বস্ত্র, কেশ রুক্ষ এবং মুখে আতঙ্কের ছায়া। প্রার্থনা-সভায় দুই সহস্রেরও অধিক নারী সমবেত হইয়াছিল। কয়েকদিন পূর্বে তাহাদের অনেকেরই হাতে বালা এবং সিঁথিতে সিঁদুর ছিল না। কিন্তু যখন কলিকাতা হইতে মহিলাগণ সাহায্য দিবার জন্য আসেন তখন তাহারা তাঁহাদের নিকট নূতন বালা ও নূতন সিঁদুর পায়। তাহারা এমনই ভীত হইয়াছিল যে, পুরুষ-প্রহরীর সঙ্গ ছাড়া তাহারা যাইতে চাহে নাই।

প্রার্থনা-সভায় বহু মুসলমান উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাদের অনেকে গান্ধীজীর প্রার্থনায় যোগ দেন এবং প্রার্থনার মধ্যে কোরানের অংশ আবৃত্তি করায় আনন্দ প্রকাশ করেন। প্রার্থনা-স্তোত্রের সহিত কোরানের ঐ অংশ শ্রীযুক্ত কানু গান্ধী প্রত্যহ কীর্তন করিতেন।

সরবরাহসচিব মিঃ আবদুল গফরানও প্রার্থনা-সভায় বক্তৃতা করেন। দাঙ্গায় অনুষ্ঠিত কার্যের জন্য দুঃখপ্রকাশ করিয়া মিঃ গফরান হিন্দু ভ্রাতৃবৃন্দকে জন্মভূমিতে প্রত্যাবর্তন করিতে অনুরোধ জানান।

১৭ই নভেম্বর, মহাত্মা গান্ধী রামগঞ্জ থানা এলাকায় আর একটি পল্লী পরিদর্শন করেন। ঐ গ্রামে দাঙ্গার সময় কি পরিমাণ ক্ষতি হইয়াছিল, গান্ধীজী তাহা স্বয়ং দেখেন নাই; তবে তাঁহার সঙ্গিগণ তাহা দেখিয়াছিলেন। ঐ গ্রামের বহুসংখ্যক বাড়ী ভস্মীভূত হইয়াছে; তখন কেবল কাঁচা ও পাকা ভিটা অবশিষ্ট ছিল।

গান্ধীজী স্থানীয় মুসলমানদের সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং এক সাধারণ সভায় তাহাদের নিকট বক্তৃতা করেন।

১৮ই নভেম্বর, কাজিরখিল ক্যাম্প প্রাঙ্গণে গান্ধীজীর প্রার্থনা-সভা হয়। এইদিন মৌনদিবস থাকায় এক লিখিত বাণীতে গান্ধীজী বলেন যে, তিনি এই অঞ্চলে যতই ভ্রমণ করিতেছেন ততই দেখিতেছেন তাহাদের সর্বাপেক্ষা বড়

শত্রু ভয়। তিনি আরও বলেন যে, জনসাধারণ কর্তৃক নির্ভীকতার অনুশীলন না হওয়া পর্যন্ত ভারতের এই অংশে কখনও হিন্দু-মুসলমানদের পক্ষে শান্তি নাই। সুতরাং যথার্থ শান্তিস্থাপনের উদ্দেশ্যে তিনি প্রস্তাব করিয়াছেন যে, প্রত্যাগমনেচ্ছু আশ্রয়প্রার্থীদের সঙ্গে যাওয়ার জন্য উপক্রত প্রত্যেক গ্রামে একজন সৎ হিন্দু ও একজন সৎ মুসলমান থাকা চাই।

১৯শে নভেম্বর মধুপুর আশ্রয়শিবিরে গান্ধীজীর প্রার্থনা-সভা হয়।

২০শে নভেম্বর মহাত্মা বাহির হইলেন হিংসা ও অসত্যের ঘোর তমসার মধ্যে, আলোকের সন্ধানে। এই একক পল্লীপরিক্রমায় যাঁহারা গান্ধীজীর সহগামী হওয়ার অভিপ্রায় জানাইয়াছিলেন, তাঁহাদের তিনি এই বলিয়া বিরত করিলেন যে, তিনি যদি এই সূচীভেদ্য অন্ধকারের মধ্য হইতে আলোকের চিহ্ন-মাত্র দেখিতে পাইতেন, তাহা হইলে আনন্দের সঙ্গেই তিনি তাঁহাদের প্রস্তাবে সম্মত হইতেন।

একজন স্টেনোগ্রাফার ও অধ্যাপক শ্রীযুত নির্মল বসুকে সঙ্গে লইয়া গান্ধীজী কাজিরখিল হইতে নৌকায় চারি মাইল পশ্চিমে শ্রীরামপুরে রওনা হন। রওনা হইবার প্রাক্কালে তিনি অন্যান্য সহকর্মীদের বিভিন্ন গ্রামে যাইয়া আতঙ্কগ্রস্ত পল্লীবাসীদের মধ্যে বাস করিতে নির্দেশ দেন। দুই ঘণ্টা ভ্রমণের পর গান্ধীজী শ্রীরামপুরে তাঁহার বাসস্থানে পৌছেন। ধানক্ষেতের মধ্যে টিননির্মিত ছোট একখানি ঘর। চারদিকে নারিকেল-সুপারির বাগান।

মহাত্মাজীর কাজিরখিল হইতে যাত্রার পূর্বে এক বিশেষ প্রার্থনার অনুষ্ঠান হয়। সকলের নয়নই অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠে। গান্ধীজীকেও গম্ভীর দেখাইতেছিল। নৌকা ছাড়িবার পূর্বে তিনি তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ স্মিত হাস্যের দ্বারা সকলকে বিদায়-সম্ভাষণ জানান।

২০শে নভেম্বর, মহাত্মা গান্ধী তাঁহার সহকর্মীদের নির্দেশ দিয়া ও তাঁহার একক ভ্রমণের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিয়া নিম্নলিখিত বিবৃতি দেন :—

আমি আজ অতিরঞ্জন ও অসত্যতার মধ্যে বাস করিতেছি। ইহার মধ্য হইতে সত্যের সন্ধান পাইতেছি না। পরস্পরের প্রতি তীব্র অবিশ্বাসে পুরাতন বন্ধুত্বের গ্রন্থি বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। যে সত্য এবং অহিংসার আশ্রয় আমি গ্রহণ করিয়াছি, যাহা আজ ৬০ বৎসর ধরিয়া আমাকে রক্ষা করিয়া আসিতেছে, তাহার সেই ক্ষমতা আমি দেখিতে পাইতেছি না।

এই সত্য এবং অহিংসাকে পরীক্ষার জন্যই আজ আমি শ্রীরামপুরে যাইতেছি।

যাঁহারা আজ দীর্ঘ দিন ধরিয়া আমার সঙ্গী আছেন, আমার স্বাচ্ছন্দ্যবিধান করিয়া আসিতেছেন, তাঁহাদের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হইয়াই আমি সেখানে যাইতেছি। বাংলাশিক্ষক ও দোভাষী রূপে আমি অধ্যাপক নির্মলকুমার বসুকে সঙ্গে লইতেছি, আমার প্রতি একান্ত অনুরক্ত নীরব আত্মত্যাগী কর্মী, স্টেনোগ্রাফার শ্রীপরশুরামও আমার সঙ্গে যাইবে। অন্যান্য যে সকল কর্মী আমার সঙ্গে আসিয়াছেন, তাঁহারা সম্ভব হইলে নোয়াখালির অন্যান্য গ্রামে বিভিন্নভাবে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে শান্তি-প্রতিষ্ঠার কার্যে আত্মনিয়োগ করিবেন। দুর্ভাগ্যক্রমে একমাত্র বালিকা আভা ভিন্ন ইহারা সকলেই অবাঙালী। সুতরাং শিক্ষক ও দোভাষী রূপে তাঁহারা একজন করিয়া বাঙালী কর্মী সঙ্গে লইবেন।

এই সকল কর্মী নিয়োগ ও প্রতিষ্ঠানের নির্বাচন কার্যাদি শ্রীসতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত করিবেন। স্থানীয় কোন মুসলিম লীগপন্থী পরিবারের মধ্যে বাস করাই আমার অভিপ্রায়; কিন্তু সেই সুদিনের আশায় বসিয়া থাকা আমার উচিত হইবে না। ইতিমধ্যে বিভিন্ন পল্লীতে আমি মুসলমানদের সংস্পর্শে আসিবার চেষ্টা করিব। লীগপন্থীদের নিকট আমার প্রস্তাব এই যে, প্রত্যেক উপদ্রুত গ্রামে তাঁহারা আমার সঙ্গে একজন সৎ সাহসী মুসলমান এবং একজন সৎ ও সাহসী হিন্দু দিন। প্রয়োজন হইলে জীবনের বিনিময়েও তাঁহারা প্রত্যাবর্তনকারী হিন্দু আশ্রয়প্রার্থীদের নিরাপত্তা রক্ষা করিবে। আমি তাহাদের প্রত্যাবর্তনে সম্মত করিতে পারিতেছি না। যে সকল সংবাদ আমি পাইয়াছি তাহা দ্বারা মনে হয়, পল্লীতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জীবন এখনও নিরাপদ নয়। এইজন্যই তাহারা স্বীয় ভবন হইতে দূরে শস্যক্ষেত্র, উদ্যান ও পরিচিত প্রতিবেশী হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যৎসামান্য খাদ্যে জীবিকানির্বাহ করাই ভাল মনে করিতেছে।

বাংলার বাহিরের বহু বন্ধু শান্তিপ্রতিষ্ঠাকার্যে এখানে আসিবার জন্য আমার নিকট লিখিয়াছেন; কিন্তু আমি তাঁহাদিগকে আসিতে বিশেষভাবে নিষেধ করিয়াছি। এই দুর্ভেদ্য অন্ধকারের মধ্য হইতে আলোক-চিহ্ন দেখিতে পাইলেই আমি তাঁহাদিগকে সানন্দে আসিবার জন্য লিখিতাম।

ইতিমধ্যে আমি ও প্যারীলালজী স্থির করিয়াছি যে, চিঠিপত্রাদি লেখা এবং হরিজন ও অন্যান্য সাপ্তাহিকের কাজ স্থগিত রাখা হইবে। শ্রীকিশোরীলালজী, কাকাসাহেব, বিনোবাজী এবং শ্রীনরহরি পারেখকে সম্মিলিতভাবে এবং এককভাবে এই সকল সাপ্তাহিক সম্পাদনা করিতে আমি বলিয়াছি। যদি

কাজের মধ্যে সময় পাই, আমি ও প্যারীলালজী যখন যে গ্রামে থাকিব সেই গ্রাম হইতে সাময়িকভাবে লেখা পাঠাইতে পারি। পত্রাদির উত্তর সেবাগ্রাম হইতে দেওয়া হইবে।

এই কার্য স্থগিত কতকাল চলিবে তাহা এখন আমার পক্ষে বলা দুঃসাধ্য। এই পর্যন্ত আমি বলিতে পারি যে, দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে পরস্পর বিশ্বাস পুনঃপ্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত এবং পল্লীতে পল্লীতে যতক্ষণ না সহজ জীবনযাত্রা পুনরারম্ভ হয়, ততদিন আমি পূর্ববঙ্গ ত্যাগ করিব না। ইহা ভিন্ন পাকিস্তান কিংবা হিন্দুস্থান কিছুই হইতে পারে না। পরস্পর বিরোধের দ্বারা ভারতের দাসত্ব কোন দিনই ঘুচিবে না।

আমার কম খাদ্যের জন্য কেহ যেন এখন উদ্বিগ্ন না হন। ডাঃ রাজেন্দ্র-প্রসাদের নিকট হইতে এক তার পাইয়াছি যে, বিহারের অবস্থা সম্পূর্ণভাবে শান্ত হইয়াছে এবং তিনি দিল্লী প্রত্যাবর্তন করিতেছেন। ইহার পর আমি গতকল্য হইতে আবার ছাগদুগ্ধ পান আরম্ভ করিয়াছি। দেহের অবস্থা অনুকূল হইলেই স্বাভাবিক খাদ্য গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিব। ভবিষ্যৎ ভগবানই বলিতে পারেন।

শ্রীরামপুরে গান্ধীজী 'রাজবাটী' নামে পরিচিত এক বাটীতে অবস্থান করেন।

এখানে পৌছিয়াই গান্ধীজী স্থানীয় লোকজনের (অধিকাংশই মুসলমান) সহিত সংযোগ স্থাপন করিতে আরম্ভ করেন। গান্ধীজী তাঁহার সহিত কাজ করিবার জন্য, শান্তিরক্ষার উদ্দেশ্যে প্রয়োজন হইলে মৃত্যুবরণ করিতে প্রস্তুত এমন একজন স্থানীয় সৎ মুসলমান চাহেন। বাংলার মন্ত্রী মিঃ সামসুদ্দিন আমেদ গান্ধীজীর সহিত দীর্ঘকাল আলোচনা করেন। মন্ত্রীমহাশয় পরে সাংবাদিকদের বলেন যে, প্রথমে রামগঞ্জের বিধ্বস্ত গৃহগুলির পুনর্নির্মাণের কাজ আরম্ভ করা প্রয়োজন। তিনি অন্যান্য লীগ-নেতৃগণসহ বিভিন্ন অঞ্চল পরিভ্রমণ করিবেন এবং সভাসমিতি করিয়া পরিকল্পনা ব্যাখ্যা করিবেন। তাঁহারা উভয় সম্প্রদায়ের সমানসংখ্যক প্রতিনিধি লইয়া শান্তি-কমিটিও গঠন করিবেন।

মিঃ সামসুদ্দীন আমেদ, পার্লামেণ্টারী সেক্রেটারী মিঃ হামিদুদ্দিন আমেদ ও মিঃ আবদুল হাকিম এম. এল. এ. গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং জনসাধারণের মধ্যে আস্থা ফিরাইয়া আনা এবং সাহায্য ও পুনর্বসতির জন্য সরকারী পরিকল্পনা সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

২২শে নভেম্বর—ঘন বনানীবেষ্টিত নির্জন আশ্রমের শান্তিময় পরিবেশের মধ্যে মহাত্মাজী প্রত্যুষে ৪॥ ঘটিকার সময় মাসিক 'কস্তুরবা দিবসের' অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেন। দুই ঘণ্টাব্যাপী এই অনুষ্ঠান চলে। এই উপলক্ষে গীতার আঠারটি অধ্যায় আবৃত্তি করা হয়, তন্মধ্যে দুইটি অধ্যায় আবৃত্তি করেন গান্ধীজী স্বয়ং। একক জীবনযাত্রা আরম্ভ করার পর গান্ধীজী নিজে এই প্রথম 'কস্তুরবা দিবস' উদ্যাপন করিলেন।

মহাত্মা গান্ধী তাঁহার শিবির হইতে আধ মাইল দূরে এক মৌলভীর বাড়ী যান। মৌলভী সাহেব আসিয়া তাঁহাকে লইয়া যান। গ্রামের আঁকাবাঁকা সরু কর্দমাক্ত পথে একখানি বাঁশের সাঁকো অতিক্রম করিয়া গান্ধীজী সেখানে পৌছেন। সেই সময় বৃষ্টি হইতেছিল। সেই বাড়ীতে পৌছিয়া তিনি বাড়ীর লোকজনের সহিত আলাপপরিচয় করেন। তিনি তাঁহাদের কাছে গ্রামের লোকসংখ্যা কত, কতজন লেখাপড়া জানে, কতজন কোরান পড়িতে পারেন এবং যাঁহারা পড়িতে পারেন, তাঁহারা কোরানের মর্ম বুঝিতে পারেন কিনা—এই সকল কথা জিজ্ঞাসা করেন। গান্ধীজীকে তাঁহারা বলেন যে, গ্রামে চৌদ্দশত মুসলমান আছেন, তাঁহাদের একজন ম্যাট্রিকুলেট। দেড়শত ছাত্রকে লইয়া বৎসর দুই পূর্বে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। গ্রামে পাঁচজন মৌলভী আছেন এবং অপর ৪০ জন লোক বাংলা পড়িতে পারেন; ইহাদের মধ্যে এক হাজার লোক কোরান আবৃত্তি করিতে পারেন; কিন্তু কেহই অর্থ বুঝেন না। গান্ধীজীকে ঘিরিয়া যে সকল শিশু বসিয়াছিল, তিনি তাহাদের সহিত কথাবার্তা বলেন।

২৪শে নভেম্বর শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু শ্রীরামপুর রাজবাটীতে আসিয়া গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাৎ করেন। আলোচনা-প্রসঙ্গে গান্ধীজী বলেন যে, যদি প্রয়োজন হয় তাহা হইলে তিনি পূর্ববঙ্গেই দেহ রক্ষা করিবেন। বাংলাদেশের সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে অন্য কেহ তাঁহাকে সাহায্য না করিলেও তিনি একাকী সংগ্রাম চালাইয়া যাইবেন। ব্যক্তিগত জীবন ও সামাজিক দলবিশেষের উপর অহিংসা সমপ্রভাবশীল এবং উহা প্রমাণ করিবার পক্ষে ইহাই প্রকৃষ্ট সময়।

গান্ধীজী শান্তিমিশনের কাজের সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় গ্রামের অধিবাসীদের জীবনযাত্রার উন্নতিসাধনেও ব্রতী হন। তিনি পূর্বে একদিন বলিয়াছিলেন, "আমি গ্রামবাসী, গ্রামে থাকিতেই ভালবাসি। গ্রামগুলি ভারতের আত্মাস্বরূপ। এই দেশের সকল গভর্নমেণ্টের গ্রামগুলির দিকে লক্ষ্য রাখা উচিত। হৃদয়-মন

দিয়া গ্রামোন্নয়নের কাজ করা উচিত। গ্রামের কল্যাণেই হিন্দুস্থানের কল্যাণ।

২৬শে নভেম্বর—রাত্রে রামগঞ্জ ডাকবাংলোতে হিন্দু ও মুসলমান প্রতিনিধিগণের এক সম্মেলনে মহাত্মা গান্ধী বক্তৃতা দেন। শ্রম-সচিব মিঃ সামসুদ্দীন আমেদ এই সম্মেলন আহ্বান করেন। থানা শান্তি-কমিটির সদস্যগণও এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। ২২শে নভেম্বর হইতে শান্তিস্থাপনের যে প্রচেষ্টা চলিতেছিল, তাহা কতদূর সফল হইয়াছে, তদ্বিষয় আলোচনার জন্যই এই সম্মেলন আহূত হইয়াছিল।

রুদ্ধদ্বার কক্ষে এই সম্মেলনের অধিবেশন হয়। স্থির হয়,—যাহারা গ্রেপ্তার হইয়াছে এবং যাহারা হাঙ্গামার সহিত জড়িত, তাহাদের কাহাকেও শান্তি-কমিটির সদস্য করা হইবে না। সম্মেলনে এই অভিমত ব্যক্ত করা হয় যে, পিটুনী-কর ধার্য করা হইলে শান্তি-কমিটির কার্য ব্যর্থ হইবে।

বাংলা সরকারের পার্লামেণ্টারী সেক্রেটারী মিঃ হামিদউদ্দীন আমেদ, নিখিল ভারত হিন্দু-মহাসভার সেক্রেটারী, শ্রীযুক্ত সতীশ দাশগুপ্ত ও নিখিল ভারত তপসিল ফেডারেশনের সেক্রেটারী মিঃ পি. এন. রাজভোজ এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। মধ্যরাত্রের কিছু পরে গান্ধীজী শ্রীরামপুরে প্রত্যাবর্তন করেন।

কয়েক দিনের কার্যকলাপ পর্যালোচনা করিয়া মিঃ সামসুদ্দীন আমেদ বলেন যে, তিনি কতকগুলি উপদ্রুত অঞ্চল পরিদর্শন করিয়াছেন। বিভিন্ন আশ্রয়কেন্দ্রের আশ্রয়প্রার্থীদের সহিতও তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছে। তিনি খিলপাড়ায় গিয়াছিলেন। সেখানে তিনি শুনিতে পান যে, হিন্দু ও মুসলমানদের যুক্ত প্রচেষ্টার ফলে কতকগুলি অঞ্চল রক্ষা পাইয়াছে। আশ্রয়প্রার্থীদের এবং অন্যান্য হিন্দু-পল্লীবাসীদের সহিত কথাবার্তা বলিয়া তিনি বুঝিতে পারিয়াছেন যে, কতকটা বিশ্বাস ইতিমধ্যেই ফিরিয়া আসিয়াছে। এ পর্যন্ত সাতটি শান্তি-কমিটি গঠিত হইয়াছে। শীঘ্রই আরও কতকগুলি শান্তি-কমিটি গঠিত হইবে।

এইদিন প্রাতঃকালে গান্ধীজী আরও একটি মুসলমানবাড়ীতে যান। গান্ধীজীকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া বাড়ীর কর্তা বলেন,—তাঁহাদের মধ্যে তাঁহাকে (গান্ধীজীকে) পাইয়া তাঁহারা নিজেদের সৌভাগ্যবান মনে করিতেছেন।

গান্ধীজী তাঁহাদিগকে কতকগুলি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন। পরিবারের সকলের সঙ্গে তাঁহার আন্তরিক আলাপ-আলোচনা এবং গল্পগুজব হয়। গান্ধীজীর সহিত কথা বলিবার জন্য পরিবারের সকলে তাঁহাকে ঘিরিয়া ধরিয়াছিল।

ঐ পরিবারের একজন বলেন,—তাঁহারা সকলেই দরিদ্র; অতি কষ্টে তাঁহাদের দিনপাত হয়। ঐ ব্যক্তির কথার উত্তরে গান্ধীজী বলেন,—তাঁহাদের জমিতে নানাবিধ ফলের—নারিকেল ও সুপারি গাছ আছে। তবে কেন তাঁহারা নিজেদের দরিদ্র বলে? গান্ধীজী তাঁহাদিগকে বলেন, দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সহস্র সহস্র এমন অনেক লোক আছেন, যাঁহাদের নিজের বলিতে এক ইঞ্চিও জমি নাই।

গান্ধীজীর নিকট দুইটি বালককে আনা হয়। তাহারা কালাজ্বরে ভুগিতেছিল। তাহারা বলে, উপযুক্ত ঔষধের অভাবে তাহারা ভুগিতেছে। গান্ধীজী তাহাদিগকে বলেন,—ডাঃ সুশীলা নায়ারের আজই এখানে আসার কথা আছে। তাহাদিগকে উপযুক্ত চিকিৎসার জন্য তিনি তাঁহাকে পাঠাইয়া দিবেন।

মুসলমানদের গৃহ দেখিবার জন্য এবং তাহাদের অর্থনীতিক ও শিক্ষার ব্যাপারে অনুসন্ধান করিবার জন্য গান্ধীজী প্রায়ই সংকীর্ণ গ্রাম্যপথ বা বনমধ্যস্থ পথে ভ্রমণ করেন। এই অঞ্চলের বহু লোক বিশেষতঃ শ্রমজীবীরা হাঙ্গামার জন্য অসুবিধায় পড়িয়াছিল। হাঙ্গামার সময় ডিসপেন্সারীগুলিও অব্যাহতি পায় নাই। জনৈক মুসলমানের গৃহে একটি পাঁচ বৎসরের বালক কালাজ্বরে ভুগিতেছিল। গান্ধীজী দুইবার তাহাদের গৃহে গমন করেন।

গান্ধীজী স্থানীয় মুসলমানদের বাড়ীতে বাড়ীতে যাইয়া তাহাদের জীবন-যাত্রার সম্বন্ধে খোঁজখবর লন। গ্রামে পীড়িত অসুস্থ ব্যক্তিদের চিকিৎসার কোনো ব্যবস্থা নাই, ডাক্তারও নাই—এই সংবাদে তিনি বেদনাবোধ করেন। তাঁহারা গান্ধীজীকে বলেন,—গ্রামের অধিকাংশ ডাক্তারই হিন্দু; তাঁহারা আতঙ্কে গ্রাম ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। গ্রামবাসীদের ছেলেমেয়েরা অসুস্থ, অনেকে আবার মৃত্যুশয্যায় শায়িত; কোথাও ঔষধও নাই। তাঁহাদের উদ্বেগ ও চিন্তা দূর করিবার জন্য গান্ধীজী ডাঃ সুশীলা নায়ারকে পাঠান। ডাঃ নায়ারের সহিত ভারতীয় জাতীয় এ্যাম্বুলেন্স কোরের দুইজন ডাক্তারও স্বেচ্ছায় রোগীদের সেবা করিতে অগ্রসর হন। ডাঃ সুশীলা নায়ার গান্ধীজীর চিকিৎসার জন্য যে সামান্য ঔষধপত্র লইয়া আসিয়াছিলেন, তাহা দিয়াই রোগীদের চিকিৎসা করিতে আরম্ভ করেন। তিনি প্রত্যহ গড়ে ছয় মাইল হাঁটিয়া রোগীদের সেবা করিতেন।

মুসলমানগৃহে গমন ও তাহাদের সহিত আন্তরিকভাবে মেলামেশার ফলে

মুসলমান নরনারী ও বালকবালিকারা ক্রমশঃ গান্ধীজীর প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িতেছিল।

প্রত্যহ বহু মুসলমান নরনারী ও বালকবালিকা গান্ধীজীর কুটিরে আসিবার ফলে তাঁহার কর্মব্যস্ত জীবন অধিকতর কর্মমুখর হইয়া উঠিতেছিল।

গান্ধীজী প্রায় একজন ডাক্তার হইয়া পড়েন। মুসলমান রোগীরা তাঁহার নিকট ঔষধপত্র চায় এবং অনেক রোগীকেও তিনি স্বয়ং দেখিতে যান।

ডাক্তারের প্রয়োজন হইলে গান্ধীজী ডাক্তার সুশীলা নায়ারকেই প্রেরণ করেন। একদিন একজন মুসলমান বালককে কালাজ্বরের ইন্‌জেকশন দেওয়ার জন্য গান্ধীজী ডাঃ সুশীলা নায়ারকে প্রেরণ করেন।

২রা ডিসেম্বর, সাংবাদিকগণ গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া মিঃ জিন্নার প্রস্তাবিত অধিবাসী-বিনিময় সম্পর্কে তাঁহার মতামত জানিতে চাহেন। সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে গান্ধীজী বলেন, "অধিবাসী-বিনিময়ের প্রশ্ন চিন্তারও অযোগ্য এবং কার্যতঃ অসম্ভব। এই প্রশ্ন এখনও আমার মন হইতে অপসৃত হয় নাই। প্রত্যেক প্রদেশে প্রত্যেক ব্যক্তি, হিন্দু, মুসলমান কিংবা অপর যে কোন ধর্মাবলম্বীই হউক না কেন, সে ভারতীয়; পাকিস্থান পুরাপুরি প্রতিষ্ঠিত হইলেও ইহার অন্যথা হইবে না।"

মহাত্মা গান্ধী আরও বলেন, আমি এইরূপ কোন বিষয় ভারতীয়দের দূরদর্শিতার কিংবা রাজনীতিজ্ঞানের অথবা উভয়েরই দৈন্যের পরিচায়ক বলিয়া বিবেচনা করি। এইরূপ কোন ব্যবস্থার ফল এরূপ ভয়াবহ যে উহা ধারণা করা যায় না। উহা কি এই নহে যে, ভারতবর্ষ ধর্মের ভিত্তিতে অনৈসর্গিকভাবে বহু অঞ্চলে বিভক্ত হইয়া পড়িবে?

বর্তমান অনিশ্চিত অবস্থায় লোক-অপসারণের নীতি অবলম্বন কি প্রকৃষ্টতর নহে? এই প্রশ্নের উত্তরে গান্ধীজী বলেন: "আমি এরূপ কোন নীতি অবলম্বনের কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ দেখি না। ইহা নৈরাশ্যের নীতি; সুতরাং শেষ উপায়-স্বরূপ কদাচিৎ অবলম্বনীয়।"

পরবর্তী প্রশ্ন ছিল—"আপনি সেদিন বলিয়াছেন যে, আপনি অনির্দিষ্ট কাল পূর্ববঙ্গে অবস্থান করিবেন। আপনি কি মনে করেন যে আপনি আপনাকে শ্রীরামপুরে আবদ্ধ রাখিয়া আপনার শান্তির বাণী নোয়াখালির অন্যান্য গ্রামে প্রেরণ করিতে পারিবেন?"

গান্ধীজী উত্তরে বলেন—"অবশ্য আমি দীর্ঘকাল শ্রীরামপুরে থাকিব না।

আমি এখানে নিষ্কর্মা নহি। আমি চারিদিকের গ্রামসমূহের লোকদের সহিত দেখা করিতেছি।"

গান্ধীজী তাঁহাদের বলেন—"উল্লসিত হইবার পক্ষে তাহাদের নিজস্ব কারণ আছে, তাহাদের বিরুদ্ধ মনোভাবের সম্মুখীন হইবার একটি মাত্র উপায় আছে, তাহা হইল এই যে, তাহাদের বিরূপ মনোভাবের নিকট নতি স্বীকার না করিয়া তাহাদের মধ্যেই বসবাস করা এবং সত্য হইতে বিচ্যুত না হওয়া। শুধু সৎস্বভাববিশিষ্ট হইলেই চলিবে না ; সৎস্বভাবের সহিত জ্ঞানের সংযোগও ঘটাইতে হইবে। মানসিক সাহস ও চরিত্রবত্তার মধ্যে যে সুষ্ঠু বিবেচনা-শক্তি নিহিত থাকে, তাহা অক্ষুণ্ন রাখিতে হইবে। সঙ্কটকালে কখন মনোভাব ব্যক্ত করিতে হইবে এবং কখন নীরব থাকিতে হইবে, কখন কাজ করিতে হইবে এবং কখন কর্ম হইতে বিরত হইতে হইবে, তাহা জানিতে হইবে।"

গান্ধীজী আরও বলেন,—"আমি আলোকের সন্ধানে আছি ; আমার চতুর্দিকে অন্ধকার। আমাকে কাজ করিতে হইবে, নয় কর্ম হইতে বিরত হইতে হইবে। আমি দেখিতেছি যে, এ জাতীয় মর্মান্তিক অবস্থায় আমার উপযুক্ত ধৈর্য ও কর্মকৌশল আছে বলিয়া মনে হয় না। মানুষের দুর্গতি ও অধোগতি আমাকে প্রায়শঃ অভিভূত করিয়া ফেলে এবং আমি আমার নিজের অসহায়তায় মর্মপীড়া অনুভব করি। এই হেতু আমার বন্ধুদের প্রতি আমার আবেদন এই যে, তাঁহারা যেন আমাকে বরদাস্ত করেন এবং স্ব স্ব জ্ঞানবুদ্ধি অনুযায়ী কাজ করিয়া যান অথবা নিষ্ক্রিয় থাকেন। এই অন্ধকারও বিদূরিত হইবে ; আমি যদি আলোকের সন্ধান লাভ করি, তাহা হইলে বাংলায় যাহারা বর্তমান শোচনীয় দুর্দৈবের সৃষ্টি করিয়াছে, তাহারাও আলোকের সন্ধান পাইবে।"

গান্ধীজী অতঃপর বলেন,—"গ্রামে গ্রামে নূতন ভিত্তি রচনা করিতে হইবে ; উভয় সম্প্রদায়ের পূর্বপুরুষদের এই বাসভূমিতে হিন্দু ও মুসলমানগণ একত্রে বসবাস ও দুঃখভোগ করিয়াছে। ভবিষ্যতেও তাহাদিগকে একত্রে বাস করিতে হইবে। সাময়িকভাবে আমি বাঙালী বনিয়া গিয়াছি, আমি নিজেকে নোয়াখালিবাসী বলিয়া মনে করি। আমি তাহাদের সহিত বাস করিতে, তাহাদের কাজের অংশীদার হইতে এবং উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে মৈত্রী স্থাপন করিতে অথবা এই প্রচেষ্টায় আত্মবিলোপের জন্যই এখানে আসিয়াছি।"

পূর্বরাত্রে ডাঃ অমিয় চক্রবর্তী গান্ধীজীর সহিত অতিবাহিত করেন। গান্ধীজী সেদিন সকাল কিরূপে অতিবাহিত করিয়াছেন, সে বিষয় বর্ণনা করিয়া

তিনি বলেন যে, গান্ধীজীর প্রাতঃকালীন প্রার্থনার পরও আকাশ তারকাখচিত, শ্রীরামপুর গ্রাম নিঝুম ছিল ; তিনি শুভ্রবসনে আবৃত হইয়া কাজে মনোনিবেশ করেন ; একটি হারিকেনের আলোকে তিনি লিখিতে আরম্ভ করেন ; তাঁহার ললাট জ্যোতিবিভাসিত দেখা যাইতেছিল। সকাল সাতটার পর তিনি প্রাতর্ভ্রমণের জন্য বাহির হন এবং সঙ্কীর্ণ সেতু ও শিশিরসিক্ত দুর্বাদলের উপর দিয়া কিছুদূর বেড়াইয়া আসেন।

৫ই ডিসেম্বর—বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু-মহাসভার ওয়ার্কিং প্রেসিডেণ্ট শ্রীযুক্ত নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও কলিকাতার ভূতপূর্ব মেয়র শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখার্জি গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া শরণাগতদের পুনর্বসতি সম্বন্ধে আলোচনা করেন। শ্রীযুক্ত চট্টোপাধ্যায় গান্ধীজীর নিকট দুর্গত এলাকায় আঞ্চলিক ভিত্তিতে সংখ্যালঘিষ্ঠদের বসবাসসংক্রান্ত একটি পরিকল্পনা পেশ করেন। গান্ধীজী বলেন যে, তিনি উক্ত পরিকল্পনা অনুমোদন করেন না এবং আশ্রয়প্রার্থীরা তাঁহাদের স্বগ্রামে প্রত্যাবর্তন করেন ইহাই তাঁহার অভিপ্রেত।

৬ই ডিসেম্বর—একটি শান্তিপূর্ণ শোভাযাত্রা রামনাম করিতে করিতে চণ্ডীপুর হইতে শ্রীরামপুর পর্যন্ত ৬ মাইল পথ অতিক্রম করে। শত শত বৃদ্ধ, যুবক ও বালক এই শোভাযাত্রায় যোগদান করে। সেবারত কর্মী শ্রীযুক্ত সৌরীন বসু শোভাযাত্রার পুরোভাগে ছিলেন। প্রার্থনার কিছু পূর্বে শোভাযাত্রী দল গান্ধীজীর শিবিরে উপনীত হয়। ১০ই অক্টোবর হাঙ্গামা আরম্ভ হইবার পর এই প্রথম ঢোলক প্রভৃতি সহ প্রকাশ্যে গীতবাদ্য হয়। স্বাভাবিক অবস্থায় এই পল্লীগুলি কর্মমুখর থাকিত। ইহাদের সম্মিলিত সঙ্গীতে পল্লীর অস্বাভাবিক নীরবতা ভঙ্গ হয়। প্রার্থনার পর গান্ধীজী তাঁহাদের নিকট বক্তৃতা করেন।

শোভাযাত্রা ঢাক-ঢোলসহ উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম সংকীর্তন করিতে করিতে অকস্মাৎ গান্ধীজীর নিকট উপস্থিত হয়। বহুদিন পর এইভাবে কীর্তন হয়। কীর্তনীয়াগণ নৃত্য করিতে করিতে গান্ধীজীর কুটীর-প্রাঙ্গণে পৌছিলে সকলকেই আনন্দোদ্দীপ্ত দেখায়। গান্ধীজীর নির্জন কুটীর-প্রাঙ্গণে তাঁহারা প্রায় কুড়ি মিনিট কাল কীর্তন করেন। প্রার্থনার পর গান্ধীজী সান্ধ্যভ্রমণে বহির্গত হন।

ডাঃ শ্রীঅমিয় চক্রবর্তী গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সেবারত কর্মীদের কর্মপদ্ধতি-সংক্রান্ত কয়েকটি দরকারী প্রশ্ন লইয়া তাঁহার সহিত আলোচনা করেন। ডাঃ চক্রবর্তীর একটি প্রশ্নের উত্তরে গান্ধীজী বলেন, "আমি জলন্ত অগ্নি-পরিবৃত অবস্থায় বাস করিতেছি। যে পর্যন্ত না এই অগ্নি নির্বাপিত হইবে, সে পর্যন্ত

আমি স্থানত্যাগ করিব না। এইসব কারণে আমি এতদঞ্চল ত্যাগ করিতে চাহি না। শুধু দুর্গত নরনারীর হিতসাধনের মধ্যেই জীবনধারণের সার্থকতা নিহিত থাকা উচিত। গঠনমূলক কাজ চালাইয়া যাইতে হইবে এবং অপহৃতাদের উদ্ধার করিতে ও তাহাদের নৈতিক সাহস ফিরাইয়া আনিতে হইবে। আমি সাময়িকভাবে বাঙালী বনিয়া গিয়াছি ; আমি নিজেকে নোয়াখালিবাসী বলিয়া মনে করি।"

ডাঃ চক্রবর্তী ও অপরাপর যাঁহারা বিভিন্ন গ্রামে সেবা ও পুনর্বসতির কাজে নিযুক্ত ছিলেন, সোমবার তাঁহারা তাঁহাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কাহিনী গান্ধীজীর গোচর করেন এবং দুর্বৃত্তদের নিকট বক্তব্য উপস্থাপিত করিবার কৌশল সম্পর্কে তাঁহার উপদেশ প্রার্থনা করেন। তাঁহাদের অভিমত এই যে, দুর্বৃত্তগণ শুধু যে অননুতপ্ত তাহাই নহে, তাহারা বিরুদ্ধমনোভাবাপন্ন এবং এমনকি কুকার্যের জন্য উল্লসিতও বটে।

৭ই ডিসেম্বর—মহাত্মা গান্ধী যথারীতি তাঁহার কুটীরের সম্মুখে প্রার্থনা-সভার অনুষ্ঠান করেন। সভায় খুব অল্পসংখ্যক লোক যোগদান করিয়াছিলেন।

প্রার্থনার পর গান্ধীজী জনৈক মুসলমান লেখকের একখানি পুস্তকের উল্লেখ করেন। গান্ধীজী বলেন যে, এই পুস্তকের লেখক যথার্থই লিখিয়াছেন যে, কোন সৎ লোক কখনও মৃত্যুভয়ে ভীত নহেন, অথবা আত্মসম্মান কিংবা ধর্মের জন্য যথাসর্বস্ব হারাইতেও তিনি কখনও কুণ্ঠিত হন না। আমাদের এই জীবন ভগবানের দান ; আবার তিনিই উহা লইয়া যাইবেন। মহাত্মাজী বলেন যে, এই নীতিবাক্য সর্বজনীন এবং হিন্দু ও মুসলমান সকলের উপরই ইহা সমভাবে প্রযোজ্য। ভগবানের উপর যাহার সামান্যমাত্র বিশ্বাস আছে, তিনিই সর্বভয়মুক্ত। নির্ভয় হইতে পারিলেই উভয়ের মধ্যে স্থায়ী বন্ধুত্ব হইতে পারে।

গান্ধীজী বলেন যে, এমন দিন ছিল—যখন মুসলমানেরাও তাঁহার উপদেশ মানিয়া চলিতেন। কিন্তু এখন যেন আর সেই দিন নাই। এমন কি হিন্দুদের মধ্যেও খুব বেশী লোক তাঁহার উপদেশ মানিয়া চলিবেন বলিয়া তিনি মনে করেন না। কিন্তু ইহা নিশ্চিত যে, যতদিন পর্যন্ত সম্প্রদায়নির্বিশেষে প্রত্যেক ব্যক্তি ভগবান ভিন্ন অন্য কাহারো ভয়ে ভীত হইবেন, ততদিন পর্যন্ত স্থায়ী শান্তি আসিতে পারে না।

৯ই ডিসেম্বর—গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টিপাতের মধ্যে মহাত্মা গান্ধী তাঁহার নির্জন কুটীর হইতে প্রার্থনা-সভায় যান।

প্রার্থনাশেষে গান্ধীজী সমবেত জনতাকে সম্বোধন করিয়া বক্তৃতা করেন। তাঁহার বক্তৃতাকালে দূরে সমবেতকণ্ঠে 'রামনাম' কীর্তন শুনা যায়। বালক-বালিকাসমেত বহুলোক ঢোলক ও অন্যান্য বাদ্যযন্ত্র সহযোগে 'রামনাম' কীর্তন করিতে করিতে গান্ধীজীর প্রার্থনা-সভায় উপস্থিত হয়। তাহারা বৃষ্টিতে ভিজিতে ভিজিতে সেখানে আসিয়াছিল। এই সময় গান্ধীজী বক্তৃতা বন্ধ করেন। তাঁহাকে বিশেষ উৎফুল্ল দেখা যাইতেছিল এবং তাঁহার মুখমণ্ডলে আনন্দের জ্যোতিঃ ফুটিয়া উঠিয়াছিল। সমবেত কণ্ঠে রামনাম গাহিতে গাহিতে কীর্তনীয়াদল গান্ধীজীর প্রার্থনা-প্রাঙ্গণটি তিনবার প্রদক্ষিণ করে। গান্ধীজী সর্বক্ষণ উপবিষ্ট ছিলেন এবং সমবেত কণ্ঠের সঙ্গীতে বিশেষ আনন্দিত হন।

১২ই ডিসেম্বর—বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় প্রার্থনা-সভায় দুইজন বন্ধু গান্ধীজীর নির্বাচিত একটি সঙ্গীত গাহিয়াছিলেন। সঙ্গীতটির মর্মার্থ এইরূপ ঃ ভগবানের প্রেমের প্রাচুর্যে হৃদয়ের কলুষকালিমা বিধৌত হইয়া সত্য উদ্ভাসিত হইয়া উঠুক—ইহাই অন্তরের প্রার্থনা। গান্ধীজী বলেন, সাধু ও ভক্তদের সঙ্গীতে এই মর্মার্থই প্রকাশ পায়। তাঁহারা সব সময় বলেন, 'তমসো মা জ্যোতির্গময় অসত্যো মা সদ্‌গময়।'

গান্ধীজী বলেন, রামধুনেরও একটা অন্তর্নিহিত অর্থ আছে। চৈতন্য মহাপ্রভু পদব্রজে যেমন বৃন্দাবন ও পুরীতে গিয়াছিলেন, তেমনি মহাকবি পরমভক্ত তুলসীদাস পদব্রজে নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া দ্বারকার মন্দিরে আসিয়া উপস্থিত হন। এই মন্দিরটি বিষ্ণুর নামে উৎসর্গীকৃত, কিন্তু তুলসীদাস মনে মনে বলিলেন, তাঁহার অন্তরের প্রিয় রামমূর্তিতে ভগবান স্বপ্রকাশ না হইলে তাঁহার মস্তক ভক্তিতে অবনত হইবে না। কাহিনীতে শোনা যায়, এইরূপ ঘটনা ঘটিয়াছিল এবং ভক্ত তুলসীদাস দেখিলেন, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন ও হনুমান দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া রামসীতা বসিয়া আছেন। তাই রামধুনের অর্থ ভগবন্মোত্ততা।

গান্ধীজী বলেন, হৃদয় হইতে স্বতঃ-উৎসারিত হইয়া যে প্রার্থনা প্রকাশ পায়, তাহাই যথার্থ প্রার্থনা, তাহা মানুষকে "অন্ধকার হইতে আলোকে, ভয় হইতে অভয়ে" লইয়া যায়।

১৫ই ডিসেম্বর—প্রার্থনা অনুষ্ঠিত হইবার দুই ঘণ্টা পূর্বে মহাত্মা গান্ধী এক কর্মীবৈঠকে নিঃস্বার্থ সেবাব্রত আয়ত্তের কৌশল সম্পর্কে উপদেশ দেন। প্রার্থনার পর তিনি পুনরায় পূর্বপ্রসঙ্গের অবতারণা করিয়া বলেন যে, গ্রাম-সেবকের প্রধান কর্তব্য দেহ ও মনের সংস্কারসাধন। অধুনা গ্রামসমূহ দেশে

গলিত ক্ষতের মত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমাদের সবকিছু দুর্গতির জন্য বৃটিশ গভর্নমেণ্টই দায়ী নহে ; তাহাদের ভারত ত্যাগ আসন্ন। ইতিমধ্যে জাতির প্রতিনিধিগণ দ্বারা আমাদের গভর্নমেণ্ট গঠিত হইয়াছে। অতঃপর তিনি বলেন যে, গ্রামবাসীরা কীটপতঙ্গের মত বসবাস করিতেছে। অসীম ধৈর্য ও একনিষ্ঠ উদ্যমের ফলে অন্ধকার বিদূরিত হইতে পারে ; ঐরূপ পরিবেশের মধ্যে অসৎ লোকদের কোন স্থান হইবে না। দারিদ্র্য ও অজ্ঞতা দূর হইলে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইবে। ঐ উদ্দেশ্যসিদ্ধিকল্পে তিনি নোয়াখালি আসিয়াছেন এবং ঐ প্রচেষ্টায় তিনি জীবনপাত করিতেও কুণ্ঠিত নহেন।

তিনি আরও বলেন যে, প্রথম দিকে ইংরাজরা ভারতে সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার পর শহর নির্মাণের পরিকল্পনা করে। তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল দেশের বিত্তশালী সম্প্রদায়কে শহরে কেন্দ্রীভূত করিয়া গ্রামাঞ্চল-শোষণে তাহাদের সহায়তা করা। তবে শহরসমূহ আংশিকভাবে সুন্দর করিয়া তৈয়ারী হয় এবং শহরবাসীদের জন্য সমুদয় সুযোগসুবিধাও দেওয়া হয়। পক্ষান্তরে লক্ষ লক্ষ গ্রামবাসী চরম অজ্ঞতা ও দুর্গতির মধ্যে নিপতিত হয়। অধুনা ভারতীয় প্রতিনিধিগণ দ্বারা গভর্নমেণ্ট গঠিত হইয়াছে। এই হেতু তাঁহাদের সম্পর্কে একথা যেন বলা না হয় যে, গ্রামবাসীদের শোষণ করিয়া শহরবাসীদের প্রতি অতিরিক্ত নজর দেওয়া হইয়াছে। প্রাদেশিক গভর্নমেণ্টসমূহ কংগ্রেস বা লীগ যাহাদেরই নেতৃত্বে গঠিত হইয়া থাকুক না কেন, ভারতের গ্রামসমূহ পুনরুজ্জীবনের কাজে অবহিত হইবে। কিন্তু একাজ শুধু সরকারী প্রচেষ্টায় হইবার নহে ; প্রত্যেক নাগরিককে ইহাতে যথাসাধ্য অংশগ্রহণ করিতে হইবে।

বলপূর্বক ধর্মান্তরিত করার সংবাদ এবং বাংলার ভগিনীদের দুর্দশা আমার অন্তর গভীরভাবে স্পর্শ করে। লেখা কিংবা বক্তৃতার দ্বারা আমি কিছুই করিতে পারি নাই। আমি মনে এই যুক্তি উপস্থিত করিতাম যে, আমি নিশ্চয়ই ঘটনাস্থলে যাইব এবং যে নীতি আমাকে পোষণ করিয়াছে এবং জীবনধারণ সার্থক করিয়াছে উহার অভ্রান্ততা পরীক্ষা করিব। আমার সমালোচকগণ অনেক সময়ে ইহাকে দুর্বলের অস্ত্র বলিয়া যে আখ্যা দেন, ইহা কি তাহাই, না ইহা যথার্থই বলবানের অস্ত্র ?

সেইজন্য আমি আমার সমস্ত কার্যকলাপ রাখিয়া দিয়া আমি কোথায় দাঁড়াইয়া রহিয়াছি তাহা নির্ধারণের জন্য তাড়াতাড়ি নোয়াখালি আসিয়াছি।

আমি দৃঢ়ভাবে জানি, অহিংসা একটি ত্রুটিশূন্য যন্ত্র। যদি আমার হাতে ইহা কাজ না করে, তাহা হইলে ত্রুটি আমার। আমার যন্ত্র-ব্যবহার-পদ্ধতিতে ত্রুটি আছে। দূর হইতে আমি ভুল খুঁজিয়া পাই নাই। সেইজন্য উহা খুঁজিয়া বাহির করিবার চেষ্টায় আমি এখানে আসিয়াছি। সুতরাং আলোক দেখিতে না পাওয়া পর্যন্ত আমাকে অন্ধকারের মধ্যে বাস করিতে হইবে। কখন আলোক আসিবে তাহা একমাত্র ভগবান জানেন। ইহার অধিক আমি কিছু বলিতে পারি না।

১৭ই ডিসেম্বর—অন্তর্বর্তী সরকারের সদস্য ও যুক্তরাষ্ট্রের ভাবী ভারতীয় রাষ্ট্রদূত মিঃ আসফ আলি সন্ধ্যায় শ্রীরামপুরে পৌছেন। তাঁহাকে প্রায় তিন মাইল পথ পদব্রজে গমন করিতে হয়। একজন পুলিস ইন্সপেক্টর, দুইজন কনস্টেবল এবং বহুসংখ্যক হিন্দু ও মুসলমান তাঁহার সঙ্গে গমন করেন।

গান্ধীজীর সহিত তাঁহার দীর্ঘ তিনঘণ্টাকাল আলাপ-আলোচনা চলে।

১৮ই ডিসেম্বর—গান্ধীজী পুনরায় শ্রীরামপুরের গুহবাড়ীর ধ্বংসস্তূপ পরিদর্শন করেন। সেই ধ্বংসস্তূপের মধ্যেই গান্ধীজী সেই দিবসের সান্ধ্য-প্রার্থনা অনুষ্ঠান করেন। মিঃ আসফ আলিও প্রার্থনা-সভায় যোগদান করেন এবং বিধ্বস্ত ও ভস্মীভূত গৃহাদি পরিদর্শন করেন।

প্রার্থনা-সভায় মহাত্মা গান্ধী বলেন, "আজ আমার অহিংসার সর্বাপেক্ষা কঠিন পরীক্ষা চলিতেছে। আমি আমার অহিংসা কার্যে প্রয়োগ করিতে অন্যথায় শান্তিস্থাপন চেষ্টায় মৃত্যুবরণ করিতে নোয়াখালিতে আসিয়াছি।"

গান্ধীজী বলেন, "আমি প্রার্থনা অনুষ্ঠানের জন্য আজ এই প্রথম এইস্থানে আসিলাম। ভগবানের ইচ্ছা থাকিলে আমি একটি একটি করিয়া উপদ্রুত গ্রাম পরিদর্শন করিব। আমার এখন এই বৃহৎ কাজ আরম্ভ করিবার শক্তি নাই; এই শক্তির জন্য আমি ভগবানের উপর নির্ভর করি। আমি গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে ভ্রমণের সময়ে যেখানে প্রার্থনার সময় হইবে সেইখানেই প্রার্থনা করিব।"

অতঃপর গান্ধীজী তাঁহার অন্তরের ভাব খোলাখুলিভাবে ব্যক্ত করেন। তিনি সোমবার রাত্রিতে ক্রোধে অভিভূত হওয়ার কথা উল্লেখ করিয়া বলেন যে ঐ রাত্রিতে তাঁহার যথোপযুক্ত বিশ্রাম হয় নাই; রাত্রি ২॥টা হইতে তিনি কাজ আরম্ভ করেন। এই প্রসঙ্গে গান্ধীজী একবার থিয়েটার দেখিতে গেলে তাঁহার পিতা কিরূপ ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন, তাহার উল্লেখ করিয়া বলেন যে, তাঁহার ক্রুদ্ধ পিতা তাঁহাকে কিছু না বলিয়া কাঁদিতে এবং কপালে করাঘাত করিতে

থাকেন। তিনি (গান্ধীজী) অপরাপরের ন্যায় কাঁদা পছন্দ করেন না। তিনি রাগিয়া গিয়া যে ভুল করিয়াছেন, তাহা সমগ্র জগতের নিকট প্রকাশ করিয়া তাঁহার অন্তরের ভার মুক্ত করিতে চাহেন ; কারণ তিনি জানেন যে, তাঁহার ন্যায় একজন অহিংসবাদীর ক্রুদ্ধ হওয়া উচিত নহে। তিনি তাঁহার ক্রোধ দমন করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেন ; কিন্তু এখন পর্যন্ত সম্পূর্ণ সাফল্যলাভ করিতে পারেন নাই।

গান্ধীজী ও মিঃ আসফ আলি একত্রে সরু গ্রাম্য পথ ধরিয়া অগ্রসর হন এবং অতি কষ্টে কয়েকটি বিপদসঙ্কুল সাঁকো পার হন। হাঁটিতে হাঁটিতে তাঁহাদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা চলে। সান্ধ্য-প্রার্থনার পর গান্ধীজী আর ভ্রমণে বহির্গত হন নাই। প্রার্থনাশেষেই মিঃ আসফ আলির সহিত আলোচনার জন্য তিনি কুটিরে প্রবেশ করেন।

২০শে ডিসেম্বর—"সাতাঁ, সামাদিসয়ের ও এক্সেলসিয়র" নামক তিনখানি ফরাসী সংবাদপত্রের সম্পাদক মঃ রেমণ্ড কার্টিয়ার সাইগন যাওয়ার পথে বিমান হইতে অবতরণ করিয়া শ্রীরামপুরে গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাৎ করেন। তিনি পৃথিবীভ্রমণে বাহির হইয়াছিলেন।

যে সময়ে মঃ কার্টিয়ার আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন গান্ধীজী স্বভাব-চিকিৎসা-প্রণালীতে চিকিৎসিত হইতেছিলেন। তাঁহার কপালে মৃত্তিকার প্রলেপ ছিল এবং চক্ষু মুদ্রিত ছিল।

ফরাসী ভদ্রলোকটি গান্ধীজীর ঘরে প্রবেশ করিবামাত্র মহাত্মাজী তাঁহাকে ফরাসী ভাষায় সম্বর্ধনা করেন। অপ্রত্যাশিতভাবে ফরাসী ভাষা শুনিয়া ভদ্রলোকটি সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন।

গান্ধীজী তখন মঃ কার্টিয়ারকে বলেন যে, স্কুলে পড়িবার সময় তিনি সামান্য ফরাসী ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন। অতঃপর গান্ধীজী ভিকটার হুগোর নাম উল্লেখ করিয়া বলেন যে, প্যারিসের গলিপথে 'জিন ভাল্‌জিন' হামাগুড়ি দিয়া চলিতেছে—এই চিত্র এখনও তাঁহার (মহাত্মাজীর) মনে অঙ্কিত আছে।

গান্ধীজী মঃ কার্টিয়ারকে বলেন যে, তিনবার তিনি প্যারিসে গিয়াছেন এবং প্রতিবারই যে সকল পল্লীতে দরিদ্রেরা বাস করে সেই সমস্ত স্থানে থাকিতে চাহিয়াছেন। তিনি বলেন যে, ইহা বড়ই আশ্চর্য যে, ফ্যাসান, বিলাস ও অন্যান্য অনেক বিষয়ে পৃথিবীর মধ্যে যে নগরী শ্রেষ্ঠ, তাহারই বুকের উপর আবার শোচনীয় বস্তুও বিরাজ করিতেছে।

ইউরোপের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে গান্ধীজী কি মনে করেন—মঃ কার্টিয়ারের এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন যে, গত যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর তিনি অনুভব করেন যে, ইউরোপ অহিংসার পথ গ্রহণ না করিলে এই যুদ্ধ ইহা অপেক্ষা আরও মারাত্মক তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভূমিকাস্বরূপ হইবে।

ফরাসী ভদ্রলোকটি তখন গান্ধীজীকে এই প্রশ্ন করেন যে, ইউরোপে সকলেই হিংসাপন্থী ; এমতাবস্থায় কিভাবে তাহারা অহিংস হইবে বলিয়া তিনি (গান্ধীজী) আশা করেন।

গান্ধীজী ইহার উত্তরে বলেন যে, হইতে পারে তাহারা সবাই হিংসাপন্থী ; কিন্তু এইভাবে হিংসাপন্থা অনুসরণ করিতে থাকিলে তাহাদের ধ্বংস অনিবার্য। গান্ধীজী বলেন যে, হিটলার অপেক্ষা আরও জবরদস্ত হিটলার তাঁহাকে ধ্বংস করিয়াছেন এবং অনন্তকাল ধরিয়া এইরূপ চলিতে থাকিবে।

২২শে ডিসেম্বর —সাহায্য ও পুনর্বসতি সম্পর্কিত কয়েকটি বিষয়ের আলোচনার উদ্দেশ্যে গান্ধীজীর কয়েকজন বন্ধু তাঁহার নিকট গমন করেন। সান্ধ্য-প্রার্থনাকালে গান্ধীজী এই বিষয়ের উল্লেখ করিয়া বলেন, এই ক্ষেত্রে দাতব্য ব্যবস্থার উপর নির্ভর করার আমি ঘোর বিরোধী।

গান্ধীজী বলেন, সাহায্য ও পুনর্বসতি-সংক্রান্ত বিষয়গুলি অত্যন্ত জটিল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বিভিন্ন দাতব্য প্রতিষ্ঠানের তরফ হইতে নোয়াখালির বিভিন্ন অঞ্চলে যেভাবে সাহায্যকেন্দ্র স্থাপন করা হইতেছে তাহার ফলে জনসাধারণ দানের উপর নির্ভরশীল হইয়া পড়িবে।

আশ্রয়প্রার্থী নরনারীদের সম্পর্কে বিভিন্ন সেবা-প্রতিষ্ঠান যে নীতি অনুসরণ করিতেছেন, সেই অনুপাতে গভর্নমেণ্টের নীতি কিরূপ হওয়া বাঞ্ছনীয় উহার সমালোচনা প্রসঙ্গে গান্ধীজী বলেন, ইহা অতীব সত্য যে, নরনারী আত্মকৃত দোষের ফলে আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হয় নাই। কাজেই প্রত্যেকটি নরনারীর বিষয় স্বতন্ত্রভাবে বিচার করিয়া তাহারা যাহাতে নিরাপত্তার ভাব লইয়া স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাবর্তন করিতে সমর্থ হয়, গভর্নমেণ্টের তরফ হইতে সেইরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করা বিধেয়। অবস্থানুপাতে পারিপার্শ্বিক অবস্থার উন্নতি না ঘটিলে এবং আশ্রয়প্রার্থী পরিবারগুলির পরিবারের সমস্ত লোকজন স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করিতে অনিচ্ছুক থাকিলে, পরিস্থিতিটি গভর্নমেণ্টের পক্ষে মোটেই গৌরবজনক হইবে না।

অহিংসা দ্বারা কিভাবে হিটলারবাদ ধ্বংস করা সম্ভব মঃ কার্টিয়ারের এই

প্রশ্নের উত্তরে গান্ধীজী বলেন যে, ইউরোপের জনগণকেই তাহার উপায় খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। অন্যথায় তাহারা হিটলার-অনুসৃত হিংসামূলক প্রচেষ্টাকে ধ্বংস করার নিমিত্ত যদি আরও বৃহত্তর হিংসাত্মক কার্যের উপরই নির্ভর করে, তবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিসমূহের বাঁচিবার কেন আশাই থাকিবে না। কোন জাতি কিংবা কোন ব্যক্তি যদি হিটলারবাদ কিংবা সঙ্ঘবদ্ধ হিংসাবাদের নিকট পরাজয় স্বীকার না করেন এবং জীবন গেলেও আত্মসম্মান বিসর্জন না দিয়া স্বীয় মতে অটল থাকেন, তবে সেই ব্যক্তি কিংবা জাতির বাঁচিবার সম্ভাবনা আছে। একমাত্র অহিংসাই বৃহত্তম বিপদের মধ্যেও রক্ষাকবচ। ইউরোপের জনগণের মধ্যে এইপ্রকার সাহসের ভাব জাগরিত না হইলে কিংবা তাহারা এইরূপ অহিংস প্রতিরোধ-ব্যবস্থা অবলম্বন না করিলে গণতন্ত্র কখনও টিকিতে পারে না।

২৬শে ডিসেম্বর—মহাত্মা গান্ধী প্রার্থনা-সভায় নোয়াখালিতে তাঁহার আরব্ধ ব্রতের উল্লেখ করিয়া বলেন যে, এত বড় গুরুদায়িত্ব তিনি তাঁহার জীবনে কখনও গ্রহণ করেন নাই। এখানে এমন একটি সম্প্রদায় ছিল, যাহারা একদিন তাঁহাকে বন্ধুত্বের চক্ষেই দেখিয়াছে। কিন্তু আজ সেই সম্প্রদায়ই তাঁহাকে শত্রু বলিয়া মনে করে। তাই স্বীয় জীবন ও কর্মসাধনা দ্বারা তাঁহাকে আজ প্রমাণ করিতে হইবে যে, তিনি তো শত্রু নহেনই, পরন্তু মুসলমানদের একজন প্রকৃত সুহৃদ। এই কারণেই তিনি মুসলমান সংখ্যাধিক্য, নোয়াখালিকে জীবনের বৃহত্তম পরীক্ষার স্থান হিসাবে নির্বাচন করিয়াছেন।

গান্ধীজী অতঃপর বলেন যে, কিভাবে তাঁহার উদ্দেশ্য ও সঙ্কল্পের অকপটতা প্রমাণ করা সম্ভব হইবে, তাহা অদ্যাপি তিনি উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। এরূপ অবস্থায় কাহাকেও পরামর্শ দেওয়া তাঁহার পক্ষে সমীচীন হইবে বলিয়া তিনি মনে করেন না। কারণ যে ব্যক্তি পথের সন্ধানে অন্ধকারে হাতড়াইতেছে, তাহার পক্ষে অপরকে চালিত করা অসম্ভব।

প্রারম্ভে গান্ধীজী বলেন যে, নোয়াখালিতে অভীষ্টসাধনে তাঁহাকে সাহায্য করিবার প্রস্তাব অনেকে তাঁহার নিকট করিয়াছেন। প্রকৃতই যদি তাঁহারা সেবার প্রেরণায় উদ্বোধিত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে সুযোগ আসিবামাত্র উহার সদ্ব্যবহার করার জন্য তাঁহাদের চেষ্টিত হওয়া উচিত। এজন্য তাঁহাদের কোন একটি স্থান বাছিয়া লইতে হইবে।

২৭শে ডিসেম্বর—রাষ্ট্রপতি আচার্য কৃপালনী ও শ্রীযুক্ত শঙ্কররাও দেও

সমভিব্যাহারে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু বেলা ৪টার সময় বিমানযোগে ফেণীতে আসিয়া পৌছেন। নেতৃবৃন্দ ৪-৫০ মিনিটের সময় মোটরযোগে শ্রীরামপুর রওনা হন। ফেণী বিমানঘাটিতে হিন্দু-মুসলমানের এক বিরাট জনতা নেতৃবৃন্দকে সম্বর্ধনা জানায়। দমদমে ইঞ্জিনে গোলযোগ হওয়ায় বিমানখানা প্রায় ২ ঘণ্টা বিলম্বে আসিয়া পৌছে। শ্রীরামপুর রওনা হইবার পূর্বে পণ্ডিত নেহরু ও আচার্য কৃপালনী বিমানঘাটিতে সমবেত জনতার নিকট বক্তৃতা করেন।

পণ্ডিত জওহরলাল বলেন যে, কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মহাত্মা গান্ধীর উপদেশ গ্রহণের জন্য তাঁহারা শ্রীরামপুরে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেছেন। নিজে পূর্ববঙ্গের অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্যও তিনি ব্যগ্র ছিলেন, কিন্তু কাজের চাপে তিনি পূর্বে আসিতে পারেন নাই। তিনি বলেন, পূর্ববঙ্গের ঘটনাবলী তাঁহাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ মসীলিপ্ত করিয়াছে। কোন বিশেষ সম্প্রদায় বা ধর্মাবলম্বী লোকের জন্য কংগ্রেস স্বাধীনতা চায় না, কংগ্রেস সকলের জন্যই স্বাধীনতা চায়। জনসাধারণ এই সাধারণ উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য সংগ্রাম না করিয়া আত্মকলহে প্রবৃত্ত হইয়াছে দেখিয়া তিনি খুবই দুঃখিত হইয়াছেন।

নেতৃবৃন্দ রাত্রিতেই শ্রীরামপুরে পৌছেন। সর্বপ্রথম পণ্ডিত নেহরু আসিয়া উপস্থিত হন। মিস্ মৃদুলা সারাভাই সমভিব্যাহারে তিনি রাত্রি ১১টার সামান্য কিছু পরে শ্রীরামপুরে পৌছেন। উহার পনর মিনিট পরে শ্রীযুক্ত শঙ্কররাও দেও আসিয়া উপস্থিত হন।

সর্বশেষে আসেন রাষ্ট্রপতি ও শ্রীযুক্তা সুচেতা কৃপালনী। ভুলপথে অগ্রসর হওয়াতেই তাঁহাদের পৌছিতে বিলম্ব ঘটে। যাহা হউক, মধ্যরাত্রির কিছুক্ষণ পূর্বেই তাঁহারা উভয়ে শ্রীরামপুরে পৌছিতে সক্ষম হন। নেতৃবৃন্দের আগমন-প্রত্যাশায় সেদিন বহুলোক গান্ধীজীর প্রার্থনা-সভায় উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু তাহাদিগকে নিরাশ হইয়া ফিরিয়া যাইতে হয়।

নেতৃবৃন্দ যখন সত্যসত্যই উপস্থিত হইলেন, তখন সমগ্র শ্রীরামপুর গ্রামে সুষুপ্তি বিরাজ করিতেছিল।

নোয়াখালির পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের সহিত পণ্ডিত নেহরু গভীর রাত্রিতে শ্রীরামপুর আসিয়া উপস্থিত হইলে অধ্যাপক শ্রীনির্মল বসু তাঁহাকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন।

পণ্ডিত নেহরু ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ ফেণী হইতে মোটরযোগে রামগঞ্জ যাত্রা করেন। রামগঞ্জ হইতে তাঁহারা পদব্রজে তিন মাইল পরিভ্রমণ করিয়া

শ্রীরামপুর পৌছেন। বিলম্বের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে পণ্ডিত নেহরু বলেন, দমদম বিমানঘাটিতে আমাদের প্রায় দুইঘণ্টা বিলম্ব হইয়াছিল। বিমানের টায়ার নষ্ট হইয়া যাওয়ায় উহা পরিবর্তন করিতে হয়।

পণ্ডিতজী বলেন, "আমি এখন ক্ষুধার্ত—নৈশাহার শেষ করাই এখন আমার ইচ্ছা।"

আজাদ হিন্দ ফৌজের সর্দার জীবন সিং তৎক্ষণাৎ নৈশাহারের ব্যবস্থা করিয়া দেন। নৈশাহার শেষ করিয়া পণ্ডিত নেহরু মহাত্মাজীর কুটিরে গমন করেন—কিন্তু তাঁহাকে গভীর নিদ্রিত অবস্থায় দেখিয়াই—তিনি নিজ কুটিরে ফিরিয়া আসেন।

২৮শে ডিসেম্বর—সকালে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু, আচার্য কৃপালনী ও শ্রীশঙ্কররাও দেও, মহাত্মা গান্ধীর সহিত তাঁহার কুটিরে সাক্ষাৎ করিয়া বহুক্ষণ আলাপ-আলোচনা করেন। সারাদিন তাঁহাদের মধ্যে মন্ত্রণা হয়; তবে মাঝে মাঝে আলোচনায় ছেদ পড়ে। পণ্ডিত নেহরু গণ-পরিষদের প্রথম অধ্যায়ের কার্যক্রম এবং লণ্ডন-ভ্রমণের অভিজ্ঞতা মহাত্মাজীর গোচর করেন।

গান্ধীজীর উপস্থিতিতে নেতৃবৃন্দের মধ্যে গণ-পরিষদ ও মণ্ডলীগঠন-সংক্রান্ত বিষয়ে কিছুকাল আলোচনা চলে। মণ্ডলীগঠন-সম্পর্কে গান্ধীজী সুনির্দিষ্ট অভিমত পোষণ করেন। তিনি এই অভিমত ব্যক্ত করেন যে, এই সম্পর্কে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার উদ্দেশ্যে ফেডারেল কোর্টের দ্বারস্থ হইলে কোন সুফল লাভ হইবে না।

পণ্ডিত নেহরু শ্রীরামপুরে গান্ধীজীর কুটিরসন্নিহিত কয়েকটি ভস্মীভূত গৃহ পরিদর্শন করেন। তিনি সাংবাদিক শিবিরেও গমন করেন। জনবিরল গ্রামটি অকস্মাৎ জনমুখর হইয়া উঠে। বৈকাল ৪টা হইতে জনতা গান্ধীজীর প্রার্থনা-সভায় যাইতে থাকে। পণ্ডিত নেহরু গান্ধীজীর কুটির হইতে বহির্গত হইয়া জনতার মধ্যে উপস্থিত হন। উপস্থিত হিন্দু ও মুসলমান সকলেই তাঁহাকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করে। পণ্ডিতজী স্মিতহাস্যে সকলকে প্রত্যভিবাদন জানান।

অধ্যাপক শ্রীনির্মল বসু শ্রোতৃবর্গকে বলেন যে, প্রার্থনার পর বক্তৃতা করার রীতি নাই বলিয়া নেতৃবর্গ বক্তৃতা করিবেন না। সকলে দর্শন পাইতে পারে, এমনভাবে তাঁহারা শুধু মঞ্চের উপর দাঁড়াইবেন। নেতৃবৃন্দ উঠিয়া দাঁড়াইলে সকলে বিপুল উল্লাসধ্বনি করে। মহিলাগণ উলুধ্বনি দেয়। একটি আট-বছরের বালক নেতৃবৃন্দের গলায় মালা পরাইয়া দেয়।

প্রার্থনার পর মহাত্মাজী জনতার নিকট নেতৃবর্গের পরিচয় করাইয়া দেন।

পণ্ডিতজীকে পরিচিত করাইতে যাইয়া গান্ধীজী বলেন যে, তিনি উপস্থিত রাষ্ট্রপতিদ্বয়ের অন্যতম। পণ্ডিতজী মন্ত্রিসভার ভাইস-প্রেসিডেণ্ট; সেখানে তিনি ভারতীয় জনগণের প্রতিনিধিত্ব করেন। আর আচার্য কৃপালনী বর্তমানে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সর্বোচ্চ পদে অধিষ্ঠিত। প্রথমোক্ত ব্যক্তি সর্বোচ্চ সরকারী পদে অধিষ্ঠিত, আর শেষোক্ত ব্যক্তির কেবলমাত্র অধিকারই আছে। কংগ্রেসের বর্তমান সাধারণ সম্পাদক শ্রীযুত শঙ্কররাও দেও ও বিদায়ী সাধারণ সম্পাদিকা মিস মৃদুলা সারাভাইও আমাদের মধ্যে আছেন। চারিজনই ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের তথা সমগ্র জাতির সেবক।

কেহ কেহ কংগ্রেসকে একটি হিন্দু-প্রতিষ্ঠান বলিয়া বর্ণনা করেন। ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসের প্রতি তাঁহারা শুধু অজ্ঞতাই প্রকাশ করেন।

হিন্দু-মহাসভার ন্যায় মুসলিম লীগ ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানও এক সময় কংগ্রেসের নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল।

এইরূপ ইঙ্গিত করা হইয়াছে যে, হিন্দুস্বার্থ-বিষয়ে তাঁহার সহিত পরামর্শের জন্য কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ এখানে আসিয়াছেন। তাঁহারা উহা করিলে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের মর্যাদা জগতের চক্ষে হেয় করিতেন। হিন্দু-মুসলমান সমস্যা সম্পর্কে একজন বিশেষজ্ঞ হিসাবে তাঁহার সহিত বর্তমানে দুর্যোগপূর্ণ সময়ে সর্বোৎকৃষ্ট উপায়ে জাতির সেবা বিষয়ে তাঁহারা আলোচনা করিতে আসিয়াছেন। শাসনরজ্জু জনগণের প্রতিনিধির হস্তে আসিয়াছে। জাতি স্বাধীনতার পথে আগাইয়া চলিয়াছে, কিন্তু এখনও উহা অর্জিত হয় নাই। আমরা বিজ্ঞোচিতভাবে আমাদের শক্তি পরিচালনা করিলে উহা নিশ্চয়ই আসিবে। নেতৃবৃন্দ বৃটিশের সাহায্য ব্যতিরেকে আমাদের সমস্যার সমাধান করিতে কৃতসঙ্কল্প। একটি পাদক্ষেপে জাতীয় স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হইতে পারে।

পরিশেষে গান্ধীজী বলেন যে, গতকল্য সন্ধ্যায় তিনি সুরাবর্দী সাহেব সম্বন্ধে কিছু বলিয়াছেন। গণতন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধা থাকিলে জনগণ মন্ত্রিমণ্ডলীকে অশ্রদ্ধা করিতে পারেন না। যদি কেহ বাংলার দুর্গত জনগণের সেবা করিতে ইচ্ছা করেন, তবে মন্ত্রিমণ্ডলীর অজ্ঞাতসারে ও অনুমোদন ব্যতীত কিছুই করা উচিত নহে। কোন কিছুই গোপন রাখা চলিবে না।

উপসংহারে গান্ধীজী বলেন যে, মুসলমানদের যে তিনি একজন অকৃত্রিম

বন্ধু ও শুভানুধ্যায়ী তাহাই তাঁহার কার্যের দ্বারা প্রমাণ করিতে তিনি নোয়াখালি আসিয়াছেন। ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠাই তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য।

২৯শে ডিসেম্বর—আসামের প্রধান মন্ত্রী শ্রীযুক্ত গোপীনাথ বরদোলী মণ্ডলী-গঠনে আসামের যোগদান সম্পর্কে পরামর্শগ্রহণের জন্য গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাৎ করেন। তাঁহাদের মধ্যে দুইঘণ্টাকাল আলোচনা হয়। আলোচনার শেষের দিকে আচার্য কৃপালনী ও শ্রীযুক্ত শঙ্কররাও দেও সেখানে উপস্থিত হন।

আলোচনা প্রসঙ্গে গান্ধীজী শ্রীযুক্ত বরদোলীকে বলেন, আপনি যদি আত্ম-হত্যা না করেন, তাহা হইলে কেহই আপনাকে হত্যা করিতে পারে না।

৩০শে ডিসেম্বর—গান্ধীজী মৌনদিবস পালন করেন। পণ্ডিত নেহরু ও তাঁহার দলের অন্যান্য লোক 'রাজবাটী' নামে যে বাটীতে ছিলেন, সেই বাটীর মালিক সকালে পণ্ডিতজীর সহিত দেখা করিয়া বলেন যে, গান্ধীজী যেখানে আছেন তিনি সেই কুটির এবং পুকুর ও নারিকেল-সুপারি-বাগানসহ দশ বার একর পরিমাণ জমি গান্ধীজীকে তাঁহার আদর্শ অনুযায়ী যে-কোন কাজে ব্যবহারের জন্য উপহার দিতে চান।

৩১শে ডিসেম্বর—মহাত্মা গান্ধী তাঁহার প্রার্থনান্ত-ভাষণে সংক্ষেপে পণ্ডিত নেহরু প্রমুখ নেতৃবৃন্দের উপস্থিতির বিষয় উল্লেখ করেন। তিনি বলেন যে, নেতৃবর্গ শাসনতান্ত্রিক ব্যাপারে উপদেশগ্রহণের জন্য তথায় আসেন। তাঁহারা তাঁহার নিকট হইতে কোনরূপ প্রস্তাব লইয়া যান নাই; কিন্তু হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের ভিত্তিতে আসন্ন শাসনতান্ত্রিক সমস্যা সমাধানের উপায় সম্বলিত লিখিত অভিমত লইয়া গিয়াছেন। ঐ মতামত পর্যালোচনা করিয়া তাঁহারা ওয়ার্কিং কমিটিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন।

গান্ধীজী আরও বলেন যে, হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য আমি যেসব কাজ করিতেছি, তাঁহারা সংবাদপত্রে উহার বিবরণ পাঠ করেন। কিন্তু তাঁহারা স্বচক্ষে অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য এখানে আসিতে চাহেন। নোয়াখালিতে যে ব্যাপার ঘটিয়া গিয়াছে, সমগ্র ভারতে যাহাতে তাহার পুনরাবৃত্তি না ঘটে তাহাই তাঁহারা ইচ্ছা করেন; এই সম্পর্কে গণপরিষদে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে বিবাদ মিটাইয়া ফেলার উদ্দেশ্যে তাঁহারা আমার সাহায্য ও উপদেশপ্রার্থী হন। কংগ্রেস কদাপি কোনও সম্প্রদায়েরই বিরোধী নহে।

গান্ধীজীর শ্রীরামপুর ত্যাগ

দীর্ঘ এক বংশদণ্ডের উপর দেহভার ন্যস্ত করিয়া ও ডাঃ সুশীলা নায়ারের স্কন্ধে একখানা হাত রাখিয়া মহাত্মা চণ্ডীপুর অভিমুখে যাত্রা করেন। শ্রীরামপুর শিবির ত্যাগের প্রাক্কালে মহাত্মা বাড়ীর লোকদের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করেন। মহাত্মা শ্রীরামপুরে এই বাড়ীতে অনুমান দেড় মাসকাল অবস্থান করেন।

গুবাকবৃক্ষের সারি ও ছোটখাট ঝোপঝাড়ের মধ্য দিয়া সর্পিল পল্লীপথ ধরিয়া মহাত্মা চণ্ডীপুর অভিমুখে অগ্রসর হন। মহাত্মা যদিও নিঃসঙ্গ ভ্রমণের পক্ষপাতী, তথাপি শতাধিক লোক তাঁহার অনুগমন করে। মহাত্মা পল্লী-গৃহগুলি অতিক্রম করিবার সময় পল্লীবাসী হিন্দু-মুসলমানগণ সকলেই তাঁহার দর্শনলাভের জন্য পথের উভয় পার্শ্বে সমবেত হয়। কেহ কেহ মহাত্মার অনুগমনও করে।

শ্রীরামপুর গ্রামের এক প্রান্তে অবস্থিত ভূতপূর্ব রাজবন্দী শ্রীঅনুকূলচন্দ্র চক্রবর্তীর বাড়ীর ধ্বংসাবশেষ দেখিবার জন্য মহাত্মা কিছু পথ ঘুরিয়া আসেন। অক্টোবর হাঙ্গামায় এই গৃহটি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইয়াছে। এই বাড়ীতে আসিবার সময় মহাত্মা যখন একখানি ধানক্ষেত পার হইতেছিলেন, তখন একজন মুসলমান বাহির হইয়া আসিয়া মহাত্মাকে কয়েকটি কমলালেবু দেয়। সেই লেবু কয়েকটি গ্রহণ করিয়া গান্ধীজী সঙ্গীদের মধ্যে বিতরণ করিয়া দেন। অনুকূলবাবুর বাড়ীতে মহাত্মা কিছুকাল বিশ্রাম করেন। এই সময় তাঁহাকে কিছু কমলালেবুর রস দেওয়া হইলে উহা পান করেন। এই স্থানে ৫ মিনিট বিশ্রাম করিয়া তিনি পুনরায় যাত্রা সুরু করেন ও শিবপুর গ্রামে মৌলভী ফজল হকের গৃহে গমন করেন। মৌলভী হক পূর্বদিন অপরাহ্ণে শ্রীরামপুরে মহাত্মার সহিত দেখা করিয়া চণ্ডীপুর যাইবার পথে তাঁহার গৃহে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিতে অনুরোধ জানাইয়াছিলেন—মহাত্মা কিছুক্ষণ তাঁহার গৃহে অবস্থান করেন।

মৌলভী সাহেবের বহির্বাটীতে মহাত্মাজী একখানি শকটের উপর বসিয়া কিছুকাল বিশ্রাম করেন। এই সময় বহু মুসলমান তাঁহার দর্শনলাভের জন্য আসে—অনেকে কিছু বিলম্বে আসায় হতাশ হইয়া ফিরিয়া যায়। যাইবার সময় মহাত্মা পুনরায় ঐ স্থানে আসিবেন বলিয়া কথা দেন। মৌলভী সাহেব

মহাত্মাকে একখানা থালা পূর্ণ করিয়া কলা, কমলালেবু ও পেঁপে দেন—মহাত্মা উহার কিছু কিছু ঐ স্থানে সমবেত বালকবালিকাদিগকে বিতরণ করেন—অবশিষ্টগুলি চণ্ডীপুর লইয়া যাওয়া হয়। এই স্থান হইতে গান্ধীজী সোজা চণ্ডীপুরে তাঁহার আশ্রয়-শিবিরে চলিয়া যান। পথে মহাত্মাকে একটি খাড়া সেতু পার হইতে হয়। সেতুটি শিবপুর ও চণ্ডীপুর—এই দুইটি গ্রামকে সংযুক্ত করিয়াছে। এই স্থানে মহাত্মা একটি নূতন বাজার দেখেন। এই বাজারটি সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়-প্রতিষ্ঠিত।

মহাত্মাজী চণ্ডীপুর গ্রামে প্রবেশ করা মাত্র গ্রামসেবা-সঙ্ঘের সদস্যগণ 'রামধুন' গান করেন। সদলে মহাত্মাজী নিজ বিশ্রামশিবিরে প্রবেশ না করা পর্যন্ত 'রামধুন' গীত হইতে থাকে। মহাত্মাজী নোয়াখালির কংগ্রেসকর্মী শ্রীযুত অবনী মজুমদারের গৃহে অবস্থান করেন।

মহাত্মার ঐতিহাসিক পল্লী-পরিক্রমা-সূচী

প্রথম পর্যায়

২রা জানুয়ারি বৃহস্পতিবার হইতে ৬ই জানুয়ারি সোমবার চণ্ডীপুর

৭ই জানুয়ারি	মঙ্গলবার	...	মসিমপুর
৮ই "	বুধবার	...	ফতেপুর
৯ই "	বৃহস্পতিবার	...	দাসপাড়া
১০ই "	শুক্রবার	...	জগৎপুর
১১ই "	শনিবার	...	লামচর
১২ই "	রবিবার	...	করপাড়া
১৩ই "	সোমবার	...	সাহাপুর
১৪ই "	মঙ্গলবার	...	ভাটিয়ালপুর
১৫ই "	বুধবার	...	নারায়ণপুর
১৬ই "	বৃহস্পতিবার	...	রামদেবপুর
১৭ই "	শুক্রবার	...	পরকোট
১৮ই "	শনিবার	...	বদলকোট
১৯শে "	রবিবার	...	আতাখোরা
২০শে "	সোমবার	...	শিরণ্ডী
২১শে "	মঙ্গলবার	...	কেথুরী
২২শে "	বুধবার	...	পানিয়ালা
২৩শে "	বৃহস্পতিবার	...	দলতা
২৪শে "	শুক্রবার	...	মুরাইম
২৫শে "	শনিবার	...	হীরাপুর
২৬শে "	রবিবার	...	বান্‌শা
২৭শে "	সোমবার	...	পাল্লা
২৮শে "	মঙ্গলবার	...	পাঁচগাঁও
২৯শে "	বুধবার	...	জয়াগ

৩০শে জানুয়ারী	বৃহস্পতিবার	...	আমকী
৩১শে "	শুক্রবার	...	নবগ্রাম
১লা ফেব্রুয়ারি	শনিবার	....	আমিষাপাড়া
২রা "	রবিবার	...	সাতঘরিয়া
৩রা ও ৪ঠা "	সোমবার ও মঙ্গলবার	...	সাধুরখিল

প্রথম পর্যায় সমাপ্ত

দ্বিতীয় পর্যায়

৫ই ফেব্রুয়ারি	বুধবার	...	শ্রীনগর
৬ই "	বৃহস্পতিবার	...	ধর্মপুর
৭ই "	শুক্রবার	...	প্রসাদপুর
৮ই "	শনিবার	...	নন্দীগ্রাম
৯ই ও ১০ই	রবিবার ও সোমবার	...	বিজয়নগর
১১ই "	মঙ্গলবার	...	হামচাঁদী
১২ই "	বুধবার	...	কাফিলাতলী
১৩ই "	বৃহস্পতিবার	...	পূর্ব-কেরোয়া
১৪ই "	শুক্রবার	...	পশ্চিম-কেরোয়া
১৫ই ও ১৬ই	শনিবার ও রবিবার	...	রায়পুরা
১৭ই "	সোমবার	...	দেবীপুর
১৮ই "	মঙ্গলবার	...	আলুনিয়া
১৯শে "	বুধবার	...	বিরামপুর
২০শে "	বৃহস্পতিবার	...	বিশকাটালী
২১শে "	শুক্রবার	...	কমলাপুর
২২শে "	শনিবার	....	চরকৃষ্ণপুর
২৩শে "	রবিবার	...	চরসোলাদি
২৪শে হইতে ১লা মার্চ	সোমবার হইতে শনিবার	...	হাইমচর

দ্বিতীয় পর্যায় সমাপ্ত

মহাত্মাজীর প্রার্থনাসভায় যে 'রামধুন' সঙ্গীতটি গাওয়া হইত তাহা নিম্নে দেওয়া হইল ঃ—

রঘুপতি রাঘব রাজারাম
পতিত পাবন সীতারাম
মঙ্গল পরশন রাজারাম
পতিত পাবন সীতারাম
শুভ শান্তি বিধায়ক রাজারাম
পতিত পাবন সীতারাম
বরাভয় দানরত রাজারাম
পতিত পাবন সীতারাম
নির্ভয় কর প্রভু রাজারাম
পতিত পাবন সীতারাম
দিন দয়াল রাজারাম
পতিত পাবন সীতারাম
রাজারাম, জয় সীতারাম
পতিত পাবন সীতারাম।

নোয়াখালিতে সেবারত কর্মী শ্রীযুক্ত সৌরীন বসু প্রার্থনাসভায় সুমধুর কণ্ঠে 'রামধুন' সঙ্গীতটি গাহিতেন এবং 'রামধুনের' তালে তালে সকলে হাততালি দিত। শ্রীযুক্ত বসু উপস্থিত থাকিতে না পারিলে শ্রীমতী মনু গান্ধী অথবা অন্য কেহ 'রামধুন' গাহিত।

প্রার্থনাসভায় প্রত্যহ একটি রবীন্দ্র-সঙ্গীত হইত। সভায় সুগায়ক অথবা সুগায়িকা উপস্থিত থাকিলে তাঁহার উপরই রবীন্দ্র-সঙ্গীত গাওয়ার ভার পড়িত। তবে সুদূর পল্লী-অঞ্চল পরিভ্রমণকালে সুগায়কের সন্ধান কদাচিৎ মিলিয়াছে। বেশীরভাগ দিনই সাংবাদিকদের মধ্য হইতে কোন একজনকে রবীন্দ্র-সঙ্গীত গাহিতে হইত। তবে সাংবাদিকদের মধ্যে সুগায়ক তেমন কেহ ছিল একথা বলিলে সত্যের অপলাপ বা নিজগোষ্ঠীর প্রশংসার প্রয়াস ছাড়া আর কোন প্রয়াসই প্রকাশ পাইবে না। তবে সাংবাদিকদের মধ্যে তুই-একজন যেটুকু জানিত তাহাতেই ঠেকাকাজ চলিয়া যাইত।

গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে ভ্রমণের সময় গান্ধীজী পথে গান শুনিতে ভালবাসিতেন। কেবল কুটির হইতে বাহির হইবার সময় এবং গ্রামান্তরে

নূতন কুটিরে প্রবেশকালে রামধুন হইত। তাহা ছাড়া সমস্ত পথটা রবীন্দ্র-সঙ্গীত হইত। সাংবাদিকদলই রবীন্দ্র-সঙ্গীত করিতেন। গান্ধীজী 'গুরুদেবের' গান ছাড়া আর কাহারও গান শুনিতে চাহিতেন না। কেবল অতুলপ্রসাদের 'শত-বীণা-বেণুরবে' ছাড়া আর সমস্তই রবীন্দ্র-সঙ্গীত হইত। সাংবাদিকদের সঙ্গীত পারদর্শিতার কথা পূর্বেই একবার উল্লেখ করিয়াছি। সুর, তাল প্রভৃতির কোন বালাই ছিল না। দশজনের কণ্ঠ হইতে দশরকম শব্দের সংমিশ্রণে এক অপূর্ব সঙ্গীতের সৃষ্টি হইত। কাহারও কাহারও গলা ছিল আবার একেবারে বেসুরো। যে দুই-একজনের গলা এরই মধ্যে কিছুটা ভাল ছিল, তাহাদের গলাও অপরাপরের চিৎকারে ডুবিয়া যাইত।

স্থানকাল বিবেচনায় সাংবাদিকগণ দশ-বারটি গান বাছিয়া লইয়াছিলেন। "একলা চলরে" ছিল গান্ধীজীর প্রাণের সঙ্গীত। এই গানটি প্রত্যহ সকলের আগে গাওয়া হইত। গান্ধীজী এই গানটি বারবার শুনিতে চাহিতেন।

গান্ধীজীর পল্লী-পরিক্রমার সময় যে গানগুলি গাওয়া হইত সেই গানগুলি নিম্নে দেওয়া হইল ঃ—

(১) যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে।
একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো রে ॥
যদি কেউ কথা না কয়, ওরে ওরে ও অভাগা,
যদি সবাই থাকে মুখ ফিরায়ে সবাই করে ভয়—
তবে পরান খুলে
ও তুই মুখ ফুটে তোর মনের কথা একলা বলো রে ॥

যদি সবাই ফিরে যায়, ওরে ওরে ও অভাগা,
যদি গহন পথে যাবার কালে কেউ ফিরে না যায়—
তবে পথের কাঁটা
ও তুই রক্তমাখা চরণতলে একলা দলো রে ॥

যদি আলো না ধরে, ওরে ওরে ও অভাগা,
যদি ঝড়-বাদলে আঁধার রাতে দুয়ার দেয় ঘরে—
তবে বজ্রানলে
আপন বুকের পাঁজর জ্বালিয়ে নিয়ে একলা জ্বলো রে ॥

—রবীন্দ্রনাথ

(২) জনগণমন-অধিনায়ক জয় হে ভারতভাগ্যবিধাতা !
পাঞ্জাব সিন্ধু গুজরাট মারাঠা দ্রাবিড় উৎকল বঙ্গ
বিন্ধ্য হিমাচল যমুনা গঙ্গা উচ্ছল জলধিতরঙ্গ
তব শুভ নামে জাগে, তব শুভ আশিস মাগে,
গাহে তব জয়গাথা।
জনগণমঙ্গলদায়ক জয় হে ভারতভাগ্যবিধাতা !
জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয় জয় জয়, জয় হে ॥

অহরহ তব আহ্বান প্রচারিত, শুনি তব উদার বাণী
হিন্দু বৌদ্ধ শিখ জৈন পারসিক মুসলমান খৃস্টানী।
পূরব পশ্চিম আসে তব সিংহাসন-পাশে,
প্রেমহার হয় গাঁথা।
জনগণ-ঐক্য-বিধায়ক জয় হে ভারতভাগ্যবিধাতা !
জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয় জয় জয়, জয় হে ॥

পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর পন্থা, যুগ-যুগ-ধাবিত যাত্রী।
হে চিরসারথি, তব রথচক্রে মুখরিত পথ দিনরাত্রি।
দারুণ বিপ্লব-মাঝে তব শঙ্খধ্বনি বাজে
সঙ্কটদুঃখত্রাতা।
জনগণপথপরিচায়ক জয় হে ভারতভাগ্যবিধাতা !
জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয় জয় জয়, জয় হে ॥

ঘোরতিমিরঘন নিবিড় নিশীথে পীড়িত মূর্ছিত দেশে
জাগ্রত ছিল তব অবিচল মঙ্গল নতনয়নে অনিমেষে।
দুঃস্বপ্নে আতঙ্কে রক্ষা করিলে অঙ্কে
স্নেহময়ী তুমি মাতা।
জনগণদুঃখত্রায়ক জয় হে ভারতভাগ্যবিধাতা !
জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয় জয় জয়, জয় হে ॥

রাত্রি প্রভাতিল, উদিল রবিচ্ছবি পূর্ব-উদয়গিরিভালে—
গাহে বিহঙ্গম, পুণ্য সমীরণ নবজীবনরস ঢালে।
তব করুণারুণরাগে নিদ্রিত ভারত জাগে
তব চরণে নত মাথা।
জয় জয় জয় হে, জয় রাজেশ্বর ভারতভাগ্যবিধাতা!
জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয় জয় জয়, জয় হে॥

—রবীন্দ্রনাথ

(৩) দেশ দেশ নন্দিত করি মন্দ্রিত তব ভেরী,
আসিল যত বীরবৃন্দ আসন তব ঘেরি।
দিন আগত ওই, ভারত তবু কই?
সে কি রহিল লুপ্ত আজি সব-জন-পশ্চাতে?
লউক বিশ্বকর্মভার মিলি সবার সাথে।
প্রেরণ কর ভৈরব তব দুর্জয় আহ্বান হে, জাগ্রত ভগবান হে॥

বিঘ্নবিপদ দুঃখদহন তুচ্ছ করিল যারা
মৃত্যুগহন পার হইল, টুটিল মোহকারা।
দিন আগত ওই, ভারত তবু কই?
নিশ্চল নির্বীর্যবাহু কর্মকীর্তিহীনে
ব্যর্থশক্তি নিরানন্দ জীবনধনদীনে
প্রাণ দাও, প্রাণ দাও, দাও দাও প্রাণ হে, জাগ্রত ভগবান হে॥

নূতন যুগ সূর্য উঠিল, ছুটিল তিমিররাত্রি
তব মন্দির-অঙ্গন ভরি মিলিল সকল যাত্রী।
দিন আগত ওই, ভারত তবু কই?
গত গৌরব, হৃত-আসন, নতমস্তক লাজে—
গ্লানি তার মোচন কর নরসমাজমাঝে।
স্থান দাও, স্থান দাও, দাও দাও স্থান হে, জাগ্রত ভগবান হে॥

জনগণপথ তব জয়রথচক্রমুখর আজি,
স্পন্দিত করি দিগ্‌দিগন্ত উঠিল শঙ্খ বাজি।

দিন আগত ওই, ভারত তবু কই ?
দৈন্য জীর্ণ কক্ষ তার, মলিন শীর্ণ আশা,
ত্রাসরুদ্ধ চিত্ত তার, নাহি নাহি ভাষা।
কোটি মৌন কণ্ঠপূর্ণ বাণী কর দান হে, জাগ্রত ভগবান হে ॥

যারা তব শক্তি লভিল নিজ অন্তরমাঝে
বর্জিল ভয়, অর্জিল জয়, সার্থক হল কাজে।
দিন আগত ওই, ভারত তবু কই ?
আত্ম-অবিশ্বাস তায় নাশ কঠিন ঘাতে,
পুঞ্জিত অবসাদভার হান অশনিপাতে।
ছায়াভয়চকিতমূঢ় করহ পরিত্রাণ হে, জাগ্রত ভগবান হে ॥

—রবীন্দ্রনাথ

(৪) মিলেছি আজ মায়ের ডাকে।
ঘরের হ'য়ে পরের মতন
ভাই ছেড়ে ভাই ক'দিন থাকে ॥

প্রাণের মাঝে থেকে থেকে
আয় বলে ওই ডেকেছে কে,
গভীর স্বরে উদাস করে,
আর কে কারে ধরে রাখে ॥

যেথায় থাকি যে যেখানে
বাঁধন আছে প্রাণে প্রাণে,
প্রাণের টানে টেনে আনে,
প্রাণের বেদন জানে না কে ॥

মান অপমান গেছে ঘুচে
নয়নের জল গেছে মুছে,
নবীন আশে হৃদয় ভাসে
ভাইয়ের পাশে ভাইকে দেখে ॥

কতদিনের সাধন ফলে,
মিলেছি আজ দলে দলে,
ঘরের ছেলে সবাই মিলে
দেখা দিয়ে আয়রে মাকে ॥

—রবীন্দ্রনাথ

(৫) বল, বল, বল সবে, শত-বীণা-বেণু-রবে
ভারত আবার জগৎ-সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে।
ধর্মে মহান্ হবে, কর্মে মহান্ হবে,
নব দিনমণি উদিবে আবার পুরাতন এ পূরবে।
আজও গিরিরাজ রয়েছে প্রহরী,
গিরি তিন দিক নাচিছে লহরী ;
যায়নি শুকায়ে গঙ্গা গোদাবরী,—
এখনো অমৃতবাহিনী।
প্রতি প্রান্তর, প্রতি গুহা বন,
প্রতি জনপদ, তীর্থ অগণন,
কহিছে গৌরব কাহিনী।

বলো বলো বলো সবে, শত-বীণা-বেণু-রবে
ভারত আবার জগৎ-সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে।
ধর্মে মহান্ হবে, কর্মে মহান্ হবে,
নব দিনমণি উদিবে আবার পুরাতন এ পূরবে।
বিদুষী মৈত্রেয়ী খনা লীলাবতী
সতী সাবিত্রী সীতা অরুন্ধতী,
বহু বীরবালা বীরেন্দ্র-প্রসূতি,—
আমরা তাঁদেরই সন্ততি।
অনলে দহিয়া রাখে যারা মান,
পতি-পুত্র-তরে সুখে ত্যজে প্রাণ,
আমরা তাঁদেরই সন্ততি।

বলো বলো বলো সবে, শত-বীণা-বেণু-রবে,
ভারত আবার জগৎ-সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে।
ধর্মে মহান্ হবে, কর্মে মহান্ হবে,
নব দিনমণি উদিবে আবার পুরাতন এ পূরবে।
ভোলেনি ভারত, ভোলেনি সে কথা,
অহিংসার বাণী উঠেছিল হেথা ;
নানক নিমাই করেছিল ভাই
সকল ভারত-নন্দনে।
ভুলি ধর্ম-দ্বেষ-জাতি-অভিমান
ত্রিশ কোটি দেহ হবে এক-প্রাণ,
এক-জাতি-প্রেম-বন্ধনে।

বলো বলো বলো সবে, শত-বীণা-বেণু-রবে,
ভারত আবার জগৎ-সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে।
ধর্মে মহান্ হবে, কর্মে মহান্ হবে,
নব দিনমণি উদিবে আবার পুরাতন এ পূরবে।
মোদের এদেশ নাহি রবে পিছে,
ঋষি-রাজকুল জন্মে নি মিছে ;
দুদিনের তরে হীনতা সহিছে,
জাগিবে আবার জাগিবে।
আসিবে শিক্ষা ধন বাণিজ্য,
আসিবে বিদ্যা বিনয় বীর্য,
আসিবে আবার আসিবে।

বলো বলো বলো সবে, শত-বীণা-বেণু-রবে,
ভারত আবার জগৎ-সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে।
ধর্মে মহান্ হবে, কর্মে মহান্ হবে,
নব দিনমণি উদিবে আবার পুরাতন এ পূরবে।
এসো হে কৃষক কুটীরনিবাসী,
এসো অনার্য গিরি-বনবাসী,

এসো হে সংসারী, এসো হে সন্ন্যাসী,
মিল হে মায়ের চরণে।
এসো অবনত, এসো হে শিক্ষিত,
পর-হিত-ব্রতে হইয়া দীক্ষিত,
মিল' হে মায়ের চরণে।
এসো হে হিন্দু, এসো মুসলমান,
এসো হে পারসী, বৌদ্ধ, খৃস্টিয়ান,
মিল' হে মায়ের চরণে।

—অতুলপ্রসাদ

(৬) সঙ্কোচের বিহ্বলতা নিজেরে অপমান,
সঙ্কটের কল্পনাতে হোয়ো না ম্রিয়মাণ।
মুক্ত করো ভয়, আপনা-মাঝে শক্তি ধরো, নিজেরে করো জয়।
দুর্বলেরে রক্ষা করো, দুর্জনেরে হানো,
নিজেরে দীন নিঃসহায় যেন কভু না জানো।

মুক্ত করো ভয়, নিজের 'পরে করিতে ভর না রেখো সংশয়।
ধর্ম যবে শঙ্খরবে করিবে আহ্বান
নীরব হয়ে, নম্র হয়ে, পণ করিয়ো প্রাণ।
মুক্ত করো ভয়, দুরূহ কাজে নিজেরই দিয়ো কঠিন পরিচয়॥

—রবীন্দ্রনাথ

(৭) তোর আপন জনে ছাড়বে তোরে ;
তা বলে ভাবনা করা চলবে না।
ও তোর আশালতা পড়বে ছিঁড়ে,
হয়তো রে ফল ফলবে না॥

আসবে পথে আঁধার নেমে, তাই বলেই কি রইবি থেমে—
ও তুই বারে বারে জ্বালবি বাতি,
হয়তো বাতি জ্বলবে না॥

শুনে তোমার মুখের বাণী আসবে ঘিরে বনের প্রাণী—
হয়তো তোমার আপন ঘরে
পাষাণ হিয়া গলবে না।

বদ্ধ দুয়ার দেখলি বলে অমনি কি তুই আসবি চলে—
তোরে বারে বারে ঠেলতে হবে,
হয়তো দুয়ার টলবে না ॥

—রবীন্দ্রনাথ

(৮) হে মোর চিত্ত, পুণ্যতীর্থে জাগো রে ধীরে—
এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে ॥
হেথায় দাঁড়ায়ে দু বাহু বাড়ায়ে নমি নরদেবতারে—
উদারছন্দে, পরমানন্দে বন্দন করি তাঁরে।
ধ্যানগম্ভীর এই যে ভূধর, নদী-জপমালা-ধৃত প্রান্তর,
হেথায় নিত্য হেরো পবিত্র ধরিত্রীরে—
এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে ॥

কেহ নাহি জানে কার আহ্বানে কত মানুষের ধারা
দুর্বার স্রোতে এল কোথা হতে সমুদ্রে হল হারা।
হেথায় আর্য, হেথা অনার্য, হেথায় দ্রাবিড় চীন—
শক-হূন-দল পাঠান-মোগল এক দেহে হল লীন।
পশ্চিম আজি খুলিয়াছে দ্বার, সেথা হতে সবে আনে উপহার,
দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে, যাবে না ফিরে—
এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে ॥

এসো হে আর্য, এসো অনার্য, হিন্দু মুসলমান।
এসো এসো আজ তুমি ইংরাজ, এসো এসো খৃস্টান।
এসো ব্রাহ্মণ, শুচি করি মন ধরো হাত সবাকার।
এসো হে পতিত, হোক অপনীত সব অপমানভার।
মার অভিষেকে এসো এসো ত্বরা, মঙ্গলঘট হয় নি যে ভরা
সবার-পরশে-পবিত্র-করা তীর্থনীরে—
আজি ভারতের মহামানবের সাগরতীরে ॥

—রবীন্দ্রনাথ

(৯) হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী, নিত্য নিঠুর দ্বন্দ্ব ;
ঘোর কুটিল পন্থ তার লোভজটিল বন্ধ ॥
নূতন তব জন্ম লাগি কাতর যত প্রাণী—
কর ত্রাণ মহাপ্রাণ, আন অমৃতবাণী,
বিকশিত কর প্রেমপদ্ম চিরমধুনিষ্যন্দ।
শান্ত হে, মুক্ত হে, হে অনন্তপুণ্য,
করুণাঘন, ধরণীতল কর কলঙ্কশূন্য ॥

এসো দানবীর, দাও ত্যাগকঠিন দীক্ষা,
মহাভিক্ষু, লও সবার অহঙ্কার ভিক্ষা।
লোক লোক ভুলুক শোক, খণ্ডন কর মোহ,
উজ্জ্বল হোক জ্ঞানসূর্য-উদয় সমারোহ—
প্রাণ লভুক সকল ভুবন, নয়ন লভুক অন্ধ।
শান্ত হে, মুক্ত হে, হে অনন্তপুণ্য,
করুণাঘন, ধরণীতল কর কলঙ্কশূন্য।

ক্রন্দনময় নিখিলহৃদয় তাপদহনদীপ্ত
বিষয়বিষবিকারজীর্ণ খিন্ন-অপরিতৃপ্ত।
দেশ দেশ পরিল তিলক রক্তকলুষ গ্লানি,
তব মঙ্গলশঙ্খ আন তব দক্ষিণ পাণি—
তব শুভ সঙ্গীতরাগ, তব সুন্দর ছন্দ।
শান্ত হে, মুক্ত হে, হে অনন্তপুণ্য,
করুণাঘন, ধরণীতল কর কলঙ্কশূন্য ॥

—রবীন্দ্রনাথ

(১০) ভেঙেছো দুয়ার, এসেছো জ্যোতির্ময়, তোমারই হউক জয়।
তিমির বিদার উদার অভ্যুদয়, তোমারই হউক জয় ॥
হে বিজয়ী বীর, নব-জীবনের প্রাতে
নবীন আশার খড়্গ তোমার হাতে—
জীর্ণ আবেশ কাটো সুকঠোর ঘাতে, বন্ধন হোক ক্ষয় ॥

এসো দুঃসহ, এসো এসো নির্দয়, তোমারি হউক জয়।
এসো নির্মল, এসো এসো নির্ভয় ; তোমারি হউক জয়।

প্রভাত সূর্য, এসেছ রুদ্র সাজে
দুঃখের পথে তোমার তূর্য বাজে—
অরুণবহ্নি জ্বালাও চিত্তমাঝে, মৃত্যুর হোক লয় ॥
—রবীন্দ্রনাথ

(১১) হবে জয়, হবে জয়, হবে জয় রে,
ওহে বীর, হে নির্ভয়।
জয়ী প্রাণ, চিরপ্রাণ, জয়ী রে আনন্দ গান,
জয়ী প্রেম, জয়ী ক্ষেম, জয়ী জ্যোতির্ময় রে ॥

এ আঁধার হবে ক্ষয়, হবে ক্ষয় রে,
ওহে বীর, হে নির্ভয়।
ছাড়ো ঘুম, মেলো চোখ, অবসাদ দূর হোক,
আশার অরুণালোক হোক অভ্যুদয় রে ॥
—রবীন্দ্রনাথ

নূতন গ্রামে পৌছিয়া গান্ধীজী গরমজলে দুই পায়ের কাদামাটি ধুইয়া ফেলিতেন। কঠোর শীতের সকালে খালিপায়ে বন্ধুর পথে হাঁটিতে হাঁটিতে তাঁহার পায়ের নীচে নীলা পড়িয়া যাইত। কিছুক্ষণের জন্য তিনি গরমজলে পা চুবাইয়া বসিয়া থাকিতেন। প্রত্যহ সকালে এই সময় তিনি বাংলা ভাষা শিখিতেন। সাংবাদিকদের মধ্য হইতে একজন গান্ধীজীর বাংলা পাঠে সাহায্য করিত। শ্রীযুক্ত শৈলেন চ্যাটার্জীর উপর এই ভার পড়িয়াছিল। শৈলেনবাবুর উপর আর একটি কাজের ভারও ছিল। প্রত্যহ ঘড়ির কাঁটা ধরিয়া ঠিক রাত ৮টার সময় গান্ধীজীকে খবরের কাগজ পাঠ করিয়া শুনাইতে হইত। গান্ধীজী প্রত্যহ সকালে প্রায় আধঘণ্টা বাংলা পাঠাভ্যাস করিতেন। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই গান্ধীজী যে অর্থ উপলব্ধি করিবার মত মোটামুটি বাংলা শিখিয়া ফেলিয়াছিলেন বহুবার তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। সাধুরখিলে স্থানীয় মুসলমানদের তরফ হইতে বাংলাভাষায় লিখিত একটি দীর্ঘ অভিনন্দন পত্র পাঠ করা হইলে গান্ধীজী এই পত্রের অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেকটি প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দেন। হাইমচরে গান্ধীজী নুরন্নবী সাহেবের বাংলা ভাষায় সুদীর্ঘ বক্তৃতার প্রত্যেকটি আলোচ্য বিষয়ের সুস্পষ্ট জবাব দেন।

বাংলা পড়া শেষ হইলে গান্ধীজী স্থানীয় অধিবাসী—যাঁহারা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন তাঁহাদের অভাব-অভিযোগের কথা শুনিতেন।

বেলা ১১ টার সময় গান্ধীজী একখানি চাপাটী, খানিকটা দুগ্ধ, তরকারী সিদ্ধ ও একটু গ্লুকোজ দিয়া মধ্যাহ্নভোজন সমাধা করিতেন। চাপাটীখানি তৈয়ারী হইত এক ছটাক পরিমিত তরকারী সিদ্ধ, ৩ ছটাক পরিমিত আটা এবং একটু সোডা ও লবণ সহযোগে।

বেলা ১২টা এইরকম সময় গান্ধীজী শরীরে তৈলমর্দন করিতেন। তৈল মর্দনের সময়ও প্রায়ই তাঁহাকে সাক্ষাৎপ্রার্থীদের সহিত আলোচনায় প্রবৃত্ত থাকিতে দেখা যাইত।

স্নানের পর তিনি কিছুটা ডাবের জল পান করিতেন। বেলা ২টা হইতে শয্যাগ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত বিশেষ কর্মব্যস্ততার মধ্যে গান্ধীজীর সময় অতিবাহিত হইত। বেলা ৩টার সময় মহিলা-সভায় বক্তৃতা করিতেন অথবা গ্রাম-সেবক-সংঘের সভায় গ্রামোন্নয়ন এবং গঠনমূলক কার্য সম্বন্ধে কর্মীদের উপদেশ দিতেন।

সাড়ে ৪টার সময় গান্ধীজী প্রার্থনাসভায় রওনা হইতেন। ঠিক ৫টার সময় প্রার্থনা আরম্ভ হইত। প্রার্থনার পর স্থানীয় অধিবাসীদের কিছু জিজ্ঞাস্য থাকিলে তাহার উত্তর দিতেন এবং বিভিন্ন বিষয়ের অবতারণা করিয়া বক্তৃতা করিতেন। সভা শেষ হইলে গান্ধীজী সভাস্থল হইতেই সান্ধ্যভ্রমণে বাহির হইয়া গ্রাম্যপথে কিয়দ্দূর বেড়াইয়া আসিতেন। সান্ধ্যভ্রমণের সময় প্রায়ই তিনি স্থানীয় মুসলমান ও হিন্দু অধিবাসীদের বাটীতে যাইতেন। ঘড়ি ধরিয়া ঠিক আধঘণ্টা হাঁটিবার পর তিনি আবাসস্থলে ফিরিয়া আসিতেন।

রাত্রি ঠিক ৮টার সময় সংবাদপত্র পাঠ করিয়া গান্ধীজীকে শুনান হইত। ইহার পরও শয়নের পূর্বপর্যন্ত তিনি স্থানীয় অধিবাসীদের সহিত আলাপ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেন। রাত্রি ঠিক ৯টার সময় শয্যাগ্রহণ করিতেন।

সূর্যাস্তের পর গান্ধীজী সাধারণতঃ কিছুই আহার করিতেন না। সন্ধ্যার পূর্বেই তিনি আহার সারিয়া ফেলিতেন। মধ্যাহ্নে যাহা খাইতেন সন্ধ্যার পূর্বেও তাঁহার আহার সেইভাবে প্রস্তুত হইত।

গান্ধীজীর পল্লী-পরিক্রমার সঙ্গী বলিতে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নির্মল বসু, গান্ধীজীর নাতনী শ্রীমতী মনু গান্ধী, উর্দূ করেসপণ্ডেণ্ট সৈয়দ মহম্মদ আহমদ হুনর ও কর্ণেল জীবন সিং তাঁহার সহিত ছিলেন। একদল সাংবাদিকও বরাবর গান্ধীজীর সহিত ছিলেন। বাংলা গবর্নমেণ্টের ব্যবস্থানুযায়ী একদল সশস্ত্র পুলিশও গান্ধীজীর পিছু লইয়াছিলেন। গান্ধীজীর ইচ্ছা ছিল একান্ত যাহাদের প্রয়োজন সেই রকম দুই-একজন ছাড়া পল্লী-পরিক্রমার পথে আর

কেহ তাঁহার সঙ্গী না হয়। পুলিশ সরাইয়া লইবার জন্য তিনি পুনঃ পুনঃ গভর্নমেণ্টকে অনুরোধ করিয়াছেন। সাংবাদিকদেরও তিনি বার বার তাঁহার পিছু না লইতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু সাংবাদিকের দল নাছোড়বান্দা। অবশেষে গান্ধীজী তাঁহাদের অনুমতি দেন। তবে সাংবাদিকগণ যাহাতে দলে ভারী না হইয়া উঠেন সে ব্যবস্থা করেন। গান্ধীজীর নির্দেশক্রমে শ্রীযুত নির্মল বসু সাংবাদিকদের আসিতে নিষেধ করিয়া সংবাদপত্রে এক বিবৃত দেন। কেবল যে সমস্ত সংবাদপত্রের এবং সংবাদ প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগণ প্রথম হইতে গান্ধীজীর সহিত ছিলেন তাহাদের থাকিতে দেওয়া হয়। মাঝপথে যে-কোন সংবাদপত্র বা সংবাদ প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিই আসিয়াছেন তাঁহাকেই নির্বিচারে সেইদিনই গান্ধীজীর নির্দেশে সটান ফিরিতে হইয়াছে। মাদ্রাজ হইতে 'হরিজন' পত্রিকার প্রতিনিধি আসিয়াছিলেন ; তাঁহাকেও গান্ধীজীর নির্দেশে ফিরিতে হয়। 'চিকাগো ডেলি নিউজের' প্রতিনিধির ভাগ্যেও সেই একই প্রকার ঘটে। এইভাবে মাঝপথে যাঁহারাই আসেন তাঁহাদের সকলের প্রতিই গান্ধীজী সেই একই নির্দেশ দেন।

গান্ধীজীর গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে পরিভ্রমণের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিটি গ্রামের হাঙ্গামা সম্পর্কিত এবং স্থানীয় অধিবাসীদের সামাজিক ও অর্থ নৈতিক অবস্থা, তাহাদের অভাব-অভিযোগ সম্পর্কিত যথাসম্ভব খুঁটিনাটি তথ্যাদি সংগৃহীত হইতেছিল। এই উদ্দেশ্যে একটি ছোটখাট অফিসও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিতেছিল। অফিস মানে একটি মাঝারি ধরণের টিনের বাক্স ও একটি ছোট টাইপরাইটার মেশিন। এই অফিসের পরিচালক ও কর্মচারী বলিতে যাহা কিছু সমস্তই ছিলেন অধ্যাপক শ্রীনির্মল বসু এবং গান্ধীজী নিজে। এই অফিসে কাজ যাহা কিছু হইত চট্‌পট্ ; অফিসীআনা ও গদাইলস্করী চাল ইহার মধ্যে কোথাও ছিল না। এইভাবে কাজ চালাইয়া সেখানে দিনের পর দিন ভারতের সর্বস্থানের সমস্ত ব্যাপারের সহিত যোগাযোগ রক্ষা করা হইতেছিল।

গান্ধীজীর কাজের চাপ ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাওয়ায় নির্মলবাবু কাগজের মারফৎ জানাইয়া দিয়াছিলেন যে, নোয়াখালির গ্রামে গ্রামে ঘুরিবার সময় গান্ধীজী ভারতের সকল স্থানের চিঠিপত্র লইয়া আর মাথা ঘামাইতে পারিবেন না। তবুও চিঠিপত্র আসা বন্ধ হয় নাই। চিঠিপত্র আসিতেই থাকে—এবং সে শুধু ভারতের নানাস্থান হইতেই নহে—পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ হইতেও প্রত্যহ বহু চিঠিপত্র আসিতে থাকে। এই সমস্ত চিঠিপত্রের কোনটিতে গুরুতর শাসনতান্ত্রিক

প্রশ্নাবলী সম্পর্কে আলোচনা থাকিত, আবার কোনখানিতে হয়ত বা নিছক পাগলের পাগলামি ছাড়া আর কিছুই খুঁজিয়া পাওয়া যাইত না। এ সমস্ত ছাড়াও বড় বড় বিবৃতি, ছোটখাট ঘটনার সংবাদ ও স্থানীয় নানাপ্রকার নালিশ —এই সমস্ত নানাস্থান হইতে পাঠান হইত। এই সমস্ত চিঠিপত্রের পাঁজা হইতে বাছিয়া নির্মলবাবু খান চল্লিশেক করিয়া চিঠি প্রত্যহ গান্ধীজীকে দেখাইতেন।

গান্ধীজী সাধারণতঃ সূর্যোদয়ের পূর্বে শয্যাত্যাগ করিতেন। প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করিয়া প্রার্থনায় বসিতেন। প্রার্থনার পর সামান্য ফলের রস পান করিতেন। অতঃপর ঘণ্টাখানেক অথবা কিছু অধিক সময় তিনি চিঠিপত্রের উত্তরদান করিয়া, ডায়রী লিখিয়া এবং চরকা কাটিয়া অতিবাহিত করিতেন। কিছুক্ষণ বিশ্রাম গ্রহণ করিয়া ঠিক সাড়ে ৭টার সময় পদব্রজে পরবর্তী পল্লী অভিমুখে রওনা হইতেন।

বাংলায় যাত্রার প্রাক্কালে গান্ধীজী বলিলেন, "কাহারও বিচার করার জন্য আমি বাংলায় যাইতেছি না। জনগণের সেবক হিসাবেই আমি হিন্দু-মুসলমান সকলের সহিতই সাক্ষাৎ করিব। আমি সেবকের অধিকার লইয়া বাংলায় যাইতেছি। আমি তাহাদের বলিব, হিন্দু অথবা মুসলমান কেহই কাহারও শত্রু হইতে পারে না। ভারতেই তাঁহারা লালিত পালিত হইয়াছেন, ভারতবর্ষেই তাঁহারা জীবন যাপন করিবেন, ভারতবর্ষেই তাঁহারা মরিবেন। ধর্মের পরিবর্তন তো আর এই মূল সত্যটির রূপ বদলাইতে পারে না।"

গান্ধীজী চলিয়া আসিলেন কলিকাতায়। সারা দুনিয়া উন্মুখ হইয়া উঠিল—গান্ধীজী এই পাশবিকতার প্রতিরোধ কিভাবে করেন, তাহা দেখিবার জন্য। তিনি অহিংসার পূজারী। প্রতিহিংসার কথা তাঁহার কল্পনায় স্থান পাইতে পারে না। তিনি কি রাষ্ট্রশক্তিকে তিরস্কার করিবেন? কিন্তু তাঁহার পথ ভিন্ন, তাঁহার সাধনা অনন্যসাধারণ। তিনি বলিলেন, "নিজের মনোবলই একমাত্র রক্ষাকর্তা, অপর কেহ নয়। সাহসীকে কেহ অপমান করিতে পারে না। প্রতিশোধ গ্রহণের কথা কেহ যেন বিন্দুমাত্র মনে স্থান না দেয়। আমাকে যদি কেহ খুন করে, তবে প্রতিরোধ হিসাবে অপর কাহাকেও খুন করিলে লাভ কিছুমাত্র হইবে না। গান্ধী ছাড়া গান্ধীকে কে মারিতে পারে? আত্মাকে কেহ ধ্বংস করিতে পারে না। সুতরাং প্রতিরোধের চিন্তা আমাদের মন হইতে দূর করিতে হইবে।"

"নবীন বয়স হইতেই বিবদমান দলগুলির মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা আমি ব্রত হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিলাম। আইন ব্যবসায়ী হিসাবেও আমি বিবদমান দল দুইটির মিলনের চেষ্টা করিয়াছি। আমি আশাবাদী। দুইটি সম্প্রদায়কে কেন এক করা যাইবে না? আমি এই মিলনের আলোক দেখিতে পাইয়াছি। নোয়াখালিতে যাইয়া স্বচক্ষে সমস্ত কিছু দেখিয়া আমি আমার নিজের শক্তির পরিমাপ করিব। যতদিন না নিঃশেষে এই গৃহযুদ্ধের অবসান হয়, ততদিন আমি বাংলা ত্যাগ করিব না। প্রয়োজন হইলে আমি এখানেই প্রাণত্যাগ করিব। কিন্তু আমি ব্যর্থতাকে মানিয়া লইতে পারি না।"

চৌমুহানিতে হিন্দু ও মুসলমানদের এক সভায় বক্তৃতাপ্রসঙ্গে গান্ধীজী বলেন, "হিন্দুরা যেভাবে পলাইয়া আসিতেছে সেভাবে পলায়ন করা হিন্দু ও মুসলমান উভয়েরই কলঙ্কের কথা। মুসলমানদের পক্ষে লজ্জার কথা, কারণ তাহাদের ভয়েই হিন্দুরা পলায়ন করিয়াছে—একজন মানুষ কেন অপর একজন মানুষের কাছে ত্রাসজনক হইবে? হিন্দুদের পক্ষে লজ্জার কথা যে, তাহারা এই ত্রাসের গ্রাসে পতিত হইয়াছে। ঈশ্বর ছাড়া মানুষের ভয়ের বস্তু আর কিছুই থাকিতে পারে না।"

গান্ধীজী অন্যায়ের জন্য কাহারও দণ্ড বিধান করিতে আসেন নাই। দৈহিক দণ্ড তাঁহার আদর্শের পরিপন্থী। তিনি শুধু মুসলমানদের নিকট জানিতে চাহেন যাহা কিছু ঘটিয়া গিয়াছে, তাহার জন্য তাহারা অনুতপ্ত কি না। তিনি চাহেন যাহারা গৃহত্যাগ করিয়াছে তাহারা ফিরিয়া আসুক। সমস্ত হিন্দুও যদি গৃহত্যাগ করিয়া যায় তথাপি তিনি অম্লান চিত্তে হিন্দু-মুসলমান মিলনের কথা বলিয়া যাইবেন। মুসলমানদের নিকট তিনি ইহার সুস্পষ্ট উত্তর চাহেন।

নোয়াখালির বিভিন্ন গ্রামে এবং শেষে শ্রীরামপুর গ্রামে গান্ধীজীর দুই মাস কাটিল। কিন্তু তাঁহার সাধনা যেন অভীষ্ট ফলদান করিতেছিল না। ঘন অন্ধকারের মধ্যে তিনি আলো দেখিবার জন্য ক্রমশঃই ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। মরিয়া হইয়া তিনি পথের সন্ধান করিতে লাগিলেন। অবশেষে তিনি পদব্রজে পল্লী পরিক্রমায় বাহির হইলেন। সুতীব্র শীত, দুর্গম পল্লী, নারিকেল-সুপারি-পরিবৃত গ্রামের পথ, বিপদসঙ্কুল গ্রাম্যসেতু এবং বন্ধুর প্রান্তর গান্ধীজীর যাত্রা-পথের সম্মুখে প্রসারিত। শঙ্করাচার্যের ন্যায় গান্ধীজী তাঁহার যাত্রাপথের বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া চলিয়াছেন। দুইটি সম্প্রদায়ের মধ্যে যে প্রাচীর দুর্লঙ্ঘনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে, মানুষে মানুষে স্বাভাবিক সম্পর্ক কলুষিত হইয়া ভারতের

ভাগ্যাকাশ যে ভাবে মসিলিপ্ত হইয়াছে, গান্ধীজীর যাত্রাপথে তাহাই প্রতিবন্ধক এবং সেই প্রতিবন্ধক অপসারণ করিতে গান্ধীজী দৃঢ়সংকল্প। ব্যথাতুর অন্তর নিরাময় করিয়া দুইটি সম্প্রদায়কে তিনি ঐক্যসূত্রে গ্রথিত করিবেন। গান্ধীজী এমন কিছু করিতে চাহেন, যাহার প্রভাব শুধু ভারতে নয় সমগ্র বিশ্বে পরিব্যাপ্ত হইবে। ইহাই তাঁহার জীবনের অগ্নি-পরীক্ষা। গান্ধীজীর যাঁহারা সহকর্মী তাঁহাদিগকেও তিনি এই অগ্নিপরীক্ষার মধ্যে ঠেলিয়া দিতে দ্বিধাবোধ করেন নাই। কর্মীদের তিনি বলিয়াছেন, তাঁহাদের মন হইতে মৃত্যুভয় দূর করিতে হইবে এবং যাহারা বিরোধিতা করিবে তাহাদের চিত্তজয় করিতে হইবে। এই চেষ্টার ফলে হয়তো কয়েকজনকে প্রাণ হারাইতেও হইতে পারে। কিন্তু গান্ধীজীর দৃঢ় বিশ্বাস প্রেমের দ্বারা শত্রুকে জয় করা যাইবেই।

সত্য ও অহিংসার পূজারী

গান্ধীজী সত্য ও অহিংসার পূজারী। মানুষ যদি সত্য ও অহিংসার সত্যকারের পূজারী হয়, কর্মে যদি তাহার নিষ্ঠার অভাব কোন দিন না হয়, তবে তাহার আহ্বান অপরের চিত্তে সাড়া জাগাইবে—ইহাই গান্ধীজীর জীবন-দর্শন, ইহাই তাঁহার সকল কাজে প্রেরণা যোগায়। প্রথমে নোয়াখালির পীড়ন-কারীদের মনে কোন সাড়া জাগাইতে না পারিয়া, গান্ধীজী কিছুটা বিচলিত হইলেন। কিন্তু পরাজয় তিনি কখনই মানেন নাই, তখনও মানিলেন না। তিনি বলিলেন, "সত্য ও অহিংসার যে সার্থকতার কথা আমি এতদিন বলিয়া এবং বিশ্বাস করিয়া আসিতেছি, তাহা যেন আজ ব্যর্থ হইবার উপক্রম হইয়াছে। প্রকৃতই ব্যর্থ হইয়াছে কিনা তাহা পরীক্ষা করার জন্য—অর্থাৎ নিজেকে পরীক্ষা করার জন্য আমি আমার চিরসঙ্গীদের ছাড়িয়া যাইতেছি। দুইটি সম্প্রদায়ের লোকদের পরস্পরের প্রতি ভয়ঙ্কর রকমের অবিশ্বাস জন্মিয়াছে, বহুদিনের সৌহার্দ্য বিনষ্ট হইয়াছে। আমি সত্য ও অহিংসার পূজারী। ৬০ বৎসর কাল ধরিয়া ইহা আমার কর্মে প্রেরণা জোগাইয়াছে, আজ যেন তাহা ব্যর্থ হইতে বসিয়াছে। দুইটি সম্প্রদায়ের মধ্যে যতদিন না বিশ্বাস ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠিত হয়, ততদিন আমি পূর্ববঙ্গ ত্যাগ করিব না।

"এতদিন আমি বহু সঙ্গীর সহিত থাকিয়াছি। আজ আমার মন বলিতেছে সময় আগত। নিজেকে যদি ভাল করিয়া জানিতে চাও তবে অগ্রসর হও, একলা চল। তাই আমি একা চলিয়াছি ভগবানের উপর অবিচল নিষ্ঠা লইয়া।

আমি সমস্ত বাধা উপেক্ষা করিতে এবং নির্যাতিতদের মনে আস্থা জাগাইতে দৃঢ়সংকল্প।"

মানুষের প্রতি গান্ধীজীর বিশ্বাস অবিচল। মানুষ প্রতিশ্রুতি দিয়া সেই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিবে ইহা তিনি কল্পনা করিতে পারেন না। বাংলার শ্রমসচিব সামসুদ্দিন সাহেব চণ্ডীপুরে গান্ধীজীর প্রার্থনা-সভায় প্রতিশ্রুতি দেন যে, শাসনভার যতদিন লীগমন্ত্রিমণ্ডলীর অধীনে আছে ততদিন বাংলায় এইরূপ শোচনীয় ঘটনা আর ঘটিবে না। অত্যাচারিত ব্যক্তিরা এই প্রতিশ্রুতিতে বিশ্বাস করিতে পারে না। কারণ, তাহারা যে আঘাত একবার পাইয়াছে, তাহার জ্বালা সহজে ভুলিতে পারে না। গান্ধীজী এই সন্দেহ দেখিয়া বলেন, সামসুদ্দিন সাহেব তাঁহার কথার খেলাপ করিবেন বলিয়া তিনি বিশ্বাস করিতে পারেন না। তিনি মনেই করিতে পারেন না যে গভর্নমেণ্ট তাঁহাকে প্রতারণা করিবে। তাই তিনি হিন্দুদের স্বগৃহে ফিরিয়া যাইতে বলেন।

ইসলাম কখনই মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করে নাই। ইসলাম যদি মিথ্যার আশ্রয় লইত তবে এতদিনে ইহার অস্তিত্ব মুছিয়া যাইত। খোদার নামে মুসলমানরা প্রতিশ্রুতি দিতেছে যে, তাহারা শান্তি চায়। তাহারা তাহাদের প্রতিশ্রুতির অমর্যাদা করিবে ইহা তিনি বিশ্বাস করিতে পারেন না। তিনি বলেন, তাহাদের কথার অমর্যাদা হইবার পূর্বে আমি বরং মরিব। যতদিন আমি বাঁচিয়া থাকিব, ততদিন আমি ইহা বিশ্বাস করিতে পারিব না।

গান্ধীজী তাঁহার এক বন্ধুর কাছে লিখিয়াছেন,—"আমি নোয়াখালিতে যাহা করিতে চাহিতেছি, তাহাই হয়তো আমার জীবনের শেষ কাজ হইবে। আমি যদি অক্ষত দেহে এখান হইতে ফিরি, তাহা হইলে পুনর্জন্ম লাভ করিয়াছি বলিয়া মনে করিব। আজ আমার অহিংসার চরম পরীক্ষা চলিয়াছে। এমন পরীক্ষা ইহার পূর্বে আর হয় নাই।"

ডাঃ অমিয় চক্রবর্তীর নিকট গান্ধীজী বলেন, "আমি আলোর সন্ধান করিতেছি, আমার চতুর্দিক অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন। কিন্তু সত্যের নির্দেশ অনুযায়ী আমি কাজে প্রবৃত্ত বা নিবৃত্ত থাকিব। আমি দেখিতেছি এ মর্মান্তিক পরিবেশের মধ্যে যে ধৈর্য ও কুশলতা প্রয়োজন, তাহা আমার নাই। নির্যাতন এবং দুর্ভোগ প্রায়ই আমাকে অভিভূত করিয়া ফেলে—চিত্ত সংশয়াকুল হইয়া ওঠে। তবু এই তমসা একদিন কাটিবে। আমি যদি আলো দেখিতে পাই, যাহারা দুর্ভোগ ভুগিয়াছে তাহারাও সেই আলো দেখিতে পাইবে। এখন আমি বাঙালী এবং

নোয়াখালির অধিবাসী। আমি এখানে আসিয়াছি তাহাদের কাজের অংশীদার হইতে এবং দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপন করিতে। প্রয়োজন হইলে এই কাজেই আমি জীবন বিসর্জন দিব।”

নেতাজী স্থভাষচন্দ্র বসুর ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীঅরবিন্দ বসুকে গান্ধীজী কথায় কথায় বলেন, “আমার মুখের দিকে তাকাও, আমার চোখের দিকে তাকাও, আমি আমার উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কৃতসংকল্প। হয় আমি আমার লক্ষ্যে পৌছাইব অথবা এখানেই দেহরক্ষা করিব। বাহিরের সকলকে আমি বলিয়াছি নোয়াখালির মাতা ও ভগ্নীদের দুঃখ-দুর্দশার কথাই শুধু আমার মনে পড়িতেছে, তাহাদের দুঃখের ভাগ লইবার জন্যই আমি এখানে আসিয়াছি।”

নোয়াখালির নির্যাতনের প্রতিশোধ বিহারবাসীরা গ্রহণ করিল বড় নির্মম ভাবে। বিহারে কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা, কংগ্রেস সেখানে যথেষ্ট প্রবল তথাপি বিহার যে পাশবিকতার পরিচয় দিয়াছে, তাহার জন্য লজ্জা গান্ধীজী কোনদিন ঢাকিয়া রাখেন নাই। নোয়াখালির হিন্দুদের যেমন তিনি মুসলমানদের সমস্ত অত্যাচার ভুলিতে বলিয়াছেন, তেমনি হিন্দুদের অত্যাচারও তিনি মুসলমানদের ভুলিয়া যাইতে বলিয়াছেন। গান্ধীজী বলেন, “শত্রুকে বন্ধু করাই আমার কাজ।”

তাঁহার চলার পথে তিনি সামান্য ঘটনার মধ্য দিয়া অনেক সময় হাসিতে হাসিতে এই আদর্শ প্রচার করিয়াছেন। নবগ্রামে তিনি একজন মুসলমান ভদ্রলোকের গৃহে আমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গেলে তাঁহাকে গৃহস্বামী কতকগুলি কমলালেবু দেন। কমলালেবুগুলি তিনি বালক-বালিকাদের মধ্যে বিতরণ করিয়া দেন। গান্ধীজীর আমন্ত্রণকারী হবিবুল্লা মাষ্টারও কয়েকটি কমলালেবু বালক-বালিকাদের মধ্যে বিতরণ করিতেছিলেন। গান্ধীজী হাসিতে হাসিতে তাঁহাকে বলেন, “যদুবংশজীর হাতেও একটি লেবু দিন। (শ্রীযদুবংশ সহায় বিহার সরকারের দূত হিসাবে গান্ধীজীর সহিত ছিলেন)। ইনি বিহারের লোক, এই অবসরে তাঁহাকে বন্ধু করিয়া লউন।” হবিবুল্লা মাষ্টার যদুবংশজীর হাতে একটি লেবু দেন। গান্ধীজী আবার হাসিতে হাসিতে বলেন, “শত্রুকে বন্ধু করাই আমার কাজ।”

বীরের অহিংসা

গান্ধীজী বলেন, তাঁহার অহিংসা নীতি ব্যর্থ হয় নাই। অহিংসা বীরের ধর্ম, কাপুরুষের নয়। "বীরের অহিংসা যে ব্যক্তি অর্জন করিতে চায়, তাহাকে সর্বপ্রকার ভীরুতা বর্জন করিতে হইবে। অহিংসার পূজারী প্রচণ্ডতম শক্তির নিকটও মস্তক অবনত করিবে না, সর্বস্ব ত্যাগ করার জন্য তাহাকে প্রস্তুত থাকিতে হইবে ; দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়—কেহ আমার পুত্রকে আক্রমণ করিল এবং তখন আমি আক্রমণকারীকে যুক্তির দ্বারা নিবৃত্ত করার চেষ্টা করিলাম। সে তখন হয়তো আমার পুত্রকে ছাড়িয়া আমাকে আক্রমণ করিল। তখন যদি আমি কোন বিদ্বেষ ভাব পোষণ না করিয়াও তাঁহার প্রহার প্রসন্ন চিত্তে ক্ষমা করিতে সক্ষম হই, তবেই আমি সাহসীর অহিংসা প্রদর্শন করিব। ইহার দ্বারা ঘোর বিরুদ্ধবাদীরাও আমার বীরত্ব স্বীকার করিবে।

"লোকে যদি বীরোচিত অহিংসা অবলম্বন করিতে অসমর্থ হয়, তবে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে বাহুবলের আশ্রয় লওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে। আমি একথা জানি যে, আমার দেশবাসী নিরস্ত্র এবং অস্ত্র ব্যবহার করার সুযোগ হইতেও তাহারা বঞ্চিত ; কিন্তু আত্মরক্ষার জন্য অস্ত্র ব্যবহারের শিক্ষাই একান্ত প্রয়োজন নয়। আত্মরক্ষার জন্য প্রয়োজন বাহুতে শক্তি, কিন্তু তাহা অপেক্ষাও অধিক প্রয়োজন আত্মিক শক্তি। কাপুরুষতা হিংসার চেয়েও খারাপ।"

একমাত্র পথ

গত ৭ই নভেম্বর সকাল বেলা 'কিউই' জাহাজে খাইবার কামরায় কুড়ি পঁচিশ জন কর্মী গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাৎ করেন। গান্ধীজী তাহাদিগকে বলেন—"আপনাদের বিপদ আপনারা সংখ্যায় কম বলিয়া নয়। আপনাদের আসল বিপদ হইতেছে আপনারা নিজেদের অসহায় মনে করিয়া অপরের উপর নির্ভর করিতে অভ্যস্ত হইয়াছেন। এই জন্যই আমি হিন্দুদের সমগ্রভাবে বাংলা ত্যাগ করিয়া যাইবার বিরোধী। দুর্বলতা বা অসহায়তার প্রতিকার ইহা নয়। ২০ হাজার সবল সাহসী লোক অহিংসভাবে মরিতে প্রস্তুত—একথা আজ রূপকথার মত শোনাইতে পারে। কিন্তু ২০ হাজারের মধ্যে সবল ও সাহসী লোকের শেষ মানুষটি পর্যন্ত সম্মুখযুদ্ধে মৃত্যুবরণ করিবে ইহা তো রূপকথা নয়। থার্মোপলির যুদ্ধে লিওনিডাসের পাঁচ শত অমর বীরের

মত তাঁহাদের নামও ইতিহাসে অমর হইয়া থাকিবে। থার্মোপলির বীরদের সমাধিস্তম্ভে লেখা আছে, 'হে বিদেশী, স্পার্টায় যাইয়া বলিও তাঁহার সন্তানেরা এখানে শায়িত আছে, ইহাই ছিল স্পার্টার রীতি। সেই রীতি সন্তানেরা শিরোধার্য করিয়াছে।'

"পূর্ববঙ্গে যদি একজন হিন্দু থাকে, তাহা হইলে তাহাকেও আমি বলিব —সাহস অবলম্বন কর এবং মুসলমানদের মধ্যে যাইয়া বাস কর। যদি মরিতে হয় তো বীরের মত মর। বিনা যুদ্ধে মরিবার মত অহিংস শক্তি যদি তোমার না থাকে, তথাপি অত্যাচারের বল মানিবে না। যুদ্ধ করিয়া মানুষের মত মরার সাহস যদি তোমার থাকে, তবে বিস্ময়ে তাহারা তোমার স্তুতি করিবে। গুণ্ডারা যুক্তি মানে না, কিন্তু সাহস মানে। সে যদি বুঝিতে পারে যে, তুমি তাহার চেয়ে সাহসী, তবে সে তোমাকে সম্মান করিবে।

"অপমান ও নির্যাতন ছাড়া যদি আর কোন গতি না থাকে, তবে পুরুষ ও নারী সকলের অন্তরে মৃত্যু বরণ করার মত সাহস ও নির্ভীকতা সঞ্চার করুন। তবেই হিন্দুরা পূর্ববঙ্গে থাকিতে পারিবে, নচেৎ নয়।"

হিন্দু ও মুসলমান

গান্ধীজী শিশুকাল হইতে অন্যায়কে ঘৃণা করিতে শিখিয়াছেন কিন্তু অন্যায়কারীকে কোনদিনই ঘৃণা করেন নাই। মুসলমানরা যদি কোন অন্যায় করিয়াও থাকেন, তবু তাঁহারা বন্ধু থাকিবেন। প্রতিশোধ গ্রহণ মানবধর্ম নয়। গান্ধীজী বলেন, "হিন্দুশাস্ত্র আমাদিগকে বলিতেছে যে, ক্ষমাই মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ গুণ, উহাই মানুষকে সাহসী করিয়া তুলিতে পারে। কোরাণও অনুরূপ শিক্ষাই দেয়। ইসলাম কদাপি হত্যা, অগ্নিসংযোগ, নারীহরণ বা ধর্মান্তর গ্রহণে বাধ্য করে নাই, ইহার নিন্দাই করিয়াছে।

"কেহ আমাকে চপেটাঘাত করিলে, তাহাকে ক্ষমা করার মত উদারতা যদি আমার না থাকে, তবে তাহাকে পাল্টা চপেটাঘাত করার একটা অর্থ হয়। কিন্তু আক্রমণকারী যদি পলাইয়া যায় এবং আমি যদি তাহার বন্ধুকে ধরিয়া মারি, তবে তাহা আমার পক্ষে অতিশয় নীচতার কাজ। রক্তের বদলে রক্ত চাওয়া বর্বরতা। কাহারও কাহারও ধারণা মহাভারতে প্রতিশোধ গ্রহণের বিধান আছে। কিন্তু মহাভারতের প্রকৃত শিক্ষা হইল, বাহুবলের দ্বারা লব্ধ জয় প্রকৃত জয় নয়। পাণ্ডবদের জয় অসারবস্তু মাত্র।"

নোয়াখালি যাত্রার পথে গান্ধীজী বলেন, "যদি আমরা প্রতিশোধ লইবার প্রবৃত্তিকে জিয়াইয়া রাখি এবং অবিরত কলহ করিয়া চলি, তাহা হইলে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই পরিণামে বিনষ্ট হইবে। এক হাজার মুসলমানের মধ্যে যেখানে একশত হিন্দুর বাস, সেখানে যদি মুসলমানরা হিন্দুদের আক্রমণ করিয়া তাহাদিগকে হত্যা করে, নারীদের ধর্মান্তরিত করে, তাহা হইলে তাহারা নিজেরাই নিজেদের ধর্মের বুকে ছুরি মারিবে এবং নিজেরা পশুর অধম হইবে। বাংলার হিন্দু ও মুসলমান যতদিন না আমাকে বলিতে পারিতেছে যে বাংলায় আমার আর প্রয়োজন নাই, ততদিন আমি বাংলা ত্যাগ করিতেছি না।"

কেহ কাপুরুষ হউক গান্ধীজী তাহা চাহেন না। সকল হিন্দুই যদি খারাপ হয়, তবে হিন্দু ধর্মটাই খারাপ, আর সকল মুসলমান যদি খারাপ হয়, তবে মুসলমান ধর্মটাই খারাপ। কিন্তু হিন্দু ধর্মও খারাপ নয়, ইসলাম ধর্মও খারাপ নয়। যীশুখ্রীষ্ট বলিয়াছিলেন যে, একমাত্র তিনিই তাঁহার শিষ্য, কারণ তিনিই কেবল তাঁহার মত কাজ করিবেন। যাহারা শুধু তাঁহাকে "প্রভু" "প্রভু" বলে তাঁহারা তাঁহার শিষ্য নয়। সকল ধর্মের ব্যাপারেই এই কথা খাটে। বলপ্রয়োগের দ্বারা কলমা উচ্চারণ করাইলেই মুসলমান হয় না, ইহা শুধু ইসলামের লজ্জার কারণ হয়।

মসিমপুরে প্রার্থনাসভায় যখন রামধুন হইতেছিল তখন কয়েকজন মুসলমান প্রার্থনাসভা হইতে উঠিয়া চলিয়া যান,—কারণ রামনামে তাঁহাদের আপত্তি ছিল; গান্ধীজী বলেন, গত অক্টোবর মাসে, নোয়াখালিতে যাহা কিছু ঘটিয়াছে তাহার মূলে রহিয়াছে পরধর্মে এই অসহিষ্ণুতা। পাকিস্থানে সকলেই স্ব স্ব ধর্মের অনুসরণ করিতে পারিবে বলিয়া তিনি শুনিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ব্যাপার সম্পূর্ণ অন্যরকম। মুসলমানরা ভাবেন ভগবানকে একমাত্র খোদা নামেই অভিহিত করা যাইতে পারে, কিন্তু যিনি 'রাম' তিনিই 'খোদা'। প্রকৃতপক্ষে সকল ধর্মই সমান, বিভিন্ন ধর্ম একই বৃক্ষের বিভিন্ন পত্র। হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান প্রভৃতিতে কোন বিরোধের কারণ থাকিতে পারে না। পরিশেষে গান্ধীজী বলেন, "নোয়াখালিতে আমি এক সম্প্রদায়কে বড় করিয়া অপর সম্প্রদায়কে ছোট করিতে আসি নাই। আমি হিন্দু ও মুসলমান উভয়েরই সেবা করিতে আসিয়াছি। আমি যদি এখানে মরি, তবে আমি যেন একথা বলিয়া মরিতে পারি যে, আমি হিন্দু ও মুসলমান উভয়ের সেবা করার জন্য এখানে আসিয়াছিলাম।"

জগৎপুরে প্রার্থনা-সভায় গান্ধীজী বলেন, "হিন্দু এবং মুসলমান যদি পরস্পরের ধর্মের মর্যাদা রক্ষা করিয়া চলিতে সম্মত হয়, আন্তরিক মৈত্রী প্রতিষ্ঠা সম্ভব। ধর্মান্তর গ্রহণ সম্পূর্ণরূপে ব্যক্তিগত বিশ্বাস ও ব্যক্তিগত ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। বলপ্রয়োগের দ্বারা ধর্মান্তর গ্রহণ করান হইলে, তাহা প্রকৃত ধর্মান্তর নয়। প্রকৃত ধর্মান্তর গ্রহণের জন্য অনেক বেশী আত্মিক শক্তি প্রয়োজন। তথাকথিত খ্রীষ্টান ধর্মপ্রচারকরা দুর্ভিক্ষপীড়িত অঞ্চল হইতে অনাথ শিশুদের আনিয়া তাহাদিগকে খ্রীষ্টান হিসাবে লালন পালন করিতেন। ইহা কোন মতেই প্রকৃত খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ নয়। জোর করিয়া ইসলামে প্রকৃত দীক্ষা দেওয়া যায় না। সত্যকারের দীক্ষালাভের জন্য দীক্ষার্থীর পক্ষে নিজ ধর্মের এবং নূতন ধর্মের সম্যক জ্ঞান থাকা প্রয়োজন।"

"আমি নিজে হিন্দু—শুধু এই কারণেই আমি আমার অহিন্দু বন্ধুদের হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করিতে বলি না। আমি নিজেকে খ্রীষ্টান, মুসলমান, ইহুদী, শিখ, জৈন, পার্শী প্রভৃতি সম্প্রদায়ের লোক বলিয়া মনে করি। কারণ সকল ধর্মের ভাল জিনিসগুলি আমি গ্রহণের চেষ্টা করিয়াছি। এইভাবে বিরোধের অবসান করিয়া আমি নিজের ধর্মজ্ঞান বৃদ্ধি করি।"

গান্ধীজী বিশ্বাস করেন, প্রকৃত শিক্ষার অভাবই হিন্দু ও মুসলমানদের অনৈক্যের মূল কারণ। নোয়াখালিতে যে লুটতরাজ, গৃহদাহ, এবং হত্যাকাণ্ড হইয়াছে, একমাত্র শিক্ষার দ্বারাই সেই সকল পাপের অবসান করা যাইতে পারে। স্ত্রীলোকেরা শিক্ষালাভ হইতে বঞ্চিত রহিয়াছেন। তাঁহাদের শিক্ষার প্রয়োজনীয়তাই সর্বাধিক। তাঁহারা পর্দা মানেন কিন্তু প্রকৃত পর্দা দেহের জন্য নয়, মনের জন্য।

গান্ধীজী বলেন, "হিন্দুধর্মকে বাঁচিয়া থাকিতে হইলে জাতিভেদ প্রথা লোপ করিতে হইবে। তিনি কৃত্রিম শ্রেণীবিভাগে বিশ্বাস করেন না। বর্ণহিন্দু বলিতে যদি শুধু ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যকে বুঝায়, তবে তাহারা অন্যান্য জাতির তুলনায় অতিশয় সংখ্যালঘিষ্ঠ। ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হইলে পর এই সংখ্যালঘিষ্ঠ উচ্চশ্রেণীর দল একেবারে মুছিয়া যাইবে।"

মানুষের আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা

শ্রীরামপুরে এক প্রার্থনাসভায় গান্ধীজী বলেন, "মানুষের আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা সর্বকালে সর্বদেশে প্রায় অভিন্ন। যে প্রভেদ আমাদের চোখে পড়ে

তাহা শুধু স্থান ও কালের বিভিন্নতার জন্য। প্রকৃতপক্ষে পৃথিবীতে মানুষ যত ধর্মও তত। কোন দুইজন লোকের প্রয়োজনই একরকম হয় না। ইহা সত্ত্বেও প্রত্যেক ধর্মের সঙ্গে অপর ধর্মের যে সৌসাদৃশ্য আছে তাহা লক্ষ্য না করিয়া পারা যায় না। বৃক্ষের কাণ্ড থাকে একটিই। কিন্তু শাখা-প্রশাখা-পত্র ইহার অনেক। দুইটি গাছ কখনই ষোল আনা একরকম হয় না। ধর্মের ক্ষেত্রেও এই রকমই খাটে। প্রত্যেক ধর্মেরই দোষত্রুটি আছে। ইসলাম ধর্ম বহু স্মরণীয় লোক সৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু ইসলাম ধর্মে অলক্ষ্যে দোষও অনেক জুটিয়াছে। এগুলি ইসলামের শিক্ষার বিরুদ্ধে।

"খ্রীষ্টানদের সম্পর্কেও একথা বলা চলে। যীশুখ্রীষ্ট শত্রুকে ভালবাসিতে শিখাইয়াছিলেন। কিন্তু খ্রীষ্টানরা আমাদের জীবনে পৃথিবীতে দুইটি মহাযুদ্ধ ঘটাইয়াছে। বর্তমানে যে হিংসা, ঘৃণা এবং পরস্পরের প্রতি সন্দেহে পৃথিবী ভারাক্রান্ত, তাহা এই যুদ্ধের ফলেই সৃষ্ট।

"হিন্দুদের মধ্যেও ধর্মের নানা অন্যায় ও পাপ প্রবেশ করিয়াছে। আমাদের তথাকথিত অস্পৃশ্য ভ্রাতাদিগকে এমন অবস্থায় পরিণত করিয়া রাখা হইয়াছে যে, উহা মানুষের মর্যাদার সম্পূর্ণ বিরোধী।"

যীশুখ্রীষ্টের জন্মদিনে গান্ধীজী বলেন, আগে তিনি শুধু পরধর্মসহিষ্ণুতায় বিশ্বাস করিতেন। এখন এই সহিষ্ণুতা এতটা বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, তিনি এখন সকল ধর্মকেই সমান বলিয়া ভাবিতে পারেন। অনেকে যীশুখ্রীষ্টকে শুধু খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের বলিয়া মনে করে কিন্তু যীশু কোন সম্প্রদায় বিশেষের নয়। খ্রীষ্টের বাণীতে পৃথিবীর সকল জাতিরই সমান অধিকার।

আত্মকলহের পরিণাম—ভারতে বহুর প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা

শ্রীরামপুরে প্রার্থনাসভায় গান্ধীজী বলেন, "ব্রিটিশ রাজশক্তির ভারত ত্যাগের পরও যদিও ভারতীয়রা মূঢ়ের মত আত্মকলহে মত্ত থাকে, তাহা হইলে ভারতের শাসনকার্য পরিচালনার দায়িত্ব বিশ্বসভার উপর যাইয়া বর্তাইতে পারে, সেক্ষেত্রে ভারতের স্বাধীনতা স্বপ্নের বস্তুতে পরিণত হইবে এবং তাহাতে বহু প্রভুর মনোরঞ্জন করিতে হইবে। ব্রিটিশকে যে ভারত ত্যাগ করিতে হইবে, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহও নাই। কিন্তু ভারতীয়রা যদি হানাহানি ত্যাগ না করে, তবে ভারতকে স্বাধীনতা লাভের আশা বিসর্জন দিতে হইবে।"

এক ব্যক্তির প্রশ্নের উত্তরে গান্ধীজী বলেন, "বিহারের লোকেরা নিজেদের

ও ভারতবর্ষের লজ্জার কারণ হইয়াছে। ভারতের দাসত্ব শৃঙ্খলকে বিহার আরও মজবুত করিয়া দিয়াছে। বিহারের পুনরাবৃত্তি যদি সমগ্র ভারতে হইতে থাকে, তবে অচিরে ভারত প্রধান ত্রিশক্তির অধীন হইয়া পড়িবে—তাহাদেরই কেহ সম্ভবতঃ এখানে হুকুম চালাইবার অধিকারী হইবে। ভারতের স্বাধীনতা আজ বাংলা ও বিহারে বিপন্ন হইয়াছে।”

অখণ্ড ও খণ্ডিত ভারত

সোদপুরে প্রার্থনা-সভায় গান্ধীজী বলেন, “ভারতবর্ষ অখণ্ড থাকিবে, না বিভক্ত হইবে, শক্তি পরীক্ষার দ্বারা তাহার মীমাংসা হইবে না। পারস্পরিক বোঝাপড়ার দ্বারাই এই প্রশ্নের মীমাংসা করিতে হইবে। কাহারও আত্মসম্মানে আঘাত লাগে অথবা কাহারও মর্যাদাহানি হইতে পারে এমন কোন ব্যবস্থার সহিত তিনি সংশ্লিষ্ট থাকিতে পারেন না। প্রকৃত শান্তি স্থাপন করিতে হইলে, তাহা সম্মানজনক ভাবেই হইবে, আত্মসম্মানের বিনিময়ে তাহা করা চলিবে না।”

দত্তপাড়ায় গান্ধীজী বলেন যে, তিনি হিন্দু-মুসলমানের সেবক হিসাবেই নোয়াখালি আসিয়াছেন। পাকিস্থানের বিরোধিতা করার জন্য তিনি আসেন নাই। ভারত ব্যবচ্ছেদ যদি বিধিলিপিই হয় তবে তিনি তাহা বন্ধ করিতে পারিবেন না। কিন্তু পাকিস্থান যে বলপ্রয়োগের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না একথাটাই তিনি সকলকে বলিতে চাহেন। হিন্দু ও মুসলমান এক জাতি রূপেই বাস করুক, আর দুই জাতি রূপেই বাস করুক, তাহাদিগকে প্রতিবেশী রূপেই বাস করিতে হইবে। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায় যদি সম্প্রীতি বজায় রাখিয়া একসঙ্গে বাস না করিতে পারে, তবে তাহারা হিন্দুস্থান বা পাকিস্থান কোনটিই পাইবে না।

একজন মুসলমান ভদ্রলোক গান্ধীজীকে জিজ্ঞাসা করেন—পাকিস্থান ও গৃহযুদ্ধ এই দুইটির মধ্যে একটা বাছিয়া লইতে হইলে কোনটি তিনি বাছিয়া লইবেন। গান্ধীজী উত্তরে বলেন, বিষয়টি তিনি অন্য দৃষ্টিতে বিচার করেন। ভারতের পক্ষে দুইটির কোনটিই মঙ্গলকর হইবে না, গৃহযুদ্ধের দ্বারা পাকিস্থান অর্জন করা যাইতে পারে, এ অত্যন্ত ভ্রান্ত ধারণা।

ভাটীয়ালপুরে একদল মুসলমান যুবকের সহিত কথাপ্রসঙ্গে গান্ধীজী বলেন, “পৃথক মুসলিম রাষ্ট্র বা পাকিস্থানের অর্থ যদি এই হয় যে, সমগ্র ভারতের স্বার্থের বিরুদ্ধে সেই রাষ্ট্র বিদেশী শক্তির সহিত সন্ধি করিতে পারিবে, তাহা

হইলে সেই পাকিস্থানের সম্বন্ধে কোন আপোষ-মীমাংসা হইতে পারে না। তাছাড়া দেশ স্বাধীন হইলে তখনই শুধু পাকিস্থানের কথা উঠিতে পারে। এখনই পাকিস্থানের প্রশ্ন লইয়া মতানৈক্যের সৃষ্টি হইলে তাহার ফলে শুধু বিদেশীর সুবিধা হইবে।

"চরিত্রবলে পাকিস্থান অর্জিত হইলে তাহা সকলে সাদরে গ্রহণ করিবে। কিন্তু লুণ্ঠন, অগ্নিকাণ্ড, বলপূর্বক ধর্মান্তরকরণ যেখানেই ঘটুক না কেন, মানুষের জাগ্রত বিবেক উহা কখনই সমর্থন করিবে না।"

কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ

ভারতের জাতীয় মহাসভা আজিকার বিরাট রূপ পাইয়াছে। গান্ধীজীর নেতৃত্বে ইহা আজ গৌরবোজ্জ্বল পরিণতি লাভ করিয়াছে। কিন্তু এই কংগ্রেসেরই কর্ণধারগণ যখনই কোন অন্যায় করিয়াছেন বা অনবধানতার পরিচয় দিয়াছেন, তিনি তখন তাঁহাদের সমালোচনা করিতে কুণ্ঠাবোধ করেন নাই। কংগ্রেস সর্বজাতির প্রতিষ্ঠান, তাই সকলকে রক্ষা করা কংগ্রেসের পবিত্র দায়িত্ব। যে সকল প্রদেশের শাসনব্যবস্থা কংগ্রেসের কর্তৃত্বাধীনে, সেই সকল প্রদেশের অধিবাসীদের ধনপ্রাণ রক্ষার ব্যাপারে কংগ্রেসকে যথেষ্ট সচেতন থাকিতে হইবে। যে সকল প্রদেশের শাসনব্যবস্থা মুসলিম লীগের কর্তৃত্বাধীনে তাহাদের সম্পর্কেও এই কথাই প্রযোজ্য। বিহারের হত্যাকাণ্ডের কথা শুনিয়া গান্ধীজী বলেন, "সেখানকার অবস্থা গুরুতর, ইহা আমার পক্ষে অসহনীয়। বিহারের সহিত সংশ্রব বহু দিনের। এই সংক্রামক ব্যাধি যাহাতে অন্য প্রদেশে ছড়াইয়া না পড়ে, ভগবানের কাছে আমি এই কামনাই করি। কংগ্রেস জনগণের প্রতিষ্ঠান, মুসলিম লীগ আমাদের ভ্রাতা ও ভগ্নীদের প্রতিষ্ঠান। কংগ্রেস যেখানে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত রহিয়াছে, সেখানকার কংগ্রেসকর্মীরা যদি মুসলমানদের রক্ষা করিতে না পারেন, তবে কংগ্রেসের মন্ত্রিত্বের প্রয়োজন কি? তেমনি লীগ মন্ত্রিমণ্ডলী যদি হিন্দুকে রক্ষা না করিতে পারেন, তবে তাঁহাদের থাকিয়া লাভ কি? নিজ নিজ প্রদেশে হিন্দু বা মুসলমান সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে রক্ষার জন্য যদি তাহাদিগকে সৈন্যদলের সাহায্য লইতে হয়, তবে তাহা দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হয় যে, বড় রকমের সংকট দেখা দিলে জনগণের উপর তাঁহাদের কোন প্রভাবই থাকে না।"

গান্ধীজী তাঁহার গভীর মর্মবেদনা কিছুতেই চাপিয়া রাখিতে পারিতেছিলেন

না। গত ৬০ বৎসর সংগ্রাম করিয়া কংগ্রেস যাহা অর্জন করিয়াছে আজ তাহা ব্যর্থ হইয়া যাইতে বসিয়াছে। বিহারবাসীদের উদ্দেশ্যে তিনি এক পত্রে বলিলেন, "কংগ্রেসের মর্যাদা বৃদ্ধি করিতে বিহার অনেক কিছু করিয়াছে। এখন সেই কংগ্রেসকে ধ্বংস করিতেও বিহার যেন অগ্রণী না হয়। আপনারা যদি আঘাতের বদলে আঘাত হানিতেন, তবে কেহ আপনাদিগকে কিছু বলিতে সাহসী হইত না। কিন্তু আপনারা যাহা করিয়াছেন তাহাতে বিহার সমগ্র ভারত এবং বিশ্বের চক্ষে হেয় হইয়াছে। আপনারা যদি অবিলম্বে দাঙ্গা বন্ধ না করেন, তবে আমি আমৃত্যু অনশন করিব।"

গান্ধীজী নোয়াখালির বিভিন্নস্থানে একাধিকবার বলিয়াছেন যে, তিনি কংগ্রেসকর্মী হিসাবে এখানে আসেন নাই। তিনি আসিয়াছেন হিন্দু ও মুসলমানের সেবকরূপে; তথাপি কংগ্রেসের বিরুদ্ধে মুসলমানদের যে ভ্রান্ত ধারণা রহিয়াছে, গান্ধীজী সুযোগ পাইলেই তাহা দূর করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। শ্রীরামপুরে একটি প্রার্থনা-সভায় তিনি বলেন, কংগ্রেস হিন্দুর সংগঠন নয়—অন্যান্য সম্প্রদায়কে বাদ দিয়া হিন্দুর স্বার্থরক্ষা করা ইহার কাজ নয়। এমন একদিন ছিল যখন কংগ্রেসের লোকদের দ্বারাই—যেমন লালা লাজপত রায়—হিন্দু মহাসভা পরিচালিত হইত। তখন হিন্দু মহাসভার কাজ ছিল হিন্দু সমাজের সংস্কার সাধন করা। কংগ্রেস কোনদিন হিন্দু মহাসভার উপর রাজনৈতিক গুরুত্ব আরোপ করে নাই। মুসলিম লীগের ক্ষেত্রেও একথা বলা যাইতে পারে।

কংগ্রেস প্রমাণ করিতে চায় যে, সে সমগ্র ভারতের সেবা করিতেছে। কোন কোন মুসলমান কংগ্রেসকে তাহাদের শত্রু বলিয়া মনে করে। তথাপি কংগ্রেস প্রমাণ করিবে যে, সে তাহাদের বন্ধু। দেশ আজ স্বাধীনতার পথে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। একটি মাত্র ভুলের জন্যও স্বাধীনতা পিছাইয়া যাইতে পারে।

লোক বিনিময় অবাস্তব প্রস্তাব

শ্রীরামপুরে কয়েকজন সাংবাদিকের সহিত আলোচনাকালে গান্ধীজী বলেন, "লোক বিনিময়ের কথা আমি ভাবিতেই পারি না। আমি মনে করি ইহা সম্পূর্ণ অবাস্তব প্রস্তাব। যিনি যে প্রদেশেই থাকুন না কেন, তিনি হিন্দুই হউন আর মুসলমানই হউন অথবা অপর কোন ধর্মে বিশ্বাসী হউন, তিনি

ভারতবাসী। পাকিস্থান যদি পুরাপুরি ভাবেও প্রতিষ্ঠিত হয়, তথাপি এ সত্য অবিকৃত থাকিবে। এইরূপ কোন ব্যবস্থা ভারতবাসীর বিজ্ঞতা অথবা রাজনৈতিক বুদ্ধি কিংবা উভয়েরই অভাব। এই ব্যবস্থার স্বাভাবিক পরিণতির কল্পনা অতি ভয়াবহ। এরূপ নীতি অবলম্বনের কোন কারণ আমি দেখি না। সর্বতোভাবে সম্পূর্ণ হতাশ হইলেই লোক বিনিময়ের ব্যবস্থা করা চলে। সুতরাং সর্বশেষ পন্থা হিসাবে ইহা কচিৎ কোন ক্ষেত্রে অবলম্বন করিতে হয়।

ভারতীয় নারী অবলা নয়

শ্রীরামপুরে একটি প্রার্থনা-সভায় বক্তৃতাপ্রসঙ্গে গান্ধীজী বলেন, নারী অথবা পুরুষ যে-কেহই হউক না কেন, তাহাকে যদি সাহসী বলিয়া পরিচিত হইতে হয়, তবে তাহার যথেষ্ট মনোবল থাকা প্রয়োজন। তিনি নারী ও পুরুষের মধ্যে কোন পার্থক্য করেন না। নারীরা পুরুষের ন্যায়ই স্বাধীন। সাহসিকতা পুরুষের একচেটিয়া নয়।

একজন মহিলাকে গান্ধীজী বলিতেছিলেন, "আমি চাই আমাদের নারীরা সাহসী হউন। ভীরু নারী বা পুরুষ যে-কোন ধর্মেরই বোঝাস্বরূপ। আজ যাহারা ভয়ে মুসলমান হইয়াছে, কাল তাহারা খ্রীষ্টান এবং তাহার পরদিন অন্য যে-কোন ধর্মগ্রহণ করিবে। পুরুষ কর্মীদের স্ত্রীলোকদিগকে বলা উচিত যে, তাঁহারাই স্ত্রীলোকদের রক্ষী হইবেন। ইহা সত্ত্বেও যদি স্ত্রীলোকেরা আসিতে রাজি না থাকে তবে আর কিছু বলিবার নাই। স্ত্রীলোকদের সাহসী হইতে হইবে। অন্যথায় তাহাদের মরাই ভাল। এই কথা ঘোষণা করার জন্যই আমি আসিয়াছি। যে বিপদ তাহাদের সম্মুখে আসিয়াছে তাহা হইতে যেন তাহারা শিক্ষা লাভ করিতে পারে এবং ভয় ত্যাগ করিতে পারে।"

চণ্ডীপুরে গান্ধীজী বলেন, "ভারতীয় নারী অবলা নয়। বীরত্বের জন্য তাঁহারা খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন। সে বীরত্ব কোন তরবারি বা অস্ত্র ব্যবহারের নয়। সে বীরত্ব নৈতিক সাহস এবং চরিত্রের পবিত্রতার মধ্য দিয়া প্রকাশিত হইয়াছে। নারী আজ নানাভাবে জাতির উন্নতিসাধন করিতে পারেন। নোয়াখালিতে যাহা হইয়াছে তাহার জন্য নোয়াখালির পুরুষরাই দায়ী নয়, নোয়াখালির নারীরাও দায়ী। গান্ধীজী নারীদের সীতা ও দ্রৌপদীর আদর্শ অনুসরণ করিতে বলেন। সীতা ও দ্রৌপদীর ভগবানে অটুট বিশ্বাস ছিল, তাই কোন দুর্বৃত্তই তাঁহাদের অমর্যাদা করিতে পারে নাই।"

দুর্বৃত্তরা নারীদের আক্রমণ করিলে তাহারা কিভাবে আত্মরক্ষা করিবে—নবগ্রামে এই প্রশ্নের উত্তরে গান্ধীজী বলেন, "কাপুরুষতা প্রদর্শন অপেক্ষা হিংসার স্থান লওয়া অনেক ভাল। তাঁহার জীবনে আত্মসমর্পণের কোন স্থান নাই। দুর্বৃত্তদের নিকট আত্মসমর্পণ করার পূর্বে নারীদিগকে আত্মবিসর্জন করিতে হইবে। নারীই হউক, আর পুরুষই হউক, মৃত্যুকে তুচ্ছ করার মত আত্মিক শক্তি তাহাদিগকে সঞ্চয় করিতে হইবে। মানুষের একমাত্র সহায় হইতেছেন ভগবান। আমার কথা আমি কর্মক্ষেত্রে পরীক্ষা করার জন্যই এখানে আসিয়াছি।"

পারকোটে এক মহিলা-সভায় গান্ধীজী বলেন, "হিন্দু নারীদের উচ্চ নীচ এবং বর্ণভেদ ত্যাগ করিতে হইবে। তাঁহাদিগকে মুসলমান ভগ্নীদের সহিত মিলিতে হইবে। উভয় সম্প্রদায়ের মেয়েদের মধ্যে যদি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকিত, তবে নোয়াখালির অনেক শোকাবহ ঘটনাই হয়তো ঘটিত না।"

গান্ধীজীর দৃষ্টিতে বাংলা দেশ

গান্ধীজী তাঁহার এক বন্ধুর কাছে লিখিয়াছেন, "পূর্ববঙ্গের সমস্যা আজ আর বাংলার ঘরোয়া সমস্যা নহে। সমগ্র ভারতের ভবিষ্যৎ যে প্রয়াসের দ্বারা নির্ণীত হইবে, পূর্ববঙ্গেই তাহা চরম পরিণতির পথে অগ্রসর হইতেছে।

"বাংলার নারীদের আমি সম্ভবত বাঙালীদের চেয়ে বেশী জানি। আজ তাঁহারা হতাশ ও অসহায় হইয়া পড়িয়াছেন। আমার সঙ্গীদের ও আমার নিজের জীবন বলি দিলে তাঁহারা অন্ততঃ আত্মসম্মান বজায় রাখিয়া মৃত্যু বরণ করিতে শিখিবেন। হয়তো অত্যাচারীর দৃষ্টিও খুলিয়া যাইবে এবং তাহাদের মন কোমল হইবে। আমি চক্ষু বুজিলেই তাহাদের চক্ষু খুলিবে এমন কথা আমি বলি না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যে তাহাদের চক্ষু খুলিবেই তাহাতে আমার কোন সন্দেহ নাই।"

কয়েকজন বন্ধু গান্ধীজীকে জিজ্ঞাসা করেন, রাজনৈতিক দাবা খেলায় বাংলাকে পণ হিসাবে ব্যবহার করা হইতেছে কিনা। গান্ধীজী বলেন, "একথা ঠিক নয়। বাংলা, বাংলা বলিয়াই আজ পুরোভাগে দাঁড়াইয়াছে; বাংলা দেশেই বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ জন্মগ্রহন করিয়াছেন। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের বীরগণ বাংলাতেই জন্মিয়াছেন—যদিও তাঁহারা আমার চোখে ভ্রান্ত। একথা আপনাদিগকে আজ বুঝিতেই হইবে। বাংলা যদি আজ তাহার খেলা ঠিকমত

খেলিতে পারে, তাহা হইলে বাংলাই ভারতের সকল সমস্যার সমাধান করিবে। এই জন্য আমি আজ বাঙালী হইয়াছি। যে বাংলায় এমন মানুষ জন্মিয়াছে, সেখানে কাপুরুষতা থাকিবে কেন?"

প্রকৃত পাকিস্থান কি তাহা দেখাইবার জন্যই গান্ধীজী নোয়াখালি আসিয়াছেন বলিয়া সাধুরখিলে প্রার্থনা-সভায় উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, বাংলা দেশে প্রতিভাবান হিন্দু ও মুসলমান জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। জাতীয় সংগ্রামে বাংলা দেশের দান অপরিমেয়, হিন্দু ও মুসলমানের একত্রে বসবাসের দৃষ্টান্ত বাংলা দেশকেই দেখাইতে হইবে। ইহা দ্বারা বাংলা দেশ আবার শীর্ষস্থান অধিকার করিবে।

শ্রম যার ফসল তার

তে-ভাগা আন্দোলন সম্পর্কে তাঁহার মতামত জানিতে চাহিলে গান্ধীজী তাহা সমর্থন করিয়া বলেন, যাহারা ভূমি কর্ষণ করিবে, উৎপন্ন ফসলের মালিক তাহারাই। ভূমির অধিকারী বলিয়া কেহ নাই। একমাত্র অধিকারী ঈশ্বর; কাজেই শ্রমের দ্বারা যে ভূমি কর্ষণ করিবে, সে-ই হইবে ভূমির স্বত্বাধিকারী। তবে এ ব্যাপারে তিনি কোন জবরদস্তি বা উপদ্রবমূলক নীতি সমর্থন করিবেন না। তাঁহার মতে উদ্দেশ্য যেখানে মহৎ উদ্দেশ্য লাভের পন্থাও সেখানে মহৎ হওয়া প্রয়োজন। মহৎ উদ্দেশ্য লাভের জন্য যে-কোন পন্থা অনুসরণ করা যাইতে পারে—এই নীতি তিনি সমর্থন করেন না।

জমির মালিক পূর্বে উৎপন্ন শস্যের অর্ধাংশ পাইত, কিন্তু এক্ষণে দাবী করা হইতেছে মালিক পাইবে এক-তৃতীয়াংশ এবং অবশিষ্ট সমস্ত শস্যের মালিক হইবে বর্গাদারগণ। এক শ্রেণীর লোক এইরূপ আশঙ্কা প্রকাশ করিতেছিলেন যে, ইহার দ্বারা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিশেষ ক্ষতি হইবে। গান্ধীজী বলেন, তিনি এইরূপ ক্ষতির কোন সম্ভাবনা দেখেন না। মনে রাখিতে হইবে, বহু বৎসর ভারত অপহরণ সহ্য করিয়াছে। এক-একটি করিয়া পল্লীশিল্পগুলি ধ্বংস হইয়াছে এবং ভারতের চাষী ও কারিগরদের দারিদ্র্যের মুখে ঠেলিয়া দেওয়া হইয়াছে। আজ সকলকেই জমির উন্নতি সাধনে ব্রতী হইতে হইবে। ভবিষ্যতে সমস্ত জমির মালিক হইবে রাষ্ট্র।

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে আনীত বর্গাদার বিল সম্পর্কে গান্ধীজী বলেন, জমির মালিকদের প্রাপ্য অর্ধাংশের স্থলে এক-তৃতীয়াংশ হইলে উহা সকলেরই সানন্দে

গ্রহণ করা উচিত ; এমন সময় আসিতেছে—যখন সমস্ত জমির মালিক হইবে রাষ্ট্র—অর্থাৎ যাহারা চাষ করিবে, জমি তাহাদেরই হইবে। এই ব্যাপারকে সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া বিচার করা সঙ্গত হইবে না।

ভোটদানের অধিকার

স্বাধীন ভারতে কাহাদের ভোটাধিকার থাকিবে সে সম্পর্কে প্রশ্ন করা হইলে গান্ধীজী বলেন যে, স্বাধীন ভারতে যাহারা কায়িক শ্রমদ্বারা রাষ্ট্রের সেবা করিবে তাহাদের প্রত্যেকেরই ভোটাধিকার থাকিবে। এই নীতি অনুসারে প্রত্যেক দিন-মজুরের পর্যন্ত ভোটাধিকার থাকিবে বটে কিন্তু রাষ্ট্রের জন্য কায়িক শ্রম না করিলে কোটিপতি ব্যবসায়ী বা আইনজীবী প্রভৃতি লোকেরা ঐ অধিকারে বঞ্চিত থাকিবেন। প্রাপ্তবয়স্ক অর্থাৎ ২১ বা ১৮ বৎসর পূর্ণ হইলেই প্রত্যেক নরনারী ভোটাধিকার পাইবেন। বৃদ্ধদের ভোটের কোন মূল্য নাই। অপ্রাপ্ত বয়স্কদের সম্পর্কেও ঐ একই কথা খাটে। সুতরাং ৫০ বৎসরের অধিক বা ১৮ বৎসরের কমবয়স্ক ব্যক্তিদের ভোটাধিকার থাকা সঙ্গত নয়। উন্মাদ ও দুশ্চরিত্রগণেরও এই অধিকার থাকিবে না। সাম্প্রদায়িক নির্বাচন প্রথার কথা চিন্তা করা পর্যন্ত সঙ্গত নয়। তবে সংরক্ষিত আসন রাখিয়া যুক্ত নির্বাচন চলিতে পারে। কাহারও বিশেষ সুবিধা থাকিবে না। যদি কাহাকেও বিশেষ সুবিধা দিতেই হয় তবে কুষ্ঠরোগাক্রান্তদের জন্য সে ব্যবস্থা রাখিতে হইবে, কারণ তাহারা সমাজের দুর্নীতির সাক্ষ্য।

আঞ্চলিক স্বাধীনতা

কয়েকটি প্রশ্নের উত্তরে গান্ধীজী বলেন, কোন প্রদেশ নিজের শাসনতন্ত্র রচনা করিয়া তাহা কার্যকরী রাখিতে পারিলে উক্ত প্রদেশের স্বাধীনতা ব্যাহত করা কাহারও পক্ষে সম্ভবপর নয়। কোন প্রদেশ স্বাধীন হইলে এবং অহিংস নীতি অক্ষুণ্ণ রাখিলে তাহার প্রভাব সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িবে। কোন প্রদেশ বা অঞ্চল সর্বজনপ্রিয়, আদর্শ শাসনতন্ত্র প্রণয়নে সক্ষম হইলে অন্যান্য অঞ্চলও তাহাতে যোগ দিতে বাধ্য হইবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, "ক" প্রদেশমণ্ডলের শাসনতন্ত্র সত্যসত্যই লোকহিতকর হইলে "খ" ও "গ" প্রদেশমণ্ডল নৈতিক কারণে তাহার সহিত যোগ দিতে বাধ্য হইবে

অধিকার ত্যাগের শর্ত

ধর্মসংক্রান্ত অসহিষ্ণুতা চরমভাবে দেখা দিলে জনগণের কর্তব্য সম্পর্কে গান্ধীজী বলিয়াছেন, ভীত হইয়া দেশত্যাগ করা অপেক্ষা সাহসের সহিত মৃত্যুবরণ শ্রেয়। লোকাপসারণ অসঙ্গত, অবাস্তব এবং অবাঞ্ছনীয়। তবে কোনস্থানে সংখ্যাগরিষ্ঠগণ লঘিষ্ঠদের অস্তিত্ব একেবারেই সহ্য করিতে যদি না পারেন তাহা হইলে সরকারের পক্ষেও সংখ্যালঘুদের প্রহরী দিয়া রক্ষা করা সম্ভব নয়। সেক্ষেত্রে ভিটামাটি, স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি বাবদ উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ এবং নূতন স্থানে গিয়া জীবিকা অর্জনের উপযুক্ত ব্যবস্থা যদি সংখ্যাগরিষ্ঠগণ করিয়া দিতে সম্মত হন কেবলমাত্র সেইক্ষেত্রে সংখ্যালঘুগণ পিতৃপুরুষের বাসস্থল ত্যাগ করিয়া যাইতে পারেন। কিন্তু পুরা ক্ষতিপূরণ না দিলে তাহাতে সম্মত হওয়া চলিবে না।

অহিংস নীতির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই গান্ধীজী কেবলমাত্র উপরিলিখিত-ক্ষেত্রে এবং শর্তে স্থানত্যাগের প্রস্তাবে সম্মতি দিয়াছেন। তিনি বলেন, জোর করিয়া স্থানত্যাগ করান কোনক্রমেই বরদাস্ত করা উচিত নয়।

নোয়াখালি

নোয়াখালিতে গত ১০ই অক্টোবর হইতে প্রায় ২০০ বর্গমাইল স্থান ব্যাপিয়া দুইদলে বিভক্ত ২০,০০০-এর অধিক লোক অন্যান্য খণ্ডদলের সাহায্যে ব্যাপক আক্রমণ পূর্ব হইতে পরিকল্পিত এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসাধনের জন্যই আরম্ভ হইয়াছিল। আক্রমণকারীদের সর্বজনমান্য নেতৃবৃন্দ বক্তৃতা ও আক্রমণের অস্ত্রাদি সরবরাহ দ্বারা তাহাদের উৎসাহিত করিয়াছিলেন। আক্রমণ সামরিক কায়দায় ও সরকার-নিয়ন্ত্রিত পেট্রোলাদি সহযোগে চালান হয়। ঠিক সামরিক আক্রমণের অনুরূপভাবে পূর্বাহ্নেই সেতু, পথ ও ডাকঘর প্রভৃতি বিনষ্ট করিয়া যোগাযোগের পথ বিচ্ছিন্ন করিয়া দেওয়া হয়।

লুণ্ঠন, অগ্নিসংযোগ, ব্যাপক নরহত্যা, অসংখ্য নারীহরণ ও নারীনির্যাতন, বলপূর্বক ধর্মান্তরকরণ, বলপূর্বক বিবাহ প্রভৃতি ছিল এই আক্রমণের অন্যতম অঙ্গ। এইভাবে একটি সীমাবদ্ধ অঞ্চলে এক বিশেষ রাজনৈতিক মতলব হাসিলের সর্বাত্মক চেষ্টা হয়। ইহাকে সামরিক প্রচেষ্টা বলা যাইতে পারে, কারণ প্রত্যেকটি কাজের জন্য ভিন্ন ভিন্ন উপদল নিজ নিজ নেতার অধীনে পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী শৃঙ্খলা ও নিয়মানুগতভাবে আক্রমণ চালাইয়া যায়। যুদ্ধের ন্যায় গুপ্তচর, সংবাদসঞ্চয় প্রভৃতি প্রথাও পুরাপুরি অনুসৃত হয়।

সর্বাত্মক আক্রমণের প্রথম পর্যায় সুসম্পন্ন হওয়ার পূর্বে যাহাতে সংবাদ বাহিরে না পৌছায় আক্রমণকারীদের প্রাদেশিক নেতৃবৃন্দ কলিকাতার দপ্তরে তাহার এমন সুব্যবস্থা করিয়াছিলেন যে, আক্রমণ শুরু হওয়ার ৫ দিন পরে প্রথম উহার সংবাদ রাজধানীতে পৌছায়। ১৫ই পর্যন্ত সরকারী কর্মচারীদের নিষ্ক্রিয়তা বিশেষ লক্ষণীয়। এই আক্রমণ যে সম্পূর্ণভাবে সাম্প্রদায়িক রাজনীতি কার্যকরী করার উদ্দেশ্যে আরম্ভ হইয়াছিল তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় আক্রমণ-কারীদের "মুসলিম লীগ জিন্দাবাদ", "মারকে লেঙ্গে পাকিস্তান" প্রভৃতি ধ্বনির মধ্য দিয়া। আক্রান্তগণ অপর পক্ষকে কোন ভাবেই উত্তেজিত করেন নাই। ২০০ বর্গমাইল ব্যাপী প্রায় ৪০০ গ্রামের ২ লক্ষাধিক অধিবাসী এই আক্রমণের ফলে নিঃস্ব ও নিঃসম্বল হইয়া বলদ ও কৃষিযন্ত্রের অভাবে মৃত্যুর সম্মুখীন হইয়াছেন।

হাঙ্গামা দমনে বাংলার মসনদের অধিকারীগণের ঔদাসীন্য প্রকট হইয়াছে।

হাঙ্গামা আরম্ভের পক্ষকাল পরেও আক্রমণ সম্পূর্ণ বন্ধ হয় নাই, সরকারী বিবৃতিই তাহার সাক্ষ্য। ঘটনাস্থলে গিয়া হাঙ্গামা দমনের চেষ্টা আক্রমণকারীদের কোন প্রথম শ্রেণীর নেতাই করেন নাই। কেবল একজন প্রাদেশিক মন্ত্রী সপ্তাহখানেক পরে নিরুপদ্রব ও শহরাঞ্চলে বেড়াইয়া আসেন।

৭ই নভেম্বর গান্ধীজী নোয়াখালি পরিভ্রমণ আরম্ভের পর হইতে আক্রমণকারীদের শুভবুদ্ধি জাগ্রত হইয়া অবস্থা শান্তির পথে অগ্রসর হইতে থাকে।

কিন্তু পূর্ব আক্রমণের প্রচারকদল নিজেদের নেতৃত্বের অবসানের উপক্রম দেখিয়া আবার বিদ্বেষ প্রচার করিতেছেন।

বাংলার মসনদের বর্তমান অধিকারীদের দলভুক্ত কেহ হাঙ্গামা দমনের চেষ্টায় হতাহত হইয়াছেন বলিয়া শুনা যায় নাই। তাঁহারা সমস্ত ঘটনাটি চাপা দিবার প্রথমাবধি চেষ্টা করিয়া আসিয়াছেন। অসংখ্য আদালতগ্রাহ্য প্রমাণ এবং লিখিত অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও বাংলার প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং ব্যাপারটির বিকৃত ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছেন নিহতের সংখ্যা মাত্র ১৮২, অপহৃতা নারীর সংখ্যা ১০, বলপূর্বক বিবাহের সংখ্যা ২ এবং নারীধর্ষণ আদৌ হয় নাই। বলপূর্বক ধর্মান্তরকরণ প্রচুর হইয়াছে। একথা তিনিও স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

বিহার

গত ২৫শে অক্টোবর নোয়াখালির ঘটনার প্রতিক্রিয়া হিসাবে ছাপরায় প্রথম বিচ্ছিন্ন হাঙ্গামা হয়। পরে উহা আরও কয়েকটি স্থানে ছড়াইয়া পড়ে। আক্রমণকারীদের মধ্যে পূর্বপরিকল্পিত সংগঠন বা রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ কর্তৃক পরিচালনার কোন লক্ষণ ছিল না। উত্তেজনা ও ক্রোধের বশে তাহারা "নোয়াখালিকা বদলালেও" ধ্বনি সহ ইতস্ততঃ বিচ্ছিন্ন আক্রমণ চালায়। তাহাদের আক্রমণের মধ্যে কোথাও সামরিক নীতি, নিয়ম বা শৃঙ্খলার কিছুমাত্র চিহ্নও ছিল না।

ব্যাপক নরহত্যা, লুণ্ঠন ও কয়েকটি ক্ষেত্রে নারীহরণের সংবাদও পাওয়া যায়। বিহারের মন্ত্রিমণ্ডলীর হাঙ্গামা দমনের তৎপরতা কংগ্রেস আদর্শের সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হয়। ঘটনার প্রকৃত বিবরণ ২৫শে তারিখেই পাটনায় প্রকাশিত হয় এবং ২ দিনের মধ্যেই ভারতের সর্বত্র পৌছে। আক্রমণকারীদের নিকট হইতে পুলিস ২ দিনের মধ্যেই প্রচুর অস্ত্র কাড়িয়া লয়।

৪০০০ বর্গমাইল স্থানের প্রায় ৩ লক্ষ অধিবাসী বিহারে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে প্রায় অর্ধেক লোক নিরাশ্রয় হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু কংগ্রেস সরকারের সুব্যবস্থায় তাহারা পুনর্বসতির পথে দ্রুত অগ্রসর হইয়াছে। কংগ্রেসী মন্ত্রিসভার একান্ত চেষ্টায় সাতদিনের মধ্যে হাঙ্গামা একেবারে বন্ধ হইয়া যায়।

হাঙ্গামা নিবারণের জন্য বিহারের প্রধান মন্ত্রী এবং অন্যান্য সচিবগণ ২৭শে তারিখের মধ্যে ঘটনাস্থলে গিয়া হাঙ্গামা নিরাময় না হওয়া পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করেন। কংগ্রেসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নেতা পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু এবং শ্রীজয়-প্রকাশ নারায়ণ ২রা নভেম্বর এবং ৪ঠা নভেম্বর তারিখে উপদ্রুত অঞ্চলে গিয়া নিজেদের জীবন বিপন্ন করিয়াও উত্তেজিত জনতা শান্ত না হওয়া পর্যন্ত চারিদিক ভ্রমণ করেন, ফলে আর কোন হাঙ্গামা হয় নাই।

কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা এবং নেতৃবৃন্দই আক্রান্ত সম্প্রদায়ের দল নির্বিশেষে সকল নেতাকেই শান্তি-প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করিয়াছেন। কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা একবারও ঘটনার গুরুত্বহ্রাস বা সত্যগোপনের চেষ্টা করেন নাই। বিহারের প্রধানমন্ত্রী সাহসের সহিত সত্য উদঘাটন করিয়া বলিয়াছেন যে, অসংখ্য লোক হতাহত হইয়াছে। হাঙ্গামা দমনের সময় সরকার কর্তৃক গুলিবর্ষণের ফলে

প্রায় ৪০০ হিন্দু নিহত হইয়াছে। ৫,৫৫১ জনকে গ্রেপ্তার করিয়া ৭৯১২টি মামলা দায়ের করা হইয়াছে। আরও ৮০০০ অভিযোগের তদন্ত চলিতেছে। সর্বসমেত প্রায় ৬০,০০০ লোক এই সকল ব্যাপারে অভিযুক্ত হইয়াছে। নারী-হরণের অভিযোগ মামদোতের নবাব ও অন্যান্য কেহ কেহ করিয়াছেন বটে কিন্তু প্রমাণ উপস্থিত করিয়া তাহাদের উদ্ধারের জন্য সরকারের কার্যে সাহায্য করিতে কেহই আগাইয়া আসেন নাই।

সরকারের চেষ্টায় ৩ জন নারী উদ্ধার হইয়াছে।

কংগ্রেসকর্মিগণ প্রদেশের সর্বত্র হাঙ্গামা দমনের চেষ্টা করিয়াছেন এবং এই চেষ্টায় প্রায় ৯০০ কংগ্রেসকর্মী হতাহত হইয়াছেন।

অভিযুক্ত ব্যক্তিদের স্বপক্ষে বিহারে কোন আন্দোলন নাই। গান্ধীজী এবং পণ্ডিত নেহরু হইতে আরম্ভ করিয়া বিহার মন্ত্রিসভা পর্যন্ত সকলেই নৃশংসতার তীব্র নিন্দা করিয়াছেন। পণ্ডিত নেহরু বোমাবর্ষণের প্রস্তাব করার পূর্বেই প্রধানমন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণ সিংহ হাঙ্গামা দমনের উদ্দেশ্যে গুলিবর্ষণের আদেশ দেন। অত্যাচারিতদের পুনর্বসতি ও সসম্ভ্রমে বসবাসের জন্য সরকার ও জনসাধারণ সুব্যবস্থা করিয়া দেওয়ায় তাঁহারা আশ্বস্তচিত্তে ফিরিয়া আসিতেছেন। বাংলার ন্যায় রেশন বন্ধের ব্যবস্থাকে পুনর্বসতি বলিয়া চালাইবার কোন চেষ্টা বিহারে নাই।

পল্লীসমাজকে ক্লেদমুক্ত ও শুভ্র-সুন্দর করাই গান্ধীজীর সাধনা

সংগঠনের পথে মহাত্মা গান্ধীর পুনর্বসতি পরিকল্পনা

মহাত্মা গান্ধী নোয়াখালিতে আসিবার পর বহুগ্রাম পরিভ্রমণ করিয়া পুনর্বসতির কথা গভীরভাবে চিন্তা করিয়াছেন। তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার প্রিয় সংগঠনকার্যও চালাইয়া যাওয়া স্থির করিয়াছেন। তাঁহার চিন্তাধারার মধ্যে, তাঁহার প্রত্যেকটি কথার মধ্যে একটি বিষয় সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে যে, সর্বহারা মানুষগুলিকে গৃহে পুনঃসংস্থাপিত করিবার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের জীবনধারাও পালটাইতে হইবে। কেবলমাত্র গঠনমূলক কার্যের দ্বারাই তাহা সম্ভব। সেই জন্যই তিনি কর্মীদের বারবার এই কথাই বলিয়াছেন—আর বিলম্ব নয়, গঠনকার্য শুরু করিয়া দাও। তাঁহারই প্রেরণায় বিভিন্ন কেন্দ্রে শ্রীপিয়ারীলাল, শ্রীমতী সুচেতা কৃপালনী, শ্রীকানু গান্ধী, শ্রীসৌরীন বসু, শ্রীমতী সুশীলা পাই, শ্রীমতী আভা গান্ধী ও আরও অন্যান্য বহু কর্মী বিভিন্ন গ্রাম্য কেন্দ্রে গঠনমূলক কার্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। গঠনমূলক কার্যের প্রধান কেন্দ্র কাজিরখিলে শ্রীসতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত কর্তৃক পরিচালিত হয়।

গান্ধীজী ৫ দিন চণ্ডীপুরে ছিলেন। সেখানে পূর্ব হইতেই কিছু কিছু গ্রাম সাফাইয়ের কাজ শুরু হইয়াছিল। ইহা ছাড়াও রাস্তা তৈরী, পুষ্করিণী সাফ, অসহায় লোকের ধান কাটিবার সাহায্য করা প্রভৃতি কাজ চলিতেছিল। পৌঁছিয়াই গান্ধীজী সেস্থানের ভারপ্রাপ্ত শ্রীসৌরীন বসুর নিকট ৫ দিনের কর্মসূচী চাহিলেন। এই ৫ দিনের ৩ দিন ৩টা হইতে ৪টা পর্যন্ত শ্রীযুত বসু গান্ধীজীর কাছে কাছে থাকিয়া গঠনমূলক কার্য সম্বন্ধে তাঁহার উপদেশ গ্রহণ করেন। ইহার মধ্যে একদিন গ্রাম-সেবা-সংঘের সভা হয়। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের ৬৮ জন লোক লইয়া গ্রাম-সেবা-সংঘ গঠিত হইয়াছে।

গান্ধীজী পানীয় জল পরিষ্কার রাখিবার উপরই সর্বাপেক্ষা অধিক জোর দেন। তিনি গ্রাম-সেবা-সংঘের কর্মীদের উদ্দেশ্যে চণ্ডীপুরে বলেন—"এখানে শুধু আমি আজ একটি বিষয়ের উপরই জোর দিব, তাহা হইল পানীয় জলের সমস্যা। এই পানীয় জলের আমি যে অবস্থা দেখিতেছি তাহাতে উহা ব্যবহারে কেন লোকের রোগ হইবে না? এক পুষ্করিণীর মধ্যে সমস্ত

কিছুই করা হয়। গ্রাম-সেবা-সংঘ আগে বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা করুন।" তিনি বলেন যে, প্রত্যেক রেলওয়ে স্টেশনে ফিল্টারের যে ব্যবস্থা আছে, সেভাবে জল ফিল্টার করিয়া লইলে চলিতে পারে। পুষ্করিণীর ধারে ধারে কূয়ার মতও খনন করিয়া লইতে বলেন।

পুষ্করিণীর তলদেশের সমান পর্যন্ত যদি খোলা যায়, সেই তলদেশ হইতে জল চোয়াইয়া আপনি কূয়া ভর্তি হইয়া যাইবে। সেই জল পরিষ্কার এবং পানীয়ের উপযোগী হইবে। তাহা সুসংরক্ষিত করিতে হইবে। ইহার পর বলেন যে, যাঁহারা অবস্থাপন্ন লোক তাঁহারা কেন প্রত্যেক বাড়ীতে টিউব-ওয়েল বসাইবেন না? ইহাতে খরচ এমন কি বেশী? শ্রীরামপুরে তো মাত্র সওয়া শো টাকায় টিউবওয়েল হইয়াছে। তিনি বলেন, "পানীয় জলের বিষয়টি লইয়া পরের দিন হইতে কাজ শুরু কর।" ইহার পর তিনি শ্রীযুত বসুকে প্রত্যেক দিনই ঐ একই বিষয়ে বলিতে থাকেন। তিনি শ্রীযুত সতীশ দাশগুপ্ত মহাশয়ের কাছে বলেন। গান্ধীজীও এই বিষয় তাঁহার কাছে বলেন এবং ইহার উপর তিনি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। সতীশবাবু এ বিষয় লইয়া বিশেষভাবে চিন্তা করেন যাহাতে সহজে লোকের পানীয় জলের ব্যবস্থা হইতে পারে। পুষ্করিণী সাফাই করিবার জন্য গ্রাম-সেবা-সংঘ বৈঠকে প্রস্তাব করে এবং সাফাইয়ের জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া যায়।

একটি মস্ত বড় প্রশ্ন দেখা দিয়াছে যে তাঁতি, কামার, ছুতার, জেলে, দর্জি, ইত্যাদি শিল্পীরা কর্মহীন হইয়া গিয়াছে, তাহাদের উপায় কি হইবে? সরকার তাহাদের ব্যবসার জন্য মাত্র দুই শত টাকা এককালীন সাহায্য করিবেন; সকলেই কিন্তু দুই শত টাকা পাইবে না, তাহাদের উপায় কি হইবে? সরকার যে সাহায্য করিবেন গান্ধীজী তাহার উপরেও টাকা যোগাড় করিয়া দিবেন—এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন। কিন্তু তিনি বলেন, "আমি তো ভিক্ষুক হইতে দিব না, আপনাদের প্রত্যেক বৃত্তিধারীর মধ্য হইতে অথবা গ্রামের কোন ভাল লোকের মধ্য হইতে এই টাকার জিম্মাদার হইতে হইবে। এই টাকা হইতে তাঁহারা ব্যবসা চালাইবেন এবং ব্যবসার লভ্যাংশ হইতে ধীরে ধীরে সেই সমস্ত টাকা শোধ করিয়া দিবেন।"

তাঁতিদের সম্বন্ধে তিনি বলেন, তাঁতিরা তো নিয়মিত ভাবে মিলের সূতা পান না। ২।১ মাস অন্তর অন্তর সূতা পান; এই অবস্থায় তাঁহারা গভর্নমেণ্টের উপর নির্ভর করিয়া থাকায় তাঁহাদের আজ এই দুরবস্থা হইয়াছে। তাঁহারা

আজ যদি চরকার সুতা পান তাহা হইলে সেই সুতা কি বুনিবেন ? যদি তাঁহারা চরকার সুতা বুনিতে চান তবে আমি ভাল তূলার ব্যবস্থা করিতে পারি।

একজন বলেন, উহাতে তো আমাদের পোষায় না। তাহার কারণ খদ্দরের সুতার নরম পাক এবং অসমান হওয়ার দরুন সুতা ছিঁড়িয়া যায়, যার ফলে রোজগার কম হইয়া যায়। গান্ধীজী বলিলেন, "আচ্ছা, চরকার সুতা যদি দোতার করিয়া পাকাইয়া দেয় তবে তো শক্ত হইবে ?" সঙ্গে সঙ্গে নাতনি মনু গান্ধীকে ডাকিয়া কেমন করিয়া চরকা হইতে সহজে ডবল তার পাকাইয়া শক্ত সুতা হয় তাহা দেখাইয়া দিলেন।

উপরন্তু গান্ধীজী একথাও বলিলেন, আচ্ছা, তোমরা বলিতেছ যে, আয়ের পরিমাণ কম হইবে কিন্তু আমি বলি যে, না, আয়ের পরিমাণ কম হইবে না। তোমরা মিলের সুতা কখনও পাও কখনও পাও না—যখন পাওনা তখন তো একেবারেই বসিয়া থাক এবং কাজ বন্ধ হইয়া যায়। তখন যে তাঁতি খদ্দর বুনিবে সে তাঁতি যদি নিয়মিত মাসে ২০৲ আয় করিয়া যায় একদম বসিয়া না থাকিয়া, তাহা হইলে কি তাহার আয়ের মাত্রা ঠিক রহিল না। তাঁতি ভাইয়েরা তাহাদেরই ভুল স্বীকার করিয়া লইল এবং দোতারি সুতা পাকাইয়া দেখাইতে, তাঁতিরা সে রকম সুতা পাইলে বুনিতে পারিবে বলিয়া স্বীকার করিল।

এই ভাবে বিভিন্ন উপায়ে সর্বহারা গ্রামবাসীদের পুনর্বসতির ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের নূতন ভাবে নূতন জীবনযাপনের ব্যবস্থার কথাও ভাবিতেছিলেন। শ্রীসতীশ দাশগুপ্ত মহাশয়কে এ বিষয়ে তিনি তাঁহার দক্ষিণ হস্তরূপে পাইয়াছেন।

এতদঞ্চলের মানুষরা রাস্তার উপর পায়খানা করেন না বটে কিন্তু পায়খানার যে ব্যবস্থা দেখা গিয়াছে, সেই পায়খানার ব্যবস্থা স্বাস্থ্যসম্মত বা বিজ্ঞানসম্মত কিছুতেই বলা যায় না। ইহার জন্য একরকম নূতন ধরনের স্যানিটারী পায়খানা মাটিতে গভীর গর্ত করিয়া অন্ধকার করিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং পাশ দিয়া ফুটা করিয়া তাহার গ্যাস বাহির করিয়া দেবার ব্যবস্থাও হইয়াছে। এই রকম একটি পায়খানা চণ্ডীপুরে মহাত্মাজীকে দেখান হইয়াছে। তিনি তাহাতে খুশী হইয়া সম্মতি দিয়াছেন। একটু ত্রুটি যাহা ছিল তাহা সংশোধনও করিয়া দিয়াছেন। এই পায়খানা যাহাতে ঘরে ঘরে বিনা খরচায় তৈয়ারী হয়, চণ্ডীপুরের গ্রাম-সেবা-সংঘ ও মাসিমপুরের গ্রাম-সেবা-সংঘ চেষ্টা করিতেছেন।

পুনর্বসতির সঙ্গে সঙ্গে এই সমস্ত গৃহহারাদের ঘর দরজা বা বসতি কিরূপে বৈজ্ঞানিক ও স্বাস্থ্যসম্মত ধরনের হইবে সেকথাও গান্ধীজী ভাবিয়াছেন।

এমন কি একটি প্রার্থনা-সভায় একথাও বলেন, "আমি সাহাপুর হাটের মধ্য দিয়া যাইতেছিলাম, সে সময় হিন্দু-মুসলমানের ভীড় ছিল। সকলেই হাটে বেচা-কেনা করিতেছে এবং আপন আপন কর্মে রত দেখিয়া আমি মনে বিশেষ আনন্দ পাই। কিন্তু এই সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে হইয়াছে যে, আজ যদি আমার হাতে কোন ক্ষমতা থাকিত তাহা হইলে এই হাটের ব্যবস্থা আরও সুন্দর করিয়া সুশৃঙ্খলরূপে গঠন করিয়া দিতাম যাহাতে লোকেরা বেশ আরামে ঠেসাঠেসি না করিয়া শৃঙ্খলার সহিত বেচা-কেনা করিতে পারিত এবং মানুষের চলাচলের রাস্তাও ভীড়ে ঠেসাঠেসি হইত না।"

গান্ধীজীর এই কথার দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে,আজ এক নোয়াখালি হইতে তিনি সারা ভারতের আদর্শ পল্লীর কথা ভাবিতেছেন এবং এখান হইতে তাহার উদাহরণ দেখাইতে চান। প্রতিটি মানুষের জীবনযাপন-প্রণালী স্বচ্ছন্দ সরল এবং শৃঙ্খলাপূর্ণ ও দারিদ্র্যহীন হইবে এবং তিনি গঠনমূলক কাজের উপর বিশেষ জোর দিয়াছেন কেবলমাত্র এইজন্যই। সমস্ত পল্লীসমাজকে আজ তিনি ক্লেদমুক্ত করিতে চান। প্রত্যেকের জীবনযাত্রার প্রণালী এমন হইবে যে, পল্লী-সমাজের প্রতিটি মানুষ জ্ঞানী, সাহসী, সুরুচিসম্পন্ন ও স্বাবলম্বী হইবে। সমাজের প্রতি মানুষকেই তিনি মৈত্রীবন্ধনে বাঁধিতে চান; সমাজের বিভিন্ন মানুষের মধ্যে যে তীব্র বৈষম্য ও ভেদাভেদ রহিয়াছে এবং একে অন্যকে গ্রাস করিয়া নিজে কেমন করিয়া ভাল খাইবে, ভাল পরিবে এই চিন্তার পরবশ হইয়া একে অন্যের বুকে ছুরি মারিতে দ্বিধা বোধ করিতেছে না। গান্ধীজী এই সমস্ত বিষ নষ্ট করিয়া নূতন সমাজ-ব্যবস্থার পরিকল্পনা করিয়াছেন এবং হাতে-নাতে তাহা কার্যে পরিণত করিবার জন্য চেষ্টাও করিতেছেন।

অস্পৃশ্যতা দূর করিবার জন্য কর্মীরা পূর্ব হইতেই আপ্রাণ চেষ্টা করিয়া আসিতেছিলেন। সর্বজাতিকে লইয়া একত্রে ভোজের ব্যবস্থা হইয়াছিল। সেই ভোজে স্ত্রীলোক ও পুরুষেরা একত্রে বসিয়া আহার করিলেন এবং ধোপা ও মালীরা পরিবেশন ও রন্ধন করিলেন। কোনরূপ মহোৎসব করিয়া নয়, একেবারে পংক্তিভোজন উদ্দেশ্যে। কিন্তু অভিজ্ঞতার দ্বারা দেখা গেল যে, পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকদের মধ্যে অস্পৃশ্যতা সম্বন্ধে গোঁড়ামি বেশী। ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থ ঘরের স্ত্রীলোকদের হরিজনদের সাথে একত্রে ভোজনে বসাইতে

রীতিমত কষ্ট পাইতে হইয়াছে। সতীশবাবুর অধীনে যতগুলি কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে তাহার মধ্যে কয়েকটি কেন্দ্রে এইরূপ পংক্তিভোজনের ব্যবস্থা হইয়াছে। স্ত্রীলোকদের মধ্যে এইরূপ অজ্ঞতা ও গোঁড়ামি দেখিয়া যাহাতে তাঁহাদের মধ্য হইতে এই গ্লানি দূর হইয়া যায়, তাহার জন্য চণ্ডীপুরে স্ত্রীলোকদের সাথে গান্ধীজীকে লইয়া একটি বৈঠক করা হয়। গান্ধীজী স্ত্রীলোকদের এই বৈঠকে প্রথমে তাঁহাদের সাহসী ও পবিত্রমনা হইতে বলেন। তিনি সীতার উদাহরণ দিয়া বলেন, "সীতা রাবণের পুরীর মধ্যে একাই ছিলেন। দুষ্ট রাবণ তাঁহাকে কতবার উৎপীড়ন করিবার চেষ্টা করিয়াও বিফল হইয়াছে। কোন্ শক্তিবলে তিনি এতবড় দুষ্কৃতকারীর হাত হইতে নিজেকে রক্ষা করিয়াছেন? সতীত্বই নারীর ভূষণ ও একমাত্র রক্ষাকবচ। সীতার অন্তর একদিকে দুঃসাহসী ছিল এবং আর একদিকে পবিত্র সতীত্ব-তেজে প্রদীপ্ত ছিল। এই তেজ তাঁহাকে সকল অত্যাচারের হাত হইতে বাঁচাইয়াছে। আপনাদেরও আজ সীতার মত তেজস্বিনী হইতে হইবে।"

অস্পৃশ্যতা সম্বন্ধে তিনি বলেন যে, বড়ই দুঃখের ও লজ্জার বিষয় যে আজ হিন্দুসমাজের মধ্যে কুষ্ঠরোগের মত এই ব্যাধি দেখা দিয়াছে। বহুধা-বিভক্ত হিন্দুসমাজ আজও এই পাপ পোষণ করিয়া আসিতেছে বলিয়াই হিন্দুসমাজের এই অধঃপতন দেখা দিয়াছে। তিনি বলেন, যেমন কোন বস্তু দেবতাকে উৎসর্গ করিয়া দিয়া তবে সেই প্রসাদ গ্রহণ করা হয়, তেমনি আমরা যে অন্ন ভোজন করি তাহা হরিজনদের দ্বারা স্পর্শ করাইয়া আমাদের গ্রহণ করা উচিত এবং স্ত্রীলোকেরাই গৃহকর্ত্রী, তাঁহারা ইচ্ছা করিলে ভিতর হইতে এই পাপ দূর করিতে পারেন। তাঁহারা যদি এই পাপ দূর করিয়া দেন তবে সত্যই ইহা দূর হইবে। তিনি সবাইকে ইহা দূর করিবার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করেন।

মহাত্মার আজন্ম সাধনার চরম পরীক্ষা

জনবিরল পল্লীর পথে তীর্থযাত্রা

সমগ্র বদনমণ্ডলে কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনের দীপ্তি, অন্তরে দৃঢ় পণ, হয় সাম্প্রদায়িকতার বিষ নাশ করিব, না হয় এই নোয়াখালির মাটিতে জীবনের সমাধি দিব। 'যাহারা মার খাইয়াছে তাহারা যেমন মৃত এবং কাপুরুষ, আর যাহারা মরিয়াছে তাহারাও সেরূপ মৃত এবং কাপুরুষ। উভয়ের মধ্যেই দুইরকম ভীতি বর্তমান ছিল।' গান্ধীজী এই ভয় দূর করিয়া উভয়কেই বাঁচাইতে চাহিয়াছেন। এই সংকল্প লইয়াই তাঁহার যাত্রা।

নগ্নপদে মহাত্মা গান্ধী তীর্থযাত্রায় চলিয়াছেন। তীব্র শীতের প্রাতে শিশির-সিক্ত দূর্বাদল ও কর্দমাক্ত পল্লীপথে নগ্নপদে মহাত্মাজী চলিয়াছেন। কণ্ঠে তাঁহার শান্তি ও মৈত্রীর বাণী, হৃদয়ে অসীম বিশ্বাস, মুখমণ্ডলে কঠোর সংকল্পের দীপ্তি। শ্রান্তিবোধ তাঁহার নাই, সদা আনন্দময়, সদা হাস্যময় তাঁহার মুখমণ্ডল।

এতদিন বিশ্ববাসী দেখিয়াছে ক্ষমতামত্ত রাজশক্তির দম্ভ ধূলিসাৎ করিয়া মূক নিপীড়িত জনগণের উপর অন্যায় ও অবিচারের প্রতিকারের জন্য এই ক্ষীণকায় সত্যাগ্রহীর অভিযান। সেদিন এই আত্মিক তেজোদীপ্ত যোদ্ধা ছিলেন অগ্রণী, কিন্তু তিনি নিঃসঙ্গ ছিলেন না। সেদিন তাঁহার পশ্চাতে ছিল শত সহস্র লক্ষ নিরস্ত্র অহিংস পদাতিক।

নোয়াখালির পল্লীপথে মহাত্মাজী চলিয়াছেন একা, বাস্তব পটভূমিকার উপর আজন্ম সাধনার চরম পরীক্ষা করিতে। "একলা চলরে" তাঁহার অন্তরের স্বতঃস্ফূর্ত বাণীমন্ত্র। চলার পথে 'গুরুদেবের' এই সঙ্গীতটি হইল তাঁহার প্রেরণার উৎস। রোষহীন ক্ষোভহীন ভয়লেশহীন, অন্তরে সকল মানসিক বিকার-মুক্ত মহাত্মার তীর্থযাত্রা শুরু হইল। তৃণের চেয়েও নিরহঙ্কার, তরুর চেয়েও সহিষ্ণু, সকল মানবের প্রতি করুণার প্রতিমূর্তি মহাত্মা গান্ধী মনে ও মুখে ইষ্ট দেবতার নাম স্মরণ করিতে করিতে চলিয়াছেন।

মহাত্মা গান্ধীর এই তীর্থযাত্রা সম্পূর্ণ অভিনব। ইহার পূর্বে তিনি অনেকবার সত্যাগ্রহ করিয়াছেন। দেশবাসীর প্রতি সরকারের অবিচারের প্রতিকারের

জন্য তিনি পূর্বে অনেকবার তাঁহার অহিংসার অস্ত্র হাতে লইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। প্রতি বারই তাঁহার প্রতিপক্ষের রূপটা তাঁহার সমক্ষে অত্যন্ত স্পষ্ট ছিল। 'আমার দেশবাসীর প্রতি এই অন্যায় করা হইয়াছে, আমি আমার অহিংসার সকল শক্তি প্রয়োগ করিয়া এই অন্যায়ের প্রতিরোধ করিব, আমার দেশবাসীকে এই অবমাননার হাত হইতে রক্ষা করিব।' কিন্তু এবার গান্ধীজী অভিযান শুরু করিয়াছেন দেশবাসীর প্রতি সরকারের কোন অবিচারের প্রতিবাদে নয়। এবার তিনি নিজেকে এবং নিজের অনুসৃত অহিংসার চরম পরীক্ষা করিতে চলিয়াছেন। সুতরাং এই তীর্থযাত্রার তাৎপর্য অপরিসীম। একথাই মহাত্মা গান্ধী একদিন নিস্তব্ধ সন্ধ্যালোকে পল্লীর পথে পায়চারি করিতে করিতে তাঁহার এক একান্ত অন্তরঙ্গ পার্ষদের কাছে ব্যক্ত করিয়াছেন। মহাত্মাজী তাঁহাকে বলেন, "এবার আমার পরীক্ষা বড় কঠোর ; আমার দায়িত্ব অসীম। পূর্বে আমি যতবার সত্যাগ্রহ করিয়াছি, প্রতিবারই আমার সমক্ষে একটা সুস্পষ্ট অন্যায়ের প্রতিমূর্তি ছিল। সরকারের বিরুদ্ধে আমার অভিযোগ ছিল, আমি সেই অন্যায়ের প্রতিকারের জন্যই অহিংস সংগ্রাম করিয়াছি। সেই সংগ্রামে আমি পুরোভাগে গিয়া দাঁড়াইলেও আমার পাশে চতুর্দিক হইতে আমার নিগৃহীত দেশবাসীরা আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

"আমি ভগবানের নিকট সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করিলেও ইহাদের সান্নিধ্য আমাকে অনেক সান্ত্বনা ও শক্তি জোগাইয়াছে ; কিন্তু আজ আমি যে সত্যাগ্রহ আরম্ভ করিয়াছি তাহার রূপ সম্পূর্ণ অন্য। আমি সরকার-অনুষ্ঠিত কোন অবিচারের প্রতিকার করিতে যাইতেছি না। কাহারও বিরুদ্ধে আমার অভিযোগ নাই। আমি পরীক্ষা করিয়া দেখিব আমি সারাজীবন যে অহিংসার সাধনা করিয়া আসিয়াছি সেই অহিংসা দ্বারা আমি মানুষের মনের অমানুষিকতা দূর করিতে পারি কিনা। মানুষে মানুষে যে হানাহানি, মানুষে মানুষে যে হিংসা-দ্বেষ, মানুষ হইতে মানুষের যে ভয় বিকার, সেই বিকার মানুষের মন হইতে দূর করিতে আমার অহিংসা কতটা কার্যকরী, আমি জীবন-সায়াহ্নে তাহাই যাচাই করিয়া যাইব। একাজ বহুতে মিলিয়া করার নয়, কাজেই আমাকে একাই এই পরীক্ষা করিতে হইবে। তাই আজ আমি একা চলিয়াছি। আজ আমার পশ্চাতে, আমার পাশে শতসহস্র অনুচরের প্রয়োজন নাই, কেবলমাত্র ঈশ্বরের দেওয়া শক্তির উপরই আমাকে নির্ভর করিতে হইবে। তাই আমাকে জনগণের মাঝে অগ্রসর হইতে হইবে হিংসা-দ্বেষ-বিমুক্ত অন্তর

লইয়া। আমার অন্তরের কোন কলুষ থাকিলে আমার সাধনা ব্যর্থ হইবে। তাই আমি দীনভাবে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতেছি তিনি যেন আমার মন হইতে সকল কালিমা দূর করেন, আমার আত্মায় যেন তিনি শক্তি দান করেন।

"ইহাই আমার তীর্থযাত্রা। সকল সংস্কার-মুক্ত হইয়া সর্বস্ব দান করিতে করিতে দীনভাবে নগ্নপদে তীর্থস্থলের দিকে অগ্রসর হওয়াই ভারতের তীর্থ-যাত্রীর আদর্শ। তাই আজ আমি নগ্নপদে চলিয়াছি, আমার তীর্থ-পরিক্রমায়।"

মৈত্রী স্থাপনের উদ্দেশ্যে গান্ধীজীর আকুল আবেদন

নোয়াখালির গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে ঘুরিয়া স্থানীয় হিন্দু ও মুসলমান অধিবাসীদের সহিত আলাপ-আলোচনা করিয়া তাহাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার প্রত্যেকটি খুঁটিনাটির প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়া ইহাই সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে যে, এক সম্প্রদায়ের লোক সাময়িকভাবে যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হইলেও বহুকালের উভয় সম্প্রদায়ের সহযোগিতার ভিত্তিতে তিলে তিলে গ্রাম্য জীবনে যে সমস্ত ব্যবস্থা অভিন্নভাবে গড়িয়া উঠিয়াছিল একেবারে তাহার মূলে নিষ্ঠুর আঘাত লাগিয়াছে! নোয়াখালির হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে সকলেই আজ এক ভীষণ সামাজিক, অর্থনৈতিক ও পারিবারিক বিপদের সম্মুখীন হইয়াছে। যে অন্যায় তাহাদের আজ এই বিপদের মুখে ঠেলিয়া দিয়াছে, তাহাদের ভ্রাতৃত্বের নিবিড় সম্পর্ক নষ্ট করিয়াছে, সেই অন্যায়কে নির্মূল করিবার জন্য গান্ধীজী নোয়াখালির অখ্যাত পল্লীপ্রান্তে অভিযান চালাইয়াছেন। শান্তি ও মৈত্রীর বাণী তাঁহার কণ্ঠে। গ্রামের অধিকাংশ লোকই সরল ও অশিক্ষিত। তাহারা যদি কোন অন্যায় করিয়া থাকে তবে তাহা তাহাদের দোষ এ কথা বলা যায় না। তাহাদের অজ্ঞতার সুযোগ লইয়া তাহাদের মনে এমন বিষক্রিয়া করান হইয়াছে, যাহার ফলেই তাহারা একটা দুষ্কর্ম করিয়া ফেলিয়াছে। গান্ধীজী তাই এই অশীতিবর্ষ বয়সে দারুণ শীতের প্রভাতে হিমশীতল শিশিরসিক্ত ঘাসের উপর দিয়া আড়ষ্ট নগ্নপদে গ্রাম হইতে গ্রামান্তরের ঘরে ঘরে আকুল আবেদন জানাইয়া ফিরিতে থাকেন। সেবা ও সহযোগিতার মধ্য দিয়া, কর্ম ও ধর্মসহিষ্ণুতার মধ্য দিয়া পরস্পরের মধ্যে মৈত্রী স্থাপনের জন্য সকলকে অনুপ্রাণিত করিতে থাকেন।

তিনি বলেন যে, যদি কেহ দোষ করিয়া থাকে তবে ঈশ্বর তাহাকে সাজা দিতে পারেন। মানুষ মানুষকে কি সাজা দিতে পারে? প্রত্যেক মানুষই তো কিছু-না-কিছু দোষ জীবনে করিয়াছে, ঈশ্বরই একমাত্র মানুষের দোষ ক্ষমা করিতে পারেন। সেইজন্য যে অন্যায়ের গ্লানি উভয় সম্প্রদায়কে কলুষিত করিয়াছে, উভয় সম্প্রদায়কে ধ্বংসের মুখে সমর্পণ করিতে বসিয়াছে, সেই অবশ্যম্ভাবী ধ্বংস হইতে রক্ষা পাইতে হইলে মহাত্মাজীর প্রদর্শিত পথই একমাত্র বাস্তব পথ।

গান্ধীজী প্রত্যেক প্রার্থনা-সভায় প্রত্যহ এই একই কথার পুনরাবৃত্তি করিয়া

বলিয়াছেন—আমি কাহাকেও শাস্তি দিতে বা বিব্রত করিতে আসি নাই, আমি আসিয়াছি—শান্তি ও মৈত্রী স্থাপন করিতে, হৃদয়ে হৃদয়ে মিলন ঘটাইতে।

তিনি এই শান্তি ও মৈত্রীর বাণী শুধু মুখে শুনাইয়াই নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন নাই। তিনি হিন্দু ও মুসলমান নির্বিশেষে সকলের সেবার মধ্য দিয়া তাহা বাস্তবে রূপায়িত করিবার মহান্ ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন।

কোন মুসলমান ভাই যদি আমাকে তাঁহার বাড়ীতে না ডাকেন অথবা তিনি যদি আমার সেবা গ্রহণ না করেন, তবুও আমি সকলের দ্বারে দ্বারে ঘুরিব, যাচিয়া তাহাদের সেবা করিব। কর্মীদেরও তিনি বলিয়াছেন—তোমরা মুসলমান ভাইদের গ্রামে যাও ও তাহাদের সেবা কর। তাহাদের বুঝাইয়া দাও যে, তোমরা যথার্থই তাহাদের শুভাকাঙ্ক্ষী প্রতিবেশী। সেইজন্যই দেখিয়াছি, যতই তিনি গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে গিয়াছেন তাঁহার পথে কোন বাধা-বিপত্তি আসিলে তিনি হাসিমুখে ও আনন্দের সহিতই তাহা বরণ করিয়া লইয়াছেন।

চণ্ডীপুর

২রা জানুয়ারি গান্ধীজী তাঁহার গ্রাম হইতে গ্রামান্তর পরিক্রমণের পথে ঐতিহাসিক যাত্রা শুরু করেন।

২রা জানুয়ারি শুক্রবার সকাল সাড়ে সাতটায় গান্ধীজী শ্রীরামপুর ত্যাগ করেন। দুইস্থানে পূর্ব-ব্যবস্থানুযায়ী তাঁহাকে একটু করিয়া বসান হয়—সে কিন্তু বিশ্রামের জন্য নহে। তিনি নয়টায় চণ্ডীপুর পৌছেন। এতটা হাঁটিয়া আসিবার পরও তাঁহাকে ক্লান্ত দেখা যায় নাই।

অপরাহ্ণে প্রার্থনাসভায় গান্ধীজী গ্রামের গঠনমূলক কার্য সম্পর্কে উপদেশ দেন। সান্ধ্য ভ্রমণের সময় চেঙ্গীরগাঁও গিয়াছিলেন। গান্ধীজী ৬ই জানুয়ারি পর্যন্ত চণ্ডীপুরেই অবস্থান করেন।

৩রা জানুয়ারি প্রাতে গান্ধীজী সাড়ে সাতটায় গ্রামভ্রমণে বাহির হইয়া নমঃদের, মজুমদারদের ও দেদিগের দগ্ধ বাড়ীগুলির ভিতর দিয়া ঘুরিয়া ৮-২৬ মিনিটে ফিরিয়া আসেন। ঐ দিন অপরাহ্ণে চণ্ডীপুর ও চেঙ্গীরগাঁওয়ের প্রায় তিনশত স্ত্রীলোকের এক সভায় তিনি তাঁহাদের নির্ভীক হইতে উপদেশ দেন এবং সীতা ও দ্রৌপদীর পাতিব্রত্য ও আদর্শ তাঁহাদের সম্মুখে তুলিয়া ধরেন। অস্পৃশ্যতা নিবারণের উপর বিশেষ জোর দিয়া গান্ধীজী বলেন যে, অস্পৃশ্যতা

বর্জন না করিলে ধর্মপালন হয় না। অশনবসনে স্বাবলম্বী হওয়ার জন্যও তিনি উপদেশ দেন।

৪ঠা শনিবার প্রাতে ভ্রমণকালে চেঙ্গীরগাঁওয়ে একটি বিদ্যালয়প্রাঙ্গণে উপস্থিত জনসাধারণের সহিত শিক্ষার ধারা ও বুনিয়াদী শিক্ষা সম্পর্কে বলেন। অপরাহ্ণে গ্রাম-সেবাসংঘের বৈঠকে পুনর্গঠন ও পুনঃসংস্থাপন সম্পর্কে আলোচনা হয়। গ্রামের পানীয় জল বিশুদ্ধ রাখিবার নানা উপায় সম্পর্কেও আলোচনা হয়। তিনি ইচ্ছা প্রকাশ করেন যে, তিনি থাকিতে থাকিতে একটা কিছু উপায় উদ্ভাবিত হয় যাহাতে শুদ্ধ জল পাওয়ার ব্যবস্থা হইতে পারে। এইদিন হাটখোলায় প্রার্থনা-সভা হয় এবং এই সভায় মুসলমান জনসাধারণও উপস্থিত ছিলেন।

শনিবার গান্ধীজী শয্যাত্যাগ করেন রাত্রি ২॥ টার সময়। কিছুদিন হইতেই তিনি রাত্রি ৩টায় উঠিয়া কাজ আরম্ভ করিতেছিলেন। রবিবার আরও পূর্বে উঠেন—হাতের কাজ শেষ করিবার জন্য। ঐ দিন সকালে বিহারের মন্ত্রী ও কর্মচারীদের সহিত আলোচনা করেন ও অন্য গ্রামে একটি বিদ্যালয়ে নিমন্ত্রিত হইয়া সেখানে শিক্ষা সম্পর্কে আলোচনা করেন। অপরাহ্ণে চণ্ডীপুরের হাটখোলার এক মৌলভী সাহেবের আমন্ত্রণে তিনি প্রার্থনা-সভায় উপস্থিত হন। পূর্বে দুইবার মৌলভী সাহেবের নিমন্ত্রণেও অধিকসংখ্যক মুসলমান যোগ দেন নাই। বিশেষভাবে আহূত সভায়ও মুসলমানের সংখ্যা কম দেখিয়া গান্ধীজী বলেন—মুসলমান-ভাইরা তাঁহাকে বন্ধুভাবে লইতে পারিতেছেন না। হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে যে বিষ সঞ্চারিত হইয়াছে তিনি তাহা নির্মূল করিতে চাহেন, মুসলমানগণ তাঁহাকে পরীক্ষা করিয়া লউন। তিনি সত্যই তাঁহাদের শত্রু অথবা মিত্র। যদি মুসলমানেরা তাঁহার কাছে না আসেন তবে তিনি নিজেই যাচিয়া তাঁহাদের কাছে যাইবেন, তাঁহাদের পথঘাট সাফ করিবেন, তাঁহাদের সেবা করিবেন। তিনি একলা চলার মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া নিজ বুদ্ধিমত তাঁহাদের সেবা করিয়াই যাইবেন।

রবিবার সকালে গান্ধীজী গ্রামে ভ্রমণ করেন। অপরাহ্ণে গ্রামের বৃত্তিহীন তাঁতি, কামার, ছুতার ইত্যাদি লোকদের সহিত তাহাদের জীবিকা সম্পর্কে আলোচনা করেন। সন্ধ্যার পর হরিশচর গ্রামে মুসলমান-জনসভায় প্রার্থনা করিতে যান। প্রার্থনা-সভায় এইদিন অনেক মুসলমান জনসাধারণ উপস্থিত ছিলেন।

মসিমপুর

৭ই মঙ্গলবার সাড়ে তিনটায় গান্ধীজী তাঁহার ঐতিহাসিক যাত্রা শুরু করেন। চণ্ডীপুর হইতে মসিমপুর যাত্রাকালে তাঁহার প্রিয় ভজন "বৈষ্ণবজন" স্থানে "ইসাইজন" "পার্শীজন" "মুসলিমজন" উচ্চারণ করা হয়। যাত্রাপথে ধূলি ও কাদা সত্ত্বেও তিনি নগ্নপদেই চলিবেন স্থির করেন। তীর্থযাত্রায় তো নগ্নপদেই চলিতে হয়।

যাত্রাপথে সংকীর্তন করিতে করিতে চলার জন্য অনুমতি চাহিলে তিনি বলেন যে, কীর্তন দ্বারা পথযাত্রা আরম্ভ করিয়া আবার পৌছিবার সময় কীর্তন করিয়াই শেষ করা ভাল। সারা পথ কীর্তন করিতে করিতে চলিলে উহার দ্বারা পথিপার্শ্বের মুসলমান বাড়ীর অধিবাসীদের মনে এই ভ্রান্ত ধারণা জন্মিতে পারে যে হিন্দুদের বিজয়যাত্রা চলিতেছে। এইরূপ ধারণা হইতে দেওয়া সমীচীন নহে। বিজয় তিনি চাহেন—মুসলমানদের হৃদয় তিনি বিজয় করিতে চাহেন। সেই কাজ যেদিন সফল হইবে একমাত্র সেই দিনই তাঁহার আশা চরিতার্থ হইবে—জয়ের গৌরবে তাঁহার হৃদয় মণ্ডিত হইবে। পথিমধ্যে কথায় কথায় তিনি শ্রীযুক্ত সতীশ দাশগুপ্তকে বলেন যে, এতদিন যাহা করিয়াছেন আজিকার দিনের লক্ষ্যের তুলনায় তাহা তাঁহার নিকট তুচ্ছ বলিয়াই মনে হইতেছে। কি আর করিয়াছেন—কতকগুলি লোককে গভর্নমেণ্টের নিকট হইতে ন্যায় আদায় করিবার জন্য সত্যাগ্রহ করিতে শিখাইয়াছেন। আজিকার প্রারম্ভের নিকট সে অতি ছোট জিনিস।

প্রার্থনাকালে রামধুন শেষ হইলে গান্ধীজী যখন বলিতে আরম্ভ করিবেন ঠিক সেই সময় এক ব্যক্তি সমবেত মুসলমানদের সভা ত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিতে বলিলে অনেকে সভা ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে থাকে। গান্ধীজী বলেন, এ তো নমাজের সময় নহে, তবে তাঁহারা কেন চলিয়া যাইতেছেন? অনুসন্ধানে জানা যায় যে, রামনাম লওয়া হইতেছে বলিয়াই তাঁহারা সভাত্যাগে মনস্থ করিয়াছেন।

গান্ধীজীর ভাষণ তখন এই বিষয় লইয়াই হয়। তিনি বলেন যে, তাঁহার যাত্রাপথের প্রথম দিনই যে এই ঘটনা ঘটিল ইহা ভালই। ঘটনার জন্য তাঁহার দুঃখ হইয়াছে, কিন্তু ভালই হইয়াছে। কেননা তিনি মুসলমান জনসাধারণের মন বুঝিতে পারিতেছেন। তিনি দেখিতেছেন যে, এ স্থানের মুসলমানেরা

হিন্দুর রামনাম লওয়া সহ্য করিতে চাহেন না। গত অক্টোবরে ঘটনাস্থলে এই ভাবই যে ছিল তাহা তাঁহার নিকট স্পষ্ট হইতেছে। পাকিস্তান মানে সকল ধর্মের স্বাধীনতার স্থান, ইহাই তাঁহাকে শুনান হয়। তিনি তাহাই বিশ্বাস করেন। যাঁহারা পাকিস্তান মানে মুসলমানের বাসস্থান মনে করেন, তাঁহারা মন্দ পথ লইয়াছেন। তিনি প্রেমের ভাব লইয়া চলিতেছেন, সেই প্রেমের ভাবই তাঁহাকে তাঁহাদের দোষগুলি সম্পর্কে সচেতন করিয়া দিতে বলে।

অধিকসংখ্যক মুসলমান চলিয়া গেলেও কতক রহিয়া গিয়াছিলেন। আশা করা যায় যে, তাঁহারা মুসলমানদের নিকট গান্ধীজীর বাণী পৌছাইয়া দিবেন।

ফতেপুর

৮ই জানুয়ারি বুধবার সকালে গান্ধীজী মসিমপুর হইতে পদব্রজে ফতেপুর আসিয়া পৌছেন। মৌলভী ইব্রাহিমের বাটীসংলগ্ন গৃহে তিনি অবস্থান করেন। দ্বিপ্রহরে কয়েকজন মুসলমান গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাৎকালে তর্কের অবতারণা করিয়া বলেন যে, গান্ধীজীর স্থান বিহারে—তিনি কেন এখানে আছেন, আর কেনই বা তিনি দেশকে পথ দেখাইতেছেন না। গান্ধীজী বলেন যে, তিনি নিজেই পথ দেখিতে পাইতেছেন না, অপরকে আর কি করিয়া পথ দেখাইবেন।

গান্ধীজীর জন্য খড়ের ছাউনি চলতি কুটীর রচিত হইয়াছিল, তাহাতে একরাত্রি বাস করিয়া তিনি উহা বাতিল করিয়া দেন।

৮ই জানুয়ারি বুধবার—ফতেপুরে মৌলভী ইব্রাহিমের বাড়ীতে প্রার্থনা-সভা হয়। অনেক মুসলমান উপস্থিত ছিলেন। মৌলভী অশীতিবর্ষবয়স্ক বৃদ্ধ। গান্ধীজী ও মৌলভী সাহেব পাশাপাশি মঞ্চের উপর বসিয়াছিলেন।

প্রার্থনা আরম্ভ করিবার পূর্বে জনৈক মুসলমান প্রার্থনার পর গান্ধীজীকে তাঁহার গৃহে যাইবার জন্য আমন্ত্রণ করেন। তিনি বলেন, তাঁহার বাড়ী আধ মাইল দূর। সৌরীনবাবুর দূরত্ব জানা ছিল না। তিনি আমন্ত্রণকারীকে লইয়া গান্ধীজীকে তাঁহার অভিপ্রায় জানাইলে তিনি সহাস্যবদনে সম্মতি দেন। চলিতে আরম্ভ করিয়া দেখা যায় যে আধ মাইল পথ তো নয়ই, এক মাইলের চেয়েও বেশী পথ। গান্ধীজীর ক্লেশ হইতেছিল। রাত অন্ধকার ছিল। পথও সাফ করা ছিল না, খালি পায়ে কয়েকবার ঠোক্কর লাগে। মুসলমান বাটী হইতে ফিরিতে অনেক রাত হয়।

দাসপাড়া

৯ই জানুয়ারি বৃহস্পতিবার গান্ধীজী ফতেপুর হইতে রওনা হইয়া মাত্র ৫০ মিনিট হাঁটিয়া দাসপাড়ায় পৌছেন। এইটুকু দূরত্বে তাঁহার তৃপ্তি হয় না। তাঁহাকে জানান হয় যে, পরদিন সম্মুখে দাসপাড়া হইতে জগৎপুর লম্বা পাল্লার পথ।

অপরাহ্ণে স্থানীয় স্কুলের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে প্রার্থনা-সভা হয়। মুসলমান সভায় খুব কমই ছিলেন। অথচ ফতেপুর, দাসপাড়া, মসিমপুর প্রভৃতি পার্শ্ববর্তী গ্রামে কেবল মুসলমান অধিবাসীর বাস। দাসপাড়ায় মাত্র চারঘর হিন্দু। গান্ধীজী আসিবেন শুনিয়া মুসলমানেরাও গ্রাম ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়।

গান্ধীজী এই বিষয় উল্লেখ করিয়া বলেন যে, তাঁহাকে জানানো হইয়াছে, তাঁহার সহিত যে সশস্ত্র পুলিস আছে তাহাদের ভয়েই মুসলমানেরা আসিতে পারে না। কিন্তু ভয় কি ? সকলেই তো অপরাধ করে নাই ? আর যাহারা অপরাধ করিয়াছে, তাহারা ভয় না করিয়া পুলিসের নিকট নির্ভয়ে আত্মসমর্পণ করিতে পারে। কিন্তু তাঁহাকে শুনান হয় যে, যতদিন পুলিস তাঁহাকে ঘিরিয়া থাকিবে ততদিন তাঁহার নিকট মুসলমান জনতার অবাধ মেলামেশা সম্ভব নহে। কথাটা গান্ধীজীর নিকটও বাস্তব বলিয়া বোধ হয়। তিনি ইহার উত্তরে বলেন যে, তিনি বাংলা সরকারকে বারবার অনুরোধ করিতেছেন তাঁহার সহিত যেন রক্ষী বা সান্ত্রী না রাখা হয়। কিন্তু সে অনুরোধ বিফল হইয়াছে। তিনি বলেন যে, তাঁহার অনুরোধের সহিত যদি মুসলমান জনসাধারণের অনুরোধও গভর্নমেণ্টের নিকট পৌছে, মুসলমানগণ যদি গভর্নমেণ্টকে বলেন যে, রক্ষীদল সরাইয়া লওয়া হউক, তাহা হইলে সরকার হয়ত তাঁহাদের যুক্ত অনুরোধ মানিতে পারেন। গভর্নমেণ্ট তাঁহার শারীরিক অনিষ্টের আশঙ্কাতেই তাঁহার সহিত সশস্ত্র পুলিস রাখিয়াছেন। তাঁহারা যদি সরকারকে বলেন যে, সে আশঙ্কা নাই তাহা হইলে সরকার হয়ত রক্ষীদল সরাইয়া লইতে পারেন।

জগৎপুর

১০ই জানুয়ারি সকাল ৭টা ৪৫ মিনিটের সময় গান্ধীজী পরবর্তী গ্রাম জগৎপুর অভিমুখে রওনা হন। কনকনে শীতের প্রভাব। পল্লীপথ নির্জন। জগৎপুর নিকটবর্তী হইলে স্থানীয় অধিবাসীরা গান্ধীজীকে একটি ভস্মীভূত বাটী

দেখায়। হাঙ্গামার সময় ঐ বাটীর একজন মৃতকে পাশেই একটি সুপারি-বাগানে কবর দেওয়া হইয়াছিল। কবরের মুখে সেই মৃতের মাথার খুলি তখনও পড়িয়াছিল। গান্ধীজীকে উহা দেখান হয়। পথিপার্শ্বে আরও দুইটি ভস্মীভূত বাটী গান্ধীজীকে দেখান হয়।

একঘণ্টা ভ্রমণের পর গান্ধীজী ৮টা ৪৫ মিনিটে জগৎপুরে তাঁহার নির্দিষ্ট বাটীতে পৌছেন। গান্ধীজী জগৎপুরে শ্রীচন্দ্রমোহন ভৌমিকের বাটীতে অবস্থান করেন। গ্রামখানিতে লোকবসতি কম।

গান্ধীজীর বাসস্থানের নিকটবর্তী একটি মাঠে সান্ধ্য প্রার্থনা হয়। প্রার্থনা-সভায় গান্ধীজী ধর্মান্তরগ্রহণ সম্পর্কিত বিষয় অবতারণা করিয়া বলেন, বলপ্রয়োগের নীতি অনুসরণ করিয়া নোয়াখালিতে নর-নারী-শিশু-নির্বিশেষে সকলকে ধর্মান্তরিত করা হইয়াছে। ধর্মান্তরগ্রহণ অন্তরের বস্তু। স্বীয় ধর্ম এবং ঈপ্সিত ধর্ম সম্পর্কে গভীর জ্ঞান না থাকিলে ধর্মান্তরগ্রহণ অন্তরের বস্তু হইতে পারে না।

গান্ধীজী আরও বলেন, বলপ্রয়োগে নরনারীকে ধর্মান্তরিত করা ইসলামের শিক্ষা নহে। ইসলামের ইতিহাসে ইহার সমর্থনে কোন প্রকার যুক্তি নাই। উপসংহারে গান্ধীজী বলেন, উভয় সম্প্রদায়ের নরনারী পরস্পরের ধর্মবিশ্বাসের প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং ধর্মান্তরগ্রহণ বিষয়টি সম্পূর্ণ স্বাধীন ও স্বেচ্ছামূলক বলিয়া স্বীকার না করিয়া লইলে প্রকৃত ঐক্য স্থাপিত হওয়া সম্ভব নহে।

প্রার্থনার পর গান্ধীজী গ্রামের মধ্যে প্রায় এক মাইল পথ পরিভ্রমণ করেন।

লামচর

১১ই জানুয়ারি প্রাতে গান্ধীজী লামচরে পৌছেন। জগৎপুর হইতে লামচরের দূরত্ব অল্পই ছিল। কিন্তু অনেক ঘুরাইয়া গান্ধীজীকে আনা হয়। তাহাতে প্রায় ১ ঘণ্টা সময় লাগে। গান্ধীজীর পায়ের অবস্থা দেখিয়া শঙ্কা হইতেছিল। পায়ে নীলা পড়িয়াছে। শরীরে যতই ক্লেশ হইতেছে ততই তাঁহার আনন্দ বাড়িতেছে ; ক্লেশ সহ্য করার যোগ্য করিয়া যেন শরীরও নূতন করিয়া তৈরী করিতেছেন। দাসপাড়া হইতে জগৎপুর আসিবার সাফাই-করা পথ স্থানে স্থানে কেহ অপরিষ্কার করিয়া রাখিয়াছিল, কিন্তু জগৎপুর-লামচর পথ পরিচ্ছন্ন ছিল। পথিপার্শ্বে মুসলমান বৃদ্ধ ও বালকবালিকারা হাসিমুখে গান্ধীজীকে অভ্যর্থনা করেন।

জগৎপুর হইতে লামচরের পথ ধানক্ষেতের মধ্য দিয়া ছিল। লামচর গ্রামের প্রান্তে পৌছিলে একটি কীর্তনীয়া দল গান্ধীজীকে সম্বর্ধনা করে। তাহারা গান্ধীজীর পুরোভাগে নামকীর্তন করিতে করিতে লামচরের বাটী পর্যন্ত যায়।

পথিমধ্যে গান্ধীজীকে দুইটি ভস্মীভূত বাটী দেখান হয়। ইহার মধ্যে একটি গৃহের মালিক গান্ধীজীর নিকট তাঁহার দুর্দশার কাহিনী বিবৃত করেন। গান্ধীজী তাঁহাকে বিষয়টি নোয়াখালির পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট পেশ করিতে বলেন। পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট গান্ধীজীর সঙ্গেই ছিলেন।

একস্থানে পথের সংযোগস্থলে কয়েকজন বালকবালিকাসহ কয়েকজন মুসলমান গান্ধীজীকে কয়েকটি ডাব উপহার দেয়। তাহাদের মধ্যে একটি বালক লামচরের বাটী পর্যন্ত গান্ধীজীর অনুগমন করে এবং গান্ধীজী ঘরে আসন গ্রহণ করিলে তাঁহার হাতে একটি ডাব দেয়। গান্ধীজী হাসিতে হাসিতে ডাবটি গ্রহণ করেন।

এই গ্রাম সম্পর্কে গান্ধীজীর নিকট যে তথ্যাবলী দেওয়া হয়, তাহা হইতে জানা যায় যে, উপদ্রুত অঞ্চলের মধ্যে সম্ভবতঃ একমাত্র লামচর গ্রামেই ধর্মান্তরকরণ, নারী-নিপীড়ন হয় নাই। গ্রামের যুবকগণ রক্ষীদল সংগঠন করিয়াছিলেন। হাঙ্গামার সময় গ্রামে ৮৫০ জন হিন্দু ও ৭৫০ জন মুসলমান ছিলেন। গ্রামের অধিবাসীদের মধ্যে ১১জন নিহত হয়। বাসগৃহ ভস্মীভূত হওয়ায় প্রায় ৪৯টি পরিবার গৃহহীন হইয়া পড়ে।

গান্ধীজী লামচরে পৌছিলে ঐ দিনই গলিত কতকগুলি মৃতদেহ ও কঙ্কাল দূরের এক বিল হইতে আবিষ্কার করিয়া লামচরের পুলিস-ক্যাম্পের সম্মুখে রাখা হয়। ক্যাম্পের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে গান্ধীজীর সান্ধ্য প্রার্থনা হয়। প্রার্থনা-সভায় যাওয়ার পথে গান্ধীজীকে মৃতদেহ ও কঙ্কালগুলি দেখান হয়। তিনি ঐগুলি দেখিয়া অত্যন্ত ব্যথিত হন, কিন্তু কোন মন্তব্য করেন না।

এই ব্যাপারে পুলিসের আগ্রহ থাকিবার কথা নয়। এতদিন যে মৃতদেহগুলি আবিষ্কৃত হয় নাই, তাহা আজ বিশেষ দিনে আবিষ্কার করিবার তৎপরতা দেখাইয়া নিজেদের পূর্ব অকর্মণ্যতা প্রকট করিবার ঠিক হেতু খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন। যদি গ্রামের কেহ এইদিনে কৌশলে পুলিসকে দিয়া এই আবিষ্কার করাইয়া থাকেন তাহা হইলে উদ্যোক্তারা এই কাজ করিয়া গান্ধীজীর আরব্ধ কর্মের সহায়তা করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। পুলিস তাঁহাকে ঘিরিয়া চলিতেছেন, আর তিনি গেলেই মৃতদেহগুলি প্রকট করা হইল। শ্রীযুত সতীশ

দাশগুপ্ত এই প্রসঙ্গে কর্মীদের লক্ষ্য করিয়া বলেন যে, এই ঘটনার উদ্যোক্তারা যদি ইহাই ভাবিয়া থাকেন যে, এইভাবে গান্ধীজীর উপস্থিতির সুযোগ না লইলে পুলিস গরজ করিয়া আর এ মৃতদেহগুলি বাহির করিবে না, অতএব গান্ধীজীর উপস্থিতিতে পুলিসের উপর চাপ দেওয়া হউক—এই মনোভাব থাকিলে বলিব যে, পুলিসকে কর্তব্য করাইবার জন্য গান্ধীজীকে এইভাবে ব্যবহার করা এবং গলিত শবগুলি ঐরূপে দেখাইবার জন্য সাজাইয়া রাখা সঙ্গত কাজ হয় নাই। মুসলমানদের ভয় যে, গান্ধীজীর সভায় গেলে পুলিস ধরিবে। এই ঘটনা সেই ভয়ের পোষকতা করিবে—সেই ভয় যতই অমূলক হউক না কেন।

করপাড়া

১২ই জানুয়ারি রবিবার গান্ধীজী লামচর হইতে করপাড়ায় আসেন। অপরাহ্ণে বিশেষ কর্মব্যস্ততা দেখা যায়। আসা অবধি শ্রীমতী সুশীলা পাই এই গ্রামে কাজ করিতেছেন। এই গ্রামের স্ত্রীলোকদিগকে তিনি সংগঠিত করিয়াছেন। প্রত্যহই কোন-না-কোন বাড়ীতে মহিলা-সভা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। তাহাতে সংগঠিতভাবে কর্মময় জীবনের দিকে নারীরা আকৃষ্ট হইতেছেন।

অপরাহ্ণে মহিলা-সভা হয়। এই সভায় কয়েকশত স্ত্রীলোক উপস্থিত ছিলেন। গান্ধীজী তাঁহাদের উপদেশ দেন। তাহার পর সেবকদলের সহিত আলোচনা-কালে তিনি পথঘাট, ঘর-দুয়ার সাফাই, জল পরিষ্কার রাখা ইত্যাদি বিষয়ে তাহাদের উপদেশ দেন। কারিগর শ্রেণীর লোকদের অপর একটি সভায় তাহাদের ব্যবসার পুনঃপ্রতিষ্ঠা সম্পর্কে আলোচনা করেন। এ বিষয়ে তাঁহার দায়িত্ব লওয়ার শর্তগুলি তাঁহাদের জানান। প্রার্থনা-সভায় মুসলমানদের তাঁহার পুলিস-বেষ্টন সম্পর্কে নির্ভয় হইতে বলেন।

সাহাপুর

১৩ই জানুয়ারি সোমবার গান্ধীজী করপাড়া হইতে পদব্রজে সাহাপুর আসিয়া পৌছেন।

সকাল প্রায় সাড়ে আটটায় গান্ধীজী সাহাপুরে পৌছেন। করপাড়া হইতে সাহাপুর প্রায় ২ মাইলের পথ। গান্ধীজী ৫০ মিনিটে এই পথ অতিক্রম করেন। সাহাপুরের পথে গান্ধীজী করপাড়ার পূর্বদিকে একটি ভস্মীভূত গৃহ পরিদর্শন

করেন। এইস্থানে সেদিন এক মর্মস্পর্শী দৃশ্যের অবতারণা হয়, এক বৃদ্ধা তাঁহার ছয়মাস বয়স্ক পৌত্রকে কোলে লইয়া, কিরূপে তিনি তাঁহার স্বামী ও পুত্রকে হারাইয়াছেন, অতি করুণভাবে মহাত্মার নিকট তাহার কাহিনী বিবৃত করেন। সাশ্রুনয়নে অর্ধাবগুণ্ঠিত তাঁহার পুত্রবধূকে তাঁহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখা যায়। মহাত্মাজী সস্নেহে শিশুর গায়ে হাত বুলাইয়া দেন।

গান্ধীজীর সহিত ভ্রমণরত নোয়াখালির পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট গান্ধীজীকে বলেন, এই বৃদ্ধার স্বামী গোলাম সারওয়ার ও তাঁহার পিতা উভয়েই শিক্ষক ছিলেন এবং হাঙ্গামার সময় কোন এক বিশেষ রাজনৈতিক দলের জন্য দুই দফায় তাঁহাকে ১৭ হাজার টাকা চাঁদা দিতে হয়। দুর্বৃত্তেরা তাঁহার নিকট কিছু জিনিসপত্রও চায়। তিনি অলঙ্কার ও অন্যান্য মূল্যবান দ্রব্যাদি দুর্বৃত্তদের হাতে দিয়াছেন। কিন্তু তৎসত্ত্বেও তিনি তাঁহার জীবন রক্ষা করিতে পারিলেন না। তাঁহার ঘরেই তাঁহাকে নিহত করা হয়। পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আরও বলেন, ঐ ব্যক্তির একমাত্র পুত্রের কোন সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না।

সাহাপুরে গান্ধীজী "রাজবাড়ী" বলিয়া পরিচিত গৃহস্থবাটীতে বাস করেন। সন্ধ্যার প্রার্থনা-সভায় অনেক মুসলমান উপস্থিত ছিলেন। সাহাপুরের অধিবাসী প্রায় সবই মুসলমান, কেবল যে বাটীতে উঠিয়াছিলেন সেই বাটীর আশেপাশে মাত্র কয়েক ঘর হিন্দু বাস করে। অক্টোবরে সাহাপুর বাজারেই প্রথম ব্যাপক আক্রমণ আরম্ভ হয়। যে বাড়ীতে গান্ধীজী ছিলেন সেই বাড়ীর সহিত এক মর্মন্তুদ ঘটনার স্মৃতি জড়িত হইয়া আছে।

এই দিন গান্ধীজী মৌন ছিলেন বলিয়া তাঁহার লিখিত ভাষণ পঠিত হয়। এই ভাষণে তিনি জনশিক্ষার উপর বিশেষ জোর দিয়া বলেন—যে সকল অঘটন ঘটিয়া গিয়াছে তাহার মূলে শিক্ষার অভাব।

ভাটিয়ালপুর

১৪ই জানুয়ারি মঙ্গলবার সকালে নির্দিষ্ট সময় সাহাপুর হইতে বাহির হইয়া তিনি ভাটিয়ালপুরে পৌছেন। পথে কতকগুলি মুসলমান বাড়িতে যাহাতে গান্ধীজী যাইতে পারেন সে ব্যবস্থা পূর্বেই করা হইয়াছিল। গান্ধীজী চারটি বাড়ীতে যান। সকল স্থানেই তিনি সাদরে অভ্যথিত হন। দুই বাড়ীতে স্ত্রীলোকেরা বাড়ীর ভিতর গান্ধীজীকে লইয়া যান ও অভ্যর্থনা করেন।

অপরাহ্ণে রিলিফ এ. ডি. এম. মিঃ এ. জামান গান্ধীজীর সহিত রিলিফ সম্পর্কে আলোচনা করেন।

ভাটিয়ালপুরে যে রাস্তায় গান্ধীজীকে লওয়া হয় উহা "গোলাম সারোয়ার রোড" নামে পরিচিত। ঐ ব্যক্তি এই রাস্তা জিলা বোর্ড দ্বারা তৈয়ার করাইয়া সাহাপুর হইতে নিজ গৃহ পর্যন্ত লইয়াছে। এই রাস্তার অদূরে গান্ধীজীর থাকিবার স্থান নির্দিষ্ট হইয়াছিল।

নারায়ণপুর

১৫ই জানুয়ারি বুধবার প্রাতে শান্তি ও মৈত্রীর বাণীবাহক গান্ধীজী তাঁহার হৃদয়জয়ের অভিযানপথে আবার যাত্রা শুরু করেন। গন্তব্যস্থল নারায়ণপুরে পৌছিয়া গান্ধীজী এইবার সর্বপ্রথম মুসলমান বাটীতে মুসলমান পরিবারের আতিথ্য গ্রহণ করিলেন।

নারায়ণপুরে গান্ধীজীর বাসস্থান গ্রামের একপ্রান্তে ছিল। অল্প দূরেই গোপাইরবাগ গ্রাম—যে স্থানে অত্যন্ত শোচনীয় হত্যাকাণ্ড ও মর্মান্তিক ঘটনা ঘটিয়াছিল। নারায়ণপুরেই আবার সুরেন্দ্রবাবুর কাছারীবাড়ী ছিল। ঘটনার প্রথম দিনে সাহাপুর বাজারে জনতা সমবেত হইয়া সে স্থান হইতে আসিয়া সুরেন্দ্রবাবুর কাছারীবাড়ী আক্রমণ করে ও তাঁহার প্রাণনাশ হয় এবং তাঁহার সমস্ত বাটী পোড়াইয়া দেওয়া হয়। নারায়ণপুরে গান্ধীজীর বাসস্থান হইতে পরবর্তী গ্রাম রামদেবপুর আসিবার পথে সুরেন্দ্রবাবুর ভস্মীভূত কাছারীবাড়ী গান্ধীজী পরিদর্শন করেন।

নারায়ণপুরে গান্ধীজী বাদশা মিঞার আতিথ্যে মুগ্ধ হন এবং বলেন যে, তাঁহার জন্য যতদূর আতিথেয়তা করা সম্ভব ছিল তাহা তাঁহারা করিতে বিন্দুমাত্র ত্রুটি করেন নাই। তিনি বলেন যে, স্ত্রীলোকেরা পর্দার ভিতরে থাকেন, বাহির হন না, মিশেন না। এমন কি অল্পবয়স্কা মেয়েরাও যাহারা বাহিরে আসে তাহাদের মুখেও কথা নাই। এই অবস্থার পরিবর্তন করিতে তিনি উপদেশ দেন। গান্ধীজী মেয়েদের মুখের উপর যে আবরণ থাকে তাহা সরাইতে বলেন এবং বলেন যে, হৃদয়ের উপর যে পর্দা সেই পর্দাই খাঁটি পর্দা।

রামদেবপুর

পরবর্তী গ্রাম রামদেবপুর ও পরকোটে গান্ধীজীর আগমনের ঠিক পূর্বেই শ্রীযুক্ত সতীশ দাশগুপ্ত ও শ্রীযুক্তা হেমপ্রভা দেবী সে স্থানে গিয়া ব্যবস্থাদি করেন।

মহাত্মাজী একঘণ্টার কিছু বেশী সময়ে দীর্ঘ ৩ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া ১৬ই জানুয়ারি ৯টা ১৫ মিনিটের সময় নারায়ণপুর হইতে রামদেবপুর আসিয়া পৌছেন। হিন্দু মুসলমানের মধ্যে ঐক্য স্থাপনের উদ্দেশ্যে শ্রীকানু গান্ধী রামদেবপুরে তাঁহার প্রধান কর্মকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করিয়া সেখানে বসবাস করিতেছেন।

নারায়ণপুরে গান্ধীজী যে মুসলমান ভদ্রলোকের অতিথি ছিলেন তিনি এবং অন্যান্য কয়েকজন স্থানীয় মুসলমান, যাত্রাকালে মহাত্মাজীর জন্য গৃহের বাহিরে অপেক্ষা করিতেছিলেন। গান্ধীজী বাহিরে আসিলে, তিনি তাঁহাদের গৃহে অবস্থান করায় মুসলমানগণ তাঁহার প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। "নমস্তে"—এই বাক্য উচ্চারণ করিয়া তাঁহারা মহাত্মাজীর নিকট বিদায় গ্রহণ করেন। মহাত্মাজী মুসলমান প্রথানুযায়ী "খোদা হাফেজ" বলিয়া তাঁহাদের প্রত্যভিবাদন জানান।

রামদেবপুর যাত্রার পথে গান্ধীজী এক জমিদারের কাছারীবাড়ীতে কয়েক মিনিট অপেক্ষা করেন। অক্টোবর হাঙ্গামার সময় এখানে কয়েকটি ঘটনা ঘটিয়াছিল। কাছারীর নায়েব একজন মুসলমান। তিনি গান্ধীজীকে অভিবাদন জানাইয়া কিছু ফল উপহার দেন। গান্ধীজী তখন বলেন, "আপনাদের ভালবাসা দেন। আমি আর কিছুই চাহি না।"

রামদেবপুরে গান্ধীজী শ্রীরমণীমোহন নাথের বাড়ীতে অবস্থান করেন। রামদেবপুরে পৌছিলে শ্রীকানু গান্ধীর পরিচালনায় স্থানীয় বালকগণ গান্ধীজীকে লোকনৃত্য দেখায়।

রামদেবপুরে সান্ধ্যভ্রমণের সময় গান্ধীজী একজন মুসলমান অধিবাসীর বাটী যান। মুসলমান গৃহস্থ গান্ধীজীকে বসিবার জন্য অভ্যর্থনা করেন এবং কিছু খাদ্য গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন। তখন গান্ধীজী বলেন যে, বাদশা মিঞা তাঁহাকে এত অধিক খাওয়াইয়াছেন যে, তাঁহার আর কিছু খাইতে ইচ্ছা হইতেছে না।

রামদেবপুরে প্রার্থনা-সভায় গান্ধীজী এক মুসলমান বন্ধুর প্রশ্নের উত্তরে ঘোষণা করেন যে, হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ঐক্য স্থাপনের প্রয়াস এবং

আসামবাসী, পাঞ্জাবের শিখ এবং সীমান্তবাসী অথবা তাহাদের সমমনোভাবাপন্ন অন্যান্যকে গণপরিষদের বিভাগে যোগ না দিবার উপদেশ-সংক্রান্ত বিষয়ে কোনরূপ স্ববিরোধিতা নাই।

গান্ধীজী আরও বলেন যে, কয়েকটি প্রদেশ বিভাগে যোগদানে ইচ্ছুক না হইলেও অন্যান্য বিষয়ে সুফল লাভের আশা থাকিলে গণপরিষদে কার্যক্রম ব্যাহত হওয়া উচিত নহে। আসামের ইচ্ছার বিরুদ্ধে উহাকে কেন বাংলার প্রভাবাধীন করা হইবে? সীমান্ত প্রদেশ, পাঞ্জাবের শিখ বা সিন্ধুর উপরই বা কেন অন্যের ইচ্ছা চাপাইয়া দেওয়া হইবে? যাহাতে বিরুদ্ধবাদী প্রদেশসমূহের নিকট আকর্ষণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয় অথবা তাহাদের প্রাণে সাড়া জাগে, এইরূপভাবে কংগ্রেস ও লীগকে স্ব স্ব ক্ষেত্রে নিজস্ব নীতি ও কর্মসূচী রচনা করিতে হইবে।

পরকোট

১৭ই জানুয়ারি গান্ধীজী পরকোটে পৌছিলে গ্রামবাসীরা আনন্দে অভ্যর্থনা জানায়। পথঘাট পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ছিল, বাড়ীগুলি সাজানো হইয়াছিল। শান্তির মধ্যে এখানে দিনটি কাটে। মহিলা-সভা হয় এবং গ্রামসেবকরাও গান্ধীজীর উপদেশ গ্রহণ করে। অপরাহ্নে প্রার্থনা-সভা হয়। প্রার্থনা-সভার স্থান বাসবাটী হইতে অনেক দূরে এক মাঠে করা হইয়াছিল—যাহাতে পার্শ্ববর্তী গ্রামের লোকেরাও যোগ দিতে পারে। প্রার্থনা-সভায় মুসলমানেরাও অধিক সংখ্যায় উপস্থিত হইয়াছিলেন।

এইদিন ৪২ জন গ্রামস্বেচ্ছাসেবক গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাৎ করে। গান্ধীজী তাহাদের বলেন, আঘাতের পরিবর্তে আঘাত করা চলে কিন্তু তাহার দ্বারা সমস্যার সমাধান হইবে না। তোমরা অহিংস থাক এবং অন্তরে শঙ্কা পোষণ করিও না। তোমাদের প্রত্যেকে যদি মন হইতে শঙ্কা দূর করিতে পার, তাহা হইলে তোমাদের এই ৪২ জন ৪,২০০ জনের মনকে শক্তিশালী করিয়া তুলিবে।

সান্ধ্য প্রার্থনা-সভায় বহু মুসলমান আসিয়াছিলেন। গান্ধীজী মিঃ জিন্নার একটি বক্তৃতার কিয়দংশ পড়িয়া শুনান। জিন্না সাহেব করাচীতে তাঁহার ভগিনী মিস ফতিমা জিন্না কর্তৃক একটি বালিকা বিদ্যালয়ের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে উক্ত বক্তৃতা করিয়াছিলেন। মিঃ জিন্না নাকি বলিয়াছিলেন যে, ভুলের অনুকরণ করা উচিত নহে। যে কোন প্রকার প্রভাব অথবা সিদ্ধান্ত

থাকুক না কেন যদি কাহারও বিবেকে পূর্ব-পরিকল্পিত কার্য ভুল বলিয়া প্রতিভাত হয়, তবে তাহা কাহারও কদাচ করা উচিত নহে। লোকেরা এরূপভাবে কার্য করিলে পাকিস্তান অর্জনের পথে কেহই কোন বাধার সৃষ্টি করিতে পারিবে না।

গান্ধীজী বলেন যে, অন্তর্নিহিত গুণাবলীর দ্বারা যদি পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে যে নামেই অভিহিত হউক না কেন, প্রত্যেকেই সেরূপ রাষ্ট্র সাদরে গ্রহণ করিবে। এই প্রকার পাকিস্তানে কেবল মুসলমানেরাই থাকিতে পারিবে, হিন্দুরা থাকিতে পারিবে না, এমন কথা তো জিন্না সাহেব বলেন নাই।

পরকোটে মহিলা-সভায় অনেক স্ত্রীলোক আসেন। তাঁহাদের সম্বন্ধে গান্ধীজী এই ইচ্ছা প্রকাশ করেন যে, তাঁহারা যেন মুসলমান ভাইভগিনীদের সহিত মেলামেশা করেন।

বদলকোট

১৮ই জানুয়ারি গান্ধীজী বদলকোটে দিনযাপন করেন। যাইতে যাইতে রাস্তায় একস্থানে তাঁহার পায়ে কাঁটা বিঁধে। ধানক্ষেতের মধ্য দিয়া পথ ছিল। বদলকোটে যাইবার পথে গান্ধীজী সাংবাদিকদের সহিত কথাবার্তা-কালে বলেন, "এখানে আমার উদ্দেশ্য যদি ব্যর্থ হয়, তাহা হইলেও তাহাকে অহিংস নীতির ব্যর্থতা বলা যাইবে না। উহা হইবে আমার অনুসৃত অহিংস নীতির ব্যর্থতা।"

গান্ধীজী বলেন যে, নোয়াখালিতে তিনি তাঁহার অহিংস নীতির পরীক্ষা করিতেছেন। বদলকোটের জনৈক মুসলমান গান্ধীজীকে বলেন যে, গান্ধীজী ও জিন্নাসাহেবের মধ্যে মীমাংসা হইলে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে। মহাত্মা গান্ধী তাঁহার এই প্রস্তাবের উত্তরে বলেন, "আমি মহান শক্তির অধিকারী—এইরূপ কোনো ভ্রান্তি আমার মনে নাই।"

মহাত্মা গান্ধী বদলকোটে প্রার্থনা-সভায় বলেন, প্রার্থনার কিছু পূর্বে তিনি জনৈক মুসলমান ভদ্রলোকের গৃহে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়াছিলেন। সেই মুসলমান ভদ্রলোক তাঁহার নিকটে আসিয়া বলেন, মিঃ জিন্না ও মহাত্মা গান্ধীর মধ্যে একটা মীমাংসা হইলে, আমাদের দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। মহাত্মা গান্ধী এই প্রস্তাবের উত্তরে বলেন, তাঁহার মনে কোন ভ্রান্ত ধারণা নাই

অথবা তিনি আপনাকে মহান শক্তির অধিকারী বলিয়া মনে করেন না। লোকে জানে তিনি বহুবার মিঃ জিন্নার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন। এই সাক্ষাতের কোন ফল ঘটিয়া না থাকিলেও তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে আন্তরিক সৌহার্দ্য আছে।

মহাত্মা গান্ধী আরও বলেন যে, আসল কথা হইল এই অনুগামীরাই নেতাকে গড়িয়া তোলেন। তাঁহারা জনসাধারণের সুপ্ত আশা-আকাজ্ক্ষা ও অনুপ্রেরণা সুস্পষ্টভাবে দেখিতে পান। ইহা শুধু ভারতের পক্ষে কেন, সারা জগতের ক্ষেত্রেও সত্য। অতএব, তিনিও মুসলমানদিগকে এই কথাই বলিতে চাহেন যে, দৈনন্দিন জীবনধারণ-সমস্যার সমাধানকল্পে তাঁহারা যেন মুসলিম লীগ, কংগ্রেস অথবা হিন্দুমহাসভার দ্বারস্থ না হন। তাঁহাদিগকে নিজেদের প্রতিই মনোযোগী হইতে হইবে। তাঁহারা যদি এইরূপ করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের প্রতিবেশীদের মধ্যে শান্তিস্থাপনের ইচ্ছা নেতাদের চিত্তেও প্রতিভাত হইবে। বিশেষ করিয়া রাজনৈতিক সমস্যার সমাধানের জন্য রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে ছাড়িয়া দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু মানুষের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রা সম্বন্ধে তাহারা কতটা জানে? যদি প্রতিবেশী পীড়িত হইয়া পড়ে, তবে ইতিকর্তব্য সম্বন্ধে কি কংগ্রেস অথবা লীগের নিকট দৌড়াইতে হইবে? ইহা ভাবিতেই পারা যায় না।

আতাখোরা

রবিবার ৮টা ৪০ মিনিটে মহাত্মাজী তাঁহার পল্লীপরিক্রমার চতুর্দশ গ্রাম আতাখোরায় আসিয়া পৌছেন। তিনি ভোর সাড়ে ৭টায় বদলকোট হইতে রওনা হইয়া এক ঘণ্টা ৪০ মিনিটে প্রায় ৩ মাইল পথ অতিক্রম করেন। পথিমধ্যে এক মক্তবের পাশে গান্ধীজী কিছুক্ষণ অপেক্ষা করেন। মক্তবের বালকবালিকারা সে সময় কোরান পাঠ করিতেছিল। একসাথে হঠাৎ কতকগুলি অপরিচিত লোক সম্মুখে দেখিয়া তাহারা প্রথমতঃ থতমত খাইয়া পাঠ বন্ধ করিয়া ফেলে। গান্ধীজী তাহাদের কোরান পাঠ শুনিবার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিলে, মৌলভী সাহেবের অনুরোধক্রমে তাহারা পুনরায় পাঠ আরম্ভ করে। গান্ধীজী প্রায় ১০ মিনিট দাঁড়াইয়া তাহাদের কোরানপাঠ শ্রবণ করেন।

এইদিন গান্ধীজীর গমনপথ এত শিশিরসিক্ত ও পিচ্ছিল ছিল যে সর্দার জীবন

সিংহ দুইবার পড়িয়া যান। তাঁহার ৬ ফুট দীর্ঘ দেহ আছাড় খাইয়া পড়িতে দেখিয়া সকলেই উচ্চহাস্য করিয়া উঠেন। গান্ধীজী নিজেও হাসিয়া উঠেন এবং তাঁহার লম্বা বাঁশের লাঠি সর্দারজীর দিকে আগাইয়া দিয়া বলেন, "সর্দারজী, আমার এই লাঠি ধরিয়া চলুন।" সর্দারজী লজ্জায় দ্বিধাগ্রস্ত হইয়া পড়েন, কিন্তু গান্ধীজীর অনুরোধও ফেলিতে পারেন না। অগত্যা গান্ধীজীর লাঠি ধরিয়াই চলিতে থাকেন।

আতাখোরায় প্রার্থনা-সভায় মহাত্মাজী তাঁহার লিখিত ভাষণে বলেন, কতিপয় মুসলমান তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, শিরণ্ডী গ্রামে যে মুসলমান মহিলা অনশন করিতেছেন ইনি কে? মহাত্মা বলেন, আমতুস সালাম, বহুকাল তাঁহার নিকট আছেন। তিনি একজন প্রকৃত মুসলমান। তাঁহার সহিত সর্বদাই কোরানশরিফ থাকে। তিনি অধিকাংশ সময় কোরানপাঠ ও রমজান উদযাপনে অতিবাহিত করেন। তিনি গীতাও পাঠ করিয়া থাকেন।

আমতুস সালামের বংশপরিচয় উল্লেখ করিয়া মহাত্মাজী বলেন, "কিন্তু এই মহাপ্রাণ মহিলা হিন্দু-মুসলমানের মিলনের জন্য আজ মৃত্যুপথযাত্রী।" আমতুস সালামের প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হউক—তিনি এই প্রার্থনা করেন।

আতাখোরায় থাকাকালীন চট্টগ্রাম হইতে এক ডেপুটেশন গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া হিন্দুদের একত্র মণ্ডলী করিয়া বসবাস সম্পর্কে তাঁহার মতামত জানিতে চাহেন। তিনি কিছুক্ষণ কথা কহিয়া এ বিষয়ে পূর্বে যাহা বলিয়াছেন তাহা জানাইবার জন্য নির্মলবাবুকে বলিলে তিনি উহা তাঁহাদিগকে দেন। গান্ধীজী পূর্বাপর এই কথাই বলিয়া আসিতেছেন যে, বিশেষ করিয়া মণ্ডলীবদ্ধ ভাবে বাস করিবার কল্পনার মূলে এই স্বীকৃতি আছে যে, অনেক মুসলমানের মধ্যে অল্প হিন্দু নিরাপদে ও স্বাধীনভাবে বাস করিতে পারে না। এই স্বীকৃতির পর পৃথক পৃথক থাকিবার স্থান ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা দ্বারা এই যুধ্যমান সম্প্রদায়দ্বয় বরাবর দাঁড়াইয়া থাকিবে ও লড়াই করিবে এবং দ্বন্দ্ব চলিতে থাকিবে। ইহাতে সমস্যার সমাধান নাই। সমাধান হইতে পারে এমন অবস্থার সৃষ্টি করিলে যাহাতে সংখ্যাগরিষ্ঠের বহুসংখ্যক লোকের মধ্যে একজন মাত্র সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকও নির্বিঘ্নে ও শান্তিতে বাস করিতে পারে। গান্ধীজী তাহাই ঘটাইবার জন্য প্রাণপণ করিতেছেন।

শিরণ্ডী

২০শে জানুয়ারি সোমবার—গান্ধীজী নির্দিষ্ট সময়েই আতাখোরা হইতে শিরণ্ডী পৌঁছেন।

শিরণ্ডীতে পৌঁছিলে গান্ধীজীর সহিত স্থানীয় মুসলমান নেতাদের আলোচনা হয়। তাঁহারা বলেন যে, আমতুস সালামের অনশন সমাপ্তি তাঁহারা চাহেন এবং এজন্য যাহা করিতে বলেন, যে প্রতিশ্রুতি আবশ্যক তাহাই দিতে তাঁহারা প্রস্তুত আছেন। যদিও একটা খড়্গ ফিরাইয়া পাওয়ার জন্য এই অনশন, তথাপি এই অনশনের মূলে রহিয়াছে হিন্দু-মুসলমান ঐক্য এবং তাহা সম্পাদিত হইতে পারে যদি মুসলমানেরা হিন্দুদের নিজ নিজ ধর্মাচরণে স্বাধীনতা আছে ইহা কার্যতঃ স্বীকার করেন। স্থানীয় মুসলমানগণ লিখিত প্রতিশ্রুতি দেন। তাঁহাদের স্বাক্ষরযুক্ত প্রতিজ্ঞা যাহাতে ঠিক থাকে এইজন্য গান্ধীজী এই শর্ত দেন যে, স্বাক্ষরকারিগণ জ্ঞানপূর্বক প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিলে তাঁহাদিগকে তাঁহার (গান্ধীজীর) অনশনের সম্মুখীন হইতে হইবে। অতঃপর তাঁহারা উহা স্বীকার করেন এবং তাহার পর রাত্রি ৯টায় অনশন ভঙ্গ হয়।

শিরণ্ডীতে অনশন সমাপ্তি সম্পর্কে,—৪৫টি গ্রামের মুসলমান নেতাদের সহিত সাম্প্রদায়িক ঐক্য প্রতিষ্ঠার ভিত্তি স্থাপিত হয়। শিরণ্ডীতেও এই নেতাদের কয়েকজন গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাৎ করেন। ভবিষ্যতে কি ব্যবস্থা করিলে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে অবিশ্বাস দূর করিয়া আত্মীয়তা ও মৈত্রীভাব প্রতিষ্ঠা করিতে পারা যায় সেই সম্পর্কে আলোচনা হয়। গান্ধীজী এই অভিমত পোষণ করেন যে, ছোটখাটো ব্যাপারেও হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে মতানৈক্য উপস্থিত হইলে তাহা নিরপেক্ষ বিচারক বা বিচারসভার নিকট হাজির করা প্রয়োজন। এই নিরপেক্ষ বিচারক এক ব্যক্তি হইতে পারেন বা একাধিকও হইতে পারেন। বিচারক বা বিচারকগণ কোন্ সম্প্রদায়ের সে প্রশ্নই থাকিবে না। যাঁহারা ন্যায়নিষ্ঠ, যাঁহাদের চরিত্রের উপর লোকের শ্রদ্ধা আছে, তাঁহারাই এই বিচারক যেন নির্বাচিত হন। একমাত্র দ্রষ্টব্য হইবে তাঁহার চরিত্র। আর একটি কথার উপর গান্ধীজী জোর দেন, অন্যায় সহ্য করিয়া এবং দুর্বলতা-প্রসূত যে আপোষ হয় তাহা আপোষ নহে। উহার ফল স্থায়ী হইতে পারে না। (শান্তিমিশন দিনলিপি, কাজিরখিল, ২২শে জানুয়ারি)। শিরণ্ডীর প্রার্থনা-সভাতেও গান্ধীজী এই বিষয়ে আলোচনা করেন।

সাম্প্রদায়িক ঐক্য-প্রতিষ্ঠার কথা-প্রসঙ্গে কেথুরীতে একটা পুকুর লইয়া যে,

বিরোধ চলিতেছিল এখানে সে কথাও উঠে। এই পুকুর লইয়া উভয় সম্প্রদায়ই মনে করিতেছেন যে, অন্য সম্প্রদায় অন্যায় করিয়া স্বত্ব নষ্ট করিতেছে। গান্ধীজী এই ব্যাপারটি কোনও নিরপেক্ষ বিচারকের হাতে ছাড়িয়া দিতে বলেন। ব্যাপারটি পূর্বেই পুলিসের হাতে চলিয়া গিয়াছিল। তথাপি এখনও নিরপেক্ষ বিচারকের নির্দেশ মানিলে ব্যাপারটির মীমাংসা হইবে বলিয়া প্রভাবসম্পন্ন স্থানীয় লোকেরা মত প্রকাশ করিতেছিলেন। এইরূপ করাই স্থির হইয়াছিল। হিন্দু ও মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের লোকের পরস্পরের মনে যে সন্দেহ ও অবিশ্বাস ঢুকিয়াছে তাহা দূর করিবার জন্য গান্ধীজী অতি সন্তর্পণে সকলের মন বুঝিয়া অতি বিচক্ষণ চিকিৎসকের মত বিধিব্যবস্থার নির্দেশ দিতেছিলেন। হাঙ্গামার পূর্বে নোয়াখালির হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে সৌহার্দ্য ও মৈত্রীর সম্পর্ক ছিল এবং তাহারা বহুকাল যাবৎ পরস্পর ভ্রাতৃভাবে পাশাপাশি বাস করিয়া আসিতেছে। তবে হঠাৎ এরূপ হইল কেন? এই প্রশ্ন সম্পর্কে রামগঞ্জ থানা লীগের সেক্রেটারী মিঃ এম. এ. রসিদের সহিত সুদীর্ঘ আলোচনা হয়। তিনি হাঙ্গামার সময় নোয়াখালির বাহিরে ছিলেন। তিনি বলেন যে, পূর্ববঙ্গের মুসলমানদের অজ্ঞতার সুযোগ লইয়া কতকগুলি লোক তাহাদের প্ররোচিত করিয়াছিল। এস্থানে মুসলমানেরা শতকরা দশজনের বেশী শিক্ষিত নহে। তাহারাও আবার অধিকাংশ কর্মোপলক্ষে গ্রামের বাহিরে থাকে। অবশ্য ইহা ঠিক যে, তাহারা অশিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত হইলেও অবুঝ নহে। কোন্‌টা ভাল কোন্‌টা মন্দ তাহাদের বুঝাইলে তাহারা ভালটা গ্রহণ এবং মন্দটা বর্জন করিতে জানে। আমি প্রশ্ন করিলাম, তাহা হইলে তাহাদের কাজের দায়িত্ব সে মন্দ হউক, আর ভালই হউক, সে তো আপনাদের ঘাড়েই আসিয়া পড়িতেছে, যেহেতু কোন্‌টা তাদের পক্ষে কল্যাণকর, কোন্‌টা ক্ষতিকর আপনাদেরই কর্তব্য তাহাদের তাহা বুঝান। কারণ শিক্ষিত বলিতে আপনাদেরই তো বুঝায়। উত্তরে তিনি নোয়াখালিতে যাহা ঘটিয়াছে তাহাতে দুঃখপ্রকাশ করিয়া বলেন যে, তাঁহাদের শিক্ষিত লোকের সহিত গ্রামবাসীদের যোগাযোগ সেরূপ নাই। কারণ গ্রামের শিক্ষিত মুসলমানেরা প্রায় সকলেই শহরে বাস করেন। আমতুস সালামের অনশনভঙ্গের শর্তাবলী সম্পর্কে তাঁহার মতামত জানিতে চাহিলে তিনি বলেন যে, নোয়াখালির অধিবাসী হিসাবে প্রতিবেশী হিন্দু ও মুসলমান উভয়েরই স্বার্থের অনুকূলে মতামত জ্ঞাপন করিবার পূর্ণ স্বাধীনতা আছে বলিয়াই তিনি মনে করেন। মুসলমানেরা যাহাতে

হিন্দুদের ধর্মাচরণে ব্যাঘাত সৃষ্টি না করেন এবং উভয়ে যাহাতে পরস্পর ভ্রাতৃভাব বজায় রাখিয়া পূর্বের ন্যায়. স্বচ্ছহৃদয়ে পাশাপাশি বাস করিতে পারেন এরূপ প্রতিশ্রুতি দিয়া তিনি প্রতিবেশীর ধর্ম পালন করিয়াছেন বলিয়া মত প্রকাশ করেন।

কেথুরী

গান্ধীজী ২১শে জানুয়ারি মঙ্গলবার প্রাতে শিরণ্ডী হইতে যাত্রা করিয়া সওয়া ৮টার সময় কেথুরীতে পৌছেন। পথে তিনি পূর্বভাণ্ডার ও রাজারাম-পুর নামে দুইটি ক্ষুদ্র পল্লী অতিক্রম করেন। কেথুরীতে শ্রীমণীন্দ্রনাথ দের বাটীতে গান্ধীজীর থাকিবার স্থান নির্দিষ্ট হইয়াছিল।

শিরণ্ডী ত্যাগ করিবার প্রাক্কালে স্থানীয় দুইজন মুসলমান নেতা গান্ধীজীর সহিত দেখা করেন। কেথুরী যাইবার পথে স্থানীয় প্রতিপত্তিশালী নেতা মৌলানা আনওয়ার উল্লাও গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ঐ অঞ্চলে শান্তি-প্রতিষ্ঠার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দেন।

গান্ধীজীর বাসস্থানের অতি নিকটেই কেথুরীর প্রসিদ্ধ "ঠাকুরবাড়ীর" ধ্বংসাবশেষ পড়িয়াছিল। এই ঠাকুরবাড়ীর বহু পরিবারের প্রায় একশত-খানি ঘর ভস্মীভূত করা হইয়াছে। পল্লী-পরিক্রমার পথে এতখানি স্থান জুড়িয়া এইরূপ ভীষণ ধ্বংসলীলা খুব কমই চোখে পড়িয়াছে। এই ঠাকুরবাড়ীর ধ্বংসাবশেষের সম্মুখেই গান্ধীজীর সান্ধ্য-প্রার্থনা অনুষ্ঠিত হয়। মুসলমান খুব অল্পসংখ্যকই সেদিন সভায় উপস্থিত ছিলেন।

আমতুস সালামের অনশনের কারণ বিশ্লেষণ

কেথুরী গ্রামে প্রার্থনা-সভার শেষে গান্ধীজী সমবেত জনতাকে কুমারী আমতুস সালামের অনশন করার এবং শেষে উহা ভঙ্গের কারণ বুঝাইয়া বলেন। গান্ধীজী বলেন, শিরণ্ডী গ্রামের মুসলমান মাতব্বররা আমতুসকে প্রতিশ্রুতি দেওয়াতেই তিনি অনশন ত্যাগ করিয়াছেন। কিন্তু গ্রামের মুসলমান মাতব্বররা যদি ইচ্ছা করিয়া তাঁহাদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন, তাহা হইলে শেষ পর্যন্ত তিনিই (গান্ধীজী) অনশন করিতে বাধ্য হইবেন।

মহাত্মা গান্ধী বলেন যে, কুমারী আমতুস সালাম যে খড়্গটি উপলক্ষ করিয়া অনশন আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহার উদ্দেশ্য শুধু ঐ খড়্গ ফিরাইয়া দিবার

দাবিই নহে, উহার আরও একটা বড় উদ্দেশ্য হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে ঐক্য-স্থাপন। কুমারী আমতুস কিভাবে তাঁহার জীবনপণ করিয়া কাজ করিতেছেন তাহার উল্লেখ করিয়া গান্ধীজী বলেন, শিরণ্ডি গ্রামের মাতব্বররা একত্র হইয়া নিজেদের মধ্যে বিশদভাবে আলোচনার পর একটা চুক্তিপত্র সহি করিয়াছেন। এই চুক্তিপত্রে স্বাক্ষরকারী প্রত্যেক মুসলমান মাতব্বরকেই এই কথা মনে রাখিতে হইবে যে, প্রত্যেকের নিকট নিজ ধর্ম যেমন প্রিয়, অপরের নিকটও তাহার ধর্ম তেমনই প্রিয়। কাজেই, প্রত্যেক ধর্মকেই সমান শ্রদ্ধা করিতে হইবে। এই চুক্তিপত্রের স্বাক্ষরকারীরা এই কথা মানিবেন বলিয়াই প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। এই প্রতিশ্রুতির কথা কুমারী আমতুসকে জানাইবার পর তিনি অনশন ত্যাগ করেন। মহাত্মাজীও ঐ চুক্তিপত্রের স্বাক্ষরকারীদের এই বলিয়া আশ্বাস দেন যে, তিনি তাঁহার সাধ্যমত প্রত্যেক সম্প্রদায়ের ন্যায়-সঙ্গত অধিকার যাহাতে রক্ষা হয় তাহার জন্য চেষ্টা করিবেন।

পাণিয়ালা

২২শে জানুয়ারি বুধবার সকাল ৯টার সময় গান্ধীজী তাঁহার পল্লী-পরিক্রমার পথে সপ্তদশ গ্রাম পাণিয়ালা আসিয়া পৌছেন। পাণিয়ালায় গান্ধীজী অক্টোবরের হাঙ্গামায় ভস্মীভূত একটি গৃহের ভিটায় নবনির্মিত গৃহে অবস্থান করেন। ঐ বাড়ীর দুইজন লোক হাঙ্গামায় নিহত হইয়াছেন।

শ্রীমতী আভা গান্ধীর পিতা শ্রীযুক্ত অমৃতলাল চ্যাটার্জী কেথুরি হইতে গান্ধীজীর অনুগমন করেন এবং তাঁহার সহিত পাণিয়ালা আসেন। পাণিয়ালা শ্রীযুক্ত অমৃতলাল চ্যাটার্জীর প্রধান কর্মকেন্দ্র। তিনি পার্শ্ববর্তী ২২টি গ্রাম লইয়া কাজ করিতেছেন। তাঁহার নিকট শুনিলাম, পাণিয়ালার হিন্দুরা প্রায় সকলেই পুনরায় গ্রামে ফিরিয়াছে। স্থানীয় হিন্দু অধিবাসীদের সহিত কথাবার্তা বলিয়া দেখিলাম তখনও গ্রামে বসবাস করিবার মত অবস্থা ফিরিয়া আসিয়াছে বলিয়া তাঁহারা বিশ্বাস করেন না। তাঁহাদের মধ্যে অনেকে বলেন যে, গান্ধীজীর আগমন উপলক্ষেই তাঁহারা গ্রামে ফিরিয়াছেন।

সান্ধ্য-প্রার্থনা-সভায় বহুলোক সমাগম হয়। উপস্থিত স্ত্রীলোকদের সংখ্যাও এক হাজারের কম হইবে না। পুরুষদের মধ্যে মুসলমানদের সংখ্যা অর্ধেক হইবে। পাণিয়ালা ও পার্শ্ববর্তী গ্রাম হইতে সেদিন প্রায় ৫ হাজার লোক সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন।

সভা আরম্ভ হইতে টিপ্ টিপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতে থাকে। কিছুক্ষণের মধ্যে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন করিয়া মুষলধারে বৃষ্টি নামে। সভার কাজ বৃষ্টির মধ্যেও অপ্রতিহত ভাবে চলিতে থাকে। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকই বৃষ্টিতে স্নান করিয়াও শেষ পর্যন্ত সভা ত্যাগ করে নাই।

স্থানীয় মুসলমান মাতব্বররা গান্ধীজীকে ৭টি প্রশ্ন করেন এবং গান্ধীজী সভায় সব কয়টি প্রশ্নেরই উত্তর দেন।

প্রথম প্রশ্নে বলা হয় যে, পাকিস্তান সম্পর্কে গান্ধীজীর ধারণা কি এবং পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ গঠনই বা কেমন হইবে? তদুত্তরে গান্ধীজী বলেন যে, তিনি বিগত ২৫ বৎসর যাবৎ এই ধারণা লইয়াই কাজ করিয়া আসিতেছেন যে, যদি কোন প্রদেশ কিংবা কোন গ্রাম অথবা কোন ব্যক্তি বন্ধনমুক্ত হইতে চায় এবং লক্ষ্যে পৌছিবার জন্য যদি দৃঢ়সঙ্কল্প লইয়া অগ্রসর হয় তবে সাফল্য অনিবার্য। যদি বাংলা অথবা অপর কোন প্রদেশ বাহিরের শাসন হইতে মুক্তি-লাভের জন্য নিজেদের মধ্যে ভ্রাতৃভাব বজায় রাখিয়া সম্মিলিতভাবে কাজ করে, তবে কেহই তাহাকে স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত করিতে পারিবে না।

পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে গান্ধীজী কায়েদ আজম জিন্নার করাচীতে একটি মাদ্রাসার উদ্বোধনী বক্তৃতার উল্লেখ করিয়া বলেন যে, যদি গুণাবলীর উপর ভিত্তি করিয়াই কোন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে তাহার নাম পাকিস্তানই হউক অথবা অন্য কোন কিছুই হউক, কেহই তাহাতে আপত্তি করিবে না। যদি মুসলমানগণ মনে করেন যে, তাঁহাদের বাঞ্ছিত পাকিস্তানে মুসলমান ভিন্ন অন্য কাহারও বসবাসের অধিকার থাকিবে না, তবে তাহা ইসলামের নীতি-বিরুদ্ধ হইবে। পরধর্ম-সহিষ্ণুতা ও গণতন্ত্র ইসলামের মৌলিক নীতি। যদি কোন ব্যক্তি, সে হিন্দুই হউক কিংবা মুসলমানই হউক অথবা খ্রীষ্টানই হউক, অন্যের ধর্মে আঘাত দেয় তবে সে নিজেই পতিত হইবে—ধর্ম পতিত হইবে না।

দ্বিতীয় প্রশ্নে বলা হয় যে, বিহারে গান্ধীজীর অহিংসা-নীতি কতখানি কার্যকরী হইয়াছে? তদুত্তরে গান্ধীজী বলেন যে, যদিও দাঙ্গার সময় বিহারে তাঁহার অহিংসা-নীতি সাময়িক ভাবে বিফল হইয়াছিল কিন্তু দাঙ্গার পরে অবস্থা তদ্রূপ ছিল না। গান্ধীজী বলেন যে, বিহারের শোচনীয় ঘটনাবলীর অব্যবহিত পরেই তিনি বিহার সরকারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পত্রালাপ করিয়াছিলেন। বিহারে যাহা ঘটিয়াছে তাহার জন্য বিহার সরকার বাস্তবিকই অনুতপ্ত। তাহারা

নিজেদের দায়িত্ব এড়াইতে চেষ্টা করেন নাই। একজন মন্ত্রী নোয়াখালি আসিয়া তাঁহাকে বিহার সরকারের পক্ষ হইতে এই প্রতিশ্রুতি দিয়া গিয়াছেন যে, বিহার সরকার উদ্বাস্তুদের পুনঃসংস্থাপনের কোন ত্রুটি করিবেন না। তিনি বিহার সরকারকে হাঙ্গামা সম্পর্কে নিরপেক্ষ তদন্তের ব্যবস্থা করিতে পরামর্শ দিয়াছেন এবং বিহার সরকার তদন্ত কমিশনের রায় পুরাপুরি ভাবে মানিয়া লইবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন।

সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার কারণ সম্পর্কে আর একটি প্রশ্নের উত্তরে গান্ধীজী বলেন যে, একদল হিন্দু ও মুসলমানের উন্মত্ততার জন্যই সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা হইয়া থাকে।

যদি এক পক্ষ অহিংস থাকে তবে কোন হাঙ্গামা হইতে পারে না। দাঙ্গার সময় চক্ষুর বদলে চক্ষু, দাঁতের বদলে দাঁত লইবার নীতি অনুসৃত হইয়া থাকে। বোম্বাই ও অন্যান্য অঞ্চলের সাম্প্রতিক দাঙ্গায় তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। হিন্দুকে হত্যা করা হইলে তৎক্ষণাৎ আর একজন মুসলমানকে হত্যা করা হয়। আবার একজন মুসলমানকে হত্যা করা হইলে আর একজন হিন্দুর জীবনান্ত ঘটে। ইহাকে উন্মত্ততা ভিন্ন আর কিছু বলা যাইতে পারে না।

অতঃপর তিনি বলেন, আমরা একই মাটির সন্তান। আমার এক ভাই যদি আমাকে খারাপ কাজ করিতে প্ররোচিত করে তবে সেই প্ররোচনার কাছে আমি কেন আত্মসমর্পণ করিব? যদি কেহ অপরকে জোর করিয়া ধর্মান্তরিত করিতে চেষ্টা করে অথবা কোন স্ত্রীলোকের উপর অত্যাচার করিতে অগ্রসর হয়, তবে আক্রান্ত ব্যক্তি অথবা নারী পশুশক্তির কাছে কেন নতি স্বীকার করিবে? যদি আক্রান্ত ব্যক্তি পশুশক্তি প্রতিরোধের জন্য অহিংস ভাবে মৃত্যুবরণ করে তবে অত্যাচারী বেশীক্ষণ অত্যাচার চালাইতে পারে না। প্রতিশোধ গ্রহণ করিয়া প্রতিকার করা চলে না। কেবলমাত্র অহিংসাই সাম্প্রদায়িক উন্মত্ততার প্রতিকার করিতে পারে।

আসাম সরকারের উচ্ছেদ-নীতি সম্পর্কে একটি প্রশ্নের উত্তরে গান্ধীজী বলেন যে, ময়মনসিংহ হইতে যে সকল লোক আসামে বসবাস করিতে যায় তাহাদের উদ্দেশ্য ভাল হইতে পারে। কিন্তু আসাম প্রবেশের পূর্বে তাহাদের সরকারের নিকট হইতে প্রয়োজনীয় অনুমতি লওয়া উচিত।

ময়মনসিংহের লোকেরা আসাম যাইয়া স্বীয় চেষ্টায় বন-জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া অনাবাদী ভূমি কৃষিক্ষেত্রে পরিণত করিয়াছে এই কথা সত্য। কিন্তু

বাহিরের লোকেরা আসিয়া মালিকদের অনুমতি না লইয়া অপরিষ্কার পুকুরগুলি যদি সাফ করিয়া দখল করিয়া বসে, তবে তাহাদের কাজ যত ভালই হউক তাহারা অন্যায় করিবে। বহিরাগতগণ যদি আসাম সরকারের অনুমতি লইয়া আসামে প্রবেশ করিত, তবে তিনি তাহাদের কাজ সমর্থন করিতেন।

দালতা

২৩শে জানুয়ারি বৃহস্পতিবার গান্ধীজী পাণিয়ালার পরবর্তী গ্রাম দালতাতে অবস্থান করেন। পাণিয়ালা আসিবার সঙ্গে সঙ্গে নোয়াখালির অভ্যন্তরে গান্ধীজীর প্রায় একশত মাইল ভ্রমণ সমাপ্ত হইল। নোয়াখালির মধ্যভাগ হইতে যাত্রা করিয়া গান্ধীজী এখন ত্রিপুরার সীমান্তে পৌছিয়াছেন। এই স্থান হইতে পুনরায় তিনি নোয়াখালির অভ্যন্তরে যাত্রা করিবেন। দালতার তখনকার অবস্থা সম্পর্কে 'শান্তিমিশন দিনলিপি'র ২৪শে জানুয়ারি সংখ্যায় বলা হয়, "দালতার সংখ্যালঘিষ্ঠদের গৃহদাহ, ধর্মান্তর ও লুণ্ঠন ইত্যাদি হয়। এক পরিবারের একটি ইষ্টকনির্মিত মঠ দিনের বেলাতেই ভাঙ্গিয়া ফেলা হয়। প্রকাশ্যে এই কাজ হয় এবং উদ্যোক্তারাও সুপরিচিত। আবার তাহাদের মধ্যে থাকিয়া যেন কিছুই হয় নাই এইভাবে সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায় বাস করিতেছিল। তখন কোন দুষ্কৃতকারীর উপস্থিতিতে হাঙ্গামার আলোচনাকালে সংখ্যালঘিষ্ঠরা মনে করিত যে, বিরুদ্ধে কিছু বলিলেই বিপদ। বলিত 'ইনিই তো রক্ষা করিয়াছেন'। ক্রমশঃ অন্য স্থানের মত এই স্থানেও অল্প অল্প করিয়া ভয় অপসৃত হইতেছে। একবার আমরা কয়েকজন যাওয়ার পর সংখ্যালঘিষ্ঠদের এই ভীতিভাব কিছু কমার সহায়ক হয়।"

দালতা গ্রামে নলকূপ নাই বলিয়া একটি ভাল পুকুর কিছুকাল পূর্ব হইতে পানীয় জলের জন্য আলাদা করিয়া রাখা হইয়াছিল। একটি ফিল্টার-যন্ত্র এইদিন গান্ধী-পার্টিকে দেওয়া হয় যাহাতে ফিল্টার-করা জলই তাঁহারা ব্যবহার করিতে পারেন।

এইদিন নেতাজী সুভাষচন্দ্রের জন্মদিন ছিল। গান্ধীজী প্রার্থনা-সভায় নেতাজীর জন্মদিনে তাঁহার স্মৃতি উপলক্ষে নেতাজীর কীর্তির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। নেতাজীর নিকট হিন্দু-মুসলমান ভেদ ছিল না। তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ দান এই ছিল যে, হিন্দু মুসলমান ও বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী ভারতীয়দের

ঐক্যের উপর এক বীরদল গঠন করা, যাহারা এতবড় শক্তিশালী বিরুদ্ধ পক্ষের সম্মুখীন হইয়াছিল।

মুরাইম

২৪শে জানুয়ারি শুক্রবার সকালে গান্ধীজী দালতা গ্রাম হইতে রওনা হইয়া মুরাইম গ্রামে পৌছান।

মুরাইম ও পার্শ্ববর্তী গ্রামে সকল হিন্দু অধিবাসীদেরই ধর্মান্তরগ্রহণে বাধ্য করা হইয়াছে। বিগত তিন মাসে তাহাদের নিজস্ব আচার, ব্যবহার ও ধর্মাচরণ মানিয়া চলিতে দেওয়া হয় নাই। এমন কি তাহারা হিন্দুমতে আচরণ করা পর্যন্ত ভুলিতে চলিয়াছে। কারণ তখনও অবস্থা এই সমস্ত গ্রামে এমন চলিতেছিল, যে অবস্থায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নির্দেশ মানিয়া চলা ছাড়া গত্যন্তর নাই। অবশ্য গান্ধীজীর শান্তি ও মৈত্রীর অভিযান ধীরে ধীরে সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের লোকের মনে কাজ করিতেছিল, তথাপি সঙ্গে সঙ্গে কতক লোকের অপপ্রচার মহাত্মাজীর এই মহান্ উদ্দেশ্যের সাফল্যের পথে রীতিমত ব্যাঘাত সৃষ্টি করিতেছিল। 'শান্তিমিশন দিনলিপি'তে ২৩শে জানুয়ারি শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র দাশগুপ্ত লিখিয়াছেন, "কাল যখন মুরাইম যাইতেছি, একজন 'আদাপ' দিলেন। ইনি অমুকচরণ গোপ। কেন এইভাবে সম্বোধন করেন প্রশ্ন করায় বলেন যে, পুরানো আচারব্যবহার ভুলিয়া গিয়াছেন। মুসলমান সামাজিক আচারেই অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছেন।"

সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের সাধারণ গ্রামবাসীদের মনে এখন পর্যন্ত এইরূপ ধারণা বদ্ধমূল হইয়া আছে যে, পাকিস্তানের অর্থ,—যাহারা সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের ধর্ম অবলম্বন করিবে কেবল একমাত্র তাহারাই পাকিস্তানে থাকিবার অধিকারী হইবে। অন্য কোন সম্প্রদায়ের লোক সেখানে থাকিতে পারিবে না। গান্ধীজী প্রায় প্রত্যহই তাঁহার প্রার্থনা-সভায় এই বিষয়ে উল্লেখ করিয়া সংখ্যা-গরিষ্ঠ সম্প্রদায়কে অন্য ধর্মাবলম্বীদের ধর্মকর্ম আচরণে স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া লওয়াই যে জিন্না ও অন্যান্য মুসলিম নেতারা পাকিস্তান পরিকল্পনার একটা প্রধান অঙ্গ বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছেন তাহা স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন। গান্ধীজী কোরান হইতেও বাণী উদ্ধৃত করিয়া একথা বারবার তাহাদের স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন যে—কোরানও বলে ঈশ্বর এক। বিভিন্ন ধর্মবিশ্বাসী লোক বিভিন্ন আচার ও অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়া তাহাদের অন্তরের আশা-আকাঙ্ক্ষা

ঈশ্বরের নিকট পৌঁছাইয়া দিতে চাহে। ঝড় যখন আসে তাহার ঝাপটায় কেবল হিন্দুদেরই বাড়ী ভূপতিত হয় না, মুসলমানদের ঘরবাড়ীও সমানভাবেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ইহা হইতেই বুঝা যায়, খোদা এক। গান্ধীজীর কোরান-উদ্ধৃত বাণী অশিক্ষিত সরলপ্রাণ পল্লীবাসী মুসলমানেরা নিবিড় মনোযোগের সহিত শ্রবণ করে। গান্ধীজীর কোরানব্যাখ্যার সময় তাহাদের চোখে-মুখে সম্মতির ভাব পরিস্ফুট হইয়া উঠে। অগণ্য অশিক্ষিত সরলপ্রাণ গ্রাম্য মুসলমানদের সম্মুখে সত্য এইভাবে ক্রমশঃ প্রকাশ হইয়া পড়িলে স্বার্থান্বেষী মুষ্টিমেয়দের রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসিদ্ধির পথে যাতায়াতের সৃষ্টি হইবে এই আশঙ্কায় তাহারা শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছে। এই স্বার্থান্বেষীর দল গান্ধীজীর নিকট ক্রমাগত পত্র লিখিয়াছে—"আপনি হিন্দু-মুসলমানদের নিকট কোরান-ব্যাখ্যা শুনান, আপনার পক্ষে ইহা কি অনধিকারচর্চা নহে?" গান্ধীজী ইতিমধ্যে এই মর্মে অনেক চিঠিই পাইয়াছেন। এস্থানের বহু গ্রামে এই বিষয় লইয়া বহুসংখ্যক মুসলমানের সহিত কথাবার্তা বলিয়া দেখিয়াছি, তাহারা কিন্তু গান্ধীজীর কোরান ব্যাখ্যা করিয়া শুনানোর ব্যাপারটাকে মোটেই তাঁহার পক্ষে অনধিকারচর্চা বলিয়া মনে করে না। অনেক মুসলমান (আমাকে) এমন কথাও বলিয়াছেন—'গান্ধীজী একজন মহাপ্রাণ ব্যক্তি; তাঁহার মুখনিঃসৃত কোরানের সরল ব্যাখ্যা তাহাদের অনেক ভ্রম দূর করিয়াছে।' গান্ধীজীর কর্ম ও বাণী এইভাবে ক্রমে ক্রমে সরল মুসলমানদের অন্তর স্পর্শ করিয়াছে। সংখ্যা-লঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের সহিত পূর্বসম্পর্ক ফিরাইয়া আনিবার জন্য সংখ্যাগরিষ্ঠদের মধ্যে একটা আগ্রহ দেখা দিতেছিল। অবশ্য এই আগ্রহপ্রকাশের যে সমস্ত লক্ষণ, সেগুলি অতি ক্ষীণ, কোন কোন ক্ষেত্রে ঠিকভাবে উপলব্ধি করা না গেলেও অনুভব করা যাইত।

দালতার পরবর্তী গ্রাম মুরাইময়ে গান্ধীজী হবিবুল্লা পাটোয়ারীর বাড়ীতে থাকেন। হবিবুল্লা পাটোয়ারী পূর্বাহ্নেই গান্ধীজীকে তাঁহার বাড়ীতে থাকিবার জন্য আমন্ত্রণ জানাইয়াছিলেন। পাটোয়ারী ও তাঁহার পরিবারস্থ সকলে গান্ধীজীর জন্য যথাসাধ্য করিয়াছেন। তাঁহাদের আতিথেয়তার মধ্যে আন্তরিকতার অভাব ছিল না। প্রার্থনা-সভায়ও গান্ধীজী পাটোয়ারী পরিবারের আতিথেয়তার উল্লেখ করিয়া কৃতজ্ঞতা জানান। পাটোয়ারী সাহেবের বয়স ৫০ উত্তীর্ণ হইয়াছে। মুখমণ্ডলে বয়সবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ক্রমলব্ধ অভিজ্ঞতার ছাপ পড়িয়াছে। গান্ধীজীর উদ্দেশ্য ও আদর্শের প্রতি তাঁহার একটা আন্তরিক

অনুরাগ দেখিতে পাইলাম। হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে পূর্বের সৌহার্দ্য ফিরাইয়া আনিবার জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন। গান্ধীজী বিদায়গ্রহণের সময় তাঁহার খোঁজ করিলে তিনি দৌড়াইয়া তাঁহার সম্মুখে নতমস্তক হইয়া 'আশীর্বাদ' প্রার্থনা করিলেন। হীরাপুরে প্রার্থনা-সভাতেও তাঁহাকে গান্ধীজীর আসনের অতি নিকটে মাটিতে আসন গ্রহণ করিয়া নিবিষ্টচিত্তে বসিয়া থাকিতে দেখিলাম।

মুরাইময়ে প্রার্থনা-সভায় প্রায় দশহাজার হিন্দু-মুসলমান সমবেত হইয়াছিল। মুসলমানই সংখ্যায় বেশী উপস্থিত ছিলেন। আশেপাশের বহু গ্রাম হইতে মধ্যাহ্ন হইতেই দলে দলে লোক আসিয়া সমবেত হইতেছিল। কয়েকদিন হইতেই গান্ধীজীর সান্ধ্য-সভায় অধিক লোক উপস্থিত হইতেছিল। বুধ ও বৃহস্পতিবার হইতে শুক্রবার জনসমাগম আশাতিরিক্ত বেশী হইয়াছিল। গান্ধীজী বলেন যে, ইহা হিন্দু-মুসলমানের পরস্পরের মধ্যে ক্রমবর্ধমান সম্প্রীতি ও সদ্ভাবের পরিচায়ক বলিয়া ভাবিতে তিনি বিশেষ আনন্দ লাভ করিতেছেন।

মুরাইম ও পার্শ্ববর্তী অপর তিনটি গ্রামের অবস্থা সম্পর্কে 'শান্তিমিশন দিন-লিপি'-র ২৫শে জানুয়ারি সংখ্যায় লিখিত হইয়াছে, "৪ খানা গ্রামের ২১টা বাড়ীতে প্রায় ৮০টা পরিবারের সমস্ত হিন্দুই তাঁহাদের ঘরবাড়ী খোয়াইয়া বসিয়াছেন। বাড়ীগুলি পুড়িয়াছে আর যেগুলি পড়িয়া ছিল তাহা উঠাইয়া লইয়া কেবল লুণ্ঠনের চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে।—মুরাইম অন্যান্য স্থানের ন্যায় পীড়িত হইলেও ইহা দুর্গম স্থান ও নোয়াখালির এক প্রান্তে বলিয়া এখানকার হিন্দুদের অবস্থা অত্যন্ত কঠোর। এখানকার অধিবাসীদের মধ্যে খুব কর্মঠ গৃহস্থের সংখ্যা বেশী। গোপেরা আছেন, ইহারা জাতি-ব্যবসা করেন এবং ১৪।১৫ মাইল দূরে রায়পুর থানার গ্রাম হইতে দুধ সংগ্রহ করিয়া আনিয়া ব্যবসা করিয়া থাকে। ইহাদের শরীর সুগঠিত, যদি ইহারা ভয় ত্যাগ করেন তবে এই অঞ্চলকে সুশোভিত করিতে পারেন।"

হীরাপুর

হীরাপুর মুরাইম হইতে দক্ষিণ-পশ্চিমে অল্প দূরেই অবস্থিত। ইহা একটি ছোট গ্রাম। বর্ধিষ্ণু হিন্দু পরিবার এখানে নাই। এক দরিদ্রের বাড়ীতে ছোট একটি কুটীর নির্মাণ করা হইয়াছিল। ২৫শে জানুয়ারি শনিবার গান্ধীজী নির্দিষ্ট সময়ে নূতন আবাসে উপস্থিত হন। দিনমান বেশ শান্তিতেই অতিবাহিত

হয়। প্রার্থনা-সভার স্থানও মনোরম ছিল। লোকসংখ্যা অল্প ছিল তবে হিন্দু-মুসলমান সংখ্যা প্রায় সমান সমান ছিল।

প্রার্থনা-সভায় গান্ধীজী বলেন যে, তিনি ইসলাম সম্পর্কে কিছু বলিতেছেন, ইহাতে ক্ষুব্ধ হইয়া লোকে তাঁহার নিকট টেলিগ্রাফ ও পত্র পাঠাইতেছেন। মহাত্মা গান্ধী মাদ্রাজ ও বোম্বাইস্থিত জমিয়ৎ-উল-ইসলামের নিকট হইতে প্রাপ্ত দুইটি তারবার্তার কথা উল্লেখ করেন। এই দুইটি তারবার্তায় বলা হইয়াছে যে, অবিশ্বাসী হিসাবে গান্ধীজীর ইসলামীয় আইনে হস্তক্ষেপ করিবার কোন অধিকার নাই। গান্ধীজী বলেন যে, তারবার্তা দুইটি তথ্যের অজ্ঞতার উপর ভিত্তি করিয়া প্রেরিত হইয়াছে। মহাত্মাজী বলেন যে, তিনি কোন ধর্মানুষ্ঠানে মোটেই হস্তক্ষেপ করেন নাই। ইহা করিবার অধিকারও তাঁহার নাই। তিনি মহাপুরুষ হজরতের বাণী যেভাবে বুঝিয়াছেন তাহার উপর ভিত্তি করিয়া উপদেশ দিয়াছেন মাত্র। বহু শিক্ষিত মুসলমান পরিবারে তিনি কোনরূপ পর্দাপ্রথা দেখেন নাই। কিন্তু ইহার দ্বারা অন্তরের সম্ভ্রমরক্ষার অভাব সূচিত হয় না। তাঁহার মতে ইসলামে ইহাই করিতে বলা হইয়াছে। যদি তাঁহার মুসলমান শ্রোতারা মনে করেন যে, তাঁহার উপদেশ ইসলামের নির্দেশবিরোধী, তাঁহারা ইহা অগ্রাহ্য করিতে পারেন। তিনি যদি সমালোচনা বা শারীরিক শাস্তির ভয়ে তাহা না করেন, তাহা হইলে তাঁহার সত্য বা অহিংসার প্রতিনিধিত্ব করিবার যোগ্যতা থাকিবে না।

বান্‌শা

২৬শে জানুয়ারি রবিবার স্বাধীনতা-দিবসে মহাত্মা গান্ধী অখ্যাত পল্লী বান্‌শায় আসিয়া পৌঁছেন। বান্‌শা মহম্মদপুর গ্রামের সংলগ্ন এবং এই মহম্মদ-পুর গ্রামেই প্রথমে গান্ধীজীর যাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু রাস্তা ভাল না থাকায় শেষ পর্যন্ত গান্ধীজীর সেখানে যাওয়া হয় না।

গান্ধীজী হীরাপুরে তাঁহার কুটীর হইতে বাহির হইবার সঙ্গে সঙ্গে গান্ধীজীর সহযাত্রিগণও তাঁহার সহিত চলিতে থাকে। আজাদ-হিন্দ্ ফৌজের লোকেরা যেভাবে হিন্দিতে 'জনগণমন-অধিনায়ক' সঙ্গীতটি গাহিয়া থাকেন, উক্ত সঙ্গীতটি পতাকা উত্তোলনের পর সেইভাবে গাওয়া হয়।

'বন্দে মাতরম্', 'আল্লাহো আকবর', 'মহাত্মা গান্ধীকী জয়', 'নেতাজীকী জয়' প্রভৃতি ধ্বনির মধ্যে অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়। ইহা ব্যতীত গান্ধীজীর কুটীরে

আর কোন অনুষ্ঠান হয় নাই। গান্ধীজীর সহযাত্রী সাংবাদিকগণ নিজেদের কুটীরে স্বাধীনতা-দিবসের অনুষ্ঠান করেন। তাঁহারা গান্ধীজীর আশীর্বাদ লাভ করেন। সাংবাদিক কুটীরে নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতি ও গণ-পরিষদের সদস্য শ্রীযদুবংশ সহায় কর্তৃক জাতীয় পতাকা উত্তোলিত হয়। শ্রীযুক্ত সহায় মহাত্মা গান্ধী ও বিহার সরকারের মধ্যে যোগস্থাপনকারী অফিসার হিসাবে গান্ধীজীর সহিত অবস্থান করিতেছিলেন। গান্ধীজীর উর্দ্দু দো-ভাষী মিঃ মামুদ আমদহুনার হিন্দুস্থানীতে সঙ্কল্প-বাক্য পাঠ করেন। তারপর সাংবাদিক দলের একজন বাংলায় সংকল্প-বাক্য পাঠ করেন। শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্র সিংহের নেতৃত্বে জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া হয়, এবং শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করার জন্য দুই মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

অপরাহ্নে সাংবাদিকগণ গৃহে গৃহে গমন করিয়া গ্রামবাসীদের সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং তাহাদিগকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, হিন্দু-মুসলমান ঐক্য এবং অস্পৃশ্যতা বর্জনের প্রয়োজনীয়তা বুঝাইয়া দেন।

সন্ধ্যায় সার্বজনীন ভোজের আয়োজন হয়। গান্ধীজীর নিকট কর্মসূচী উপস্থিত করা হইলে তিনি তাহা অনুমোদন করেন। সকালবেলার অনুষ্ঠানে অধ্যাপক নির্মল বসু, সর্দার জীবন সিংহ উপস্থিত ছিলেন।

গান্ধীজী বান্‌শা প্রার্থনা-সভায় স্বাধীনতা-দিবসের অনুষ্ঠানের মর্মকথা বলেন। "স্বাধীনতা-আন্দোলনের ফল প্রায় তাঁহাদের হস্তগত হইয়াছে; কিন্তু তাঁহারা যদি নির্বোধ হন তাহা হইলে উহা তাঁহাদের হাত হইতে ফস্কাইয়া পড়িতে দিবেন; তাহা হইলে গণ-পরিষদ স্বাধীনতা অর্জন করিতে পারিবে না;— যদি না পরিণামে সমস্ত ভারতবাসী স্বাধীনতার জন্য কাজ করে এবং সংগ্রাম করিবার জন্য প্রস্তুত হয়।"

ভারতের বাহিরে নেতাজীর কার্যকলাপ সম্বন্ধে গান্ধীজী বলেন যে, "বাংলার গৌরব নেতাজী যখন বাহির হইতে স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তখন তিনি শুধু বাংলার জন্য যুদ্ধ করেন নাই, সমগ্র ভারতের জন্যই যুদ্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী লোক ছিলেন; কিন্তু তাঁহারা মুহূর্তের জন্যও মনে করেন নাই যে, তাঁহারা প্রদেশবিশেষ কিংবা সম্প্রদায়বিশেষের জন্য যুদ্ধ করিতেছেন। তাঁহারা যেন নেতাজীকে এবং স্বাধীনতার জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, এরূপ অপর সকলকে স্মরণ রাখেন।"

গান্ধীজী বক্তৃতার প্রথমে বলেন যে, ২৬শে জানুয়ারি ভারতের পক্ষে স্মরণীয়

দিবস। কংগ্রেসের উদ্ভবের সহিত ভারতীয়দের স্বাধীনতালাভের আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত হয়। অবশ্য স্বাধীনতার অনুভূতি ছিল; কংগ্রেসের উদ্ভবের সহিত উহা সুস্পষ্ট রূপ গ্রহণ করে। ১৯১৬ সাল হইতে উহা গ্রামগুলিতে প্রবেশ করিতে আরম্ভ করে; অবশেষে স্বাধীনতা-সম্পর্কিত প্রস্তাব গৃহীত হয়। ঐ সময় হইতে ভারতব্যাপী ২৬শে জানুয়ারি উৎসব অনুষ্ঠিত হইতেছে। লক্ষ লক্ষ লোক ঐ আন্দোলনে যোগ দিয়াছিলেন; যদি ভাগ্য তাঁহাদের প্রতিকূল না হইত এবং তাঁহাদের নিজেদের মধ্যে বিভেদ না থাকিত, তাহা হইলে আজ এই সভায় তাঁহাদের মধ্যে ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকা সগৌরবে উড্ডীয়মান দেখা যাইত। এমন এক সময় ছিল যখন মুসলমানগণ এই পতাকাকে তাঁহাদের নিজেদের বলিয়া গণ্য করিতেন এবং ইহা ভারতের সমগ্র জনসংখ্যার আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক ছিল। ইহা সমগ্র ভারতবর্ষের পতাকা ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এক্ষণে মুসলমান ভাইগণ ইহাতে গৌরব বোধ করেন না; এমনকি আপত্তি করেন।

গান্ধীজী অতঃপর বলেন যে, মুসলমানগণ এখন পাকিস্তান চাহেন; কিন্তু যদি তাঁহারা চাহেন যে, ইংরাজগণ তাঁহাদিগকে পাকিস্তান দিবেন, তাহা হইলে তাঁহারা নিশ্চয়ই তাঁহাদিগকে ভারতে অবস্থানে সাহায্য করিবেন। প্রথমে স্বাধীনতালাভের চেষ্টা করায় নির্ভুল মনোভাব হওয়া উচিত এবং তৎপর পাকিস্তান প্রশ্নের মীমাংসা নিজেরা করা। ইংরাজগণ নিশ্চয়ই ভারত ছাড়িয়া যাইবেন। আন্তর্জাতিক অবস্থা এরূপ যে, তাঁহারা আধিপত্য রাখিতে পারিবেন না। কিন্তু যদি ভারতবাসিগণ এইভাবে নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করিতে থাকে, তাহা হইলে অন্যান্য শক্তি তাহার বিপুল শক্তি ও সম্পদ বৃথা যাইতে দিতে পারে না। ঐ অবস্থায় ভারতবাসীদের একজন প্রভু থাকিবে না, বহু প্রভু থাকিবে।

গান্ধীজী আরও বলেন যে, তাঁহাদের নিজেদের মধ্যে ভেদ রহিয়াছে বলিয়া তিনি তাঁহার বন্ধুদিগকে জাতীয় পতাকা উত্তোলন না করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। তিনি মুসলমানদের মনোভাবের প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন; তিনি তাঁহাদের সম্মুখে এই পতাকা প্রদর্শন করিবেন না। শ্রোতৃমণ্ডলী যদি ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট হইতেন, তাহা হইলে তিনি স্বয়ং জাতীয় পতাকা উত্তোলন করিতেন এবং ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টকে এই বলিয়া চ্যালেঞ্জ করিতেন যে, তিনি বরং মরিবেন, তথাপি জাতীয় পতাকা অনুত্তোলিত থাকিতে দিবেন না। আজ এই প্রশ্ন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, কারণ তাঁহার মুসলমান ভাইগণ জাতীয় পতাকা

উত্তোলনের বিরোধী। গান্ধীজী বলেন যে, ইহা সত্য যে, একটি প্রদেশও স্বাধীনতা হস্তগত করিতে পারে। তাঁহার মনে সমগ্র ভারতের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা রহিয়াছে ; সুতরাং তিনি আশা করেন যে, সমগ্র ভারত এক হইয়া স্বাধীনতা কামনা করিবে এবং উহার জন্য কাজ করিবে।

পাল্লা

২৭শে জানুয়ারি সোমবার গান্ধীজী পাল্লায় আসিয়া পৌছান। তাঁহাকে এক নাথ বাড়ীতে রাখা হইয়াছিল। বাড়ীর নাম "বড়বাড়ী"। নাম বড়বাড়ী হইলেও আসলে কিন্তু বাড়ীটা মোটেই বড় নহে। আর বড়লোকের তো নয়ই। এই দরিদ্রের ঘরে স্ত্রী-পুরুষের নিবিড় আত্মীয়তার মধ্যে গান্ধীজীর দৈনন্দিন কর্মসূচী শান্তিতে পালিত হয়। বাড়ীর স্ত্রীলোকেরা শ্রীমতী মানু গান্ধীকে জিজ্ঞাসা করেন যে, ঐ ঘরের অপর অংশে তাঁহাদের বাড়ীর ছেলেমেয়েরা শুইতে পারে কি না। অসুবিধা হইলে তাহারা যে-কোন স্থানে থাকিবে। গান্ধীজী তাঁহাদের কথায় খুশী-মনে বলেন, গৃহের পার্শ্বের অংশ কেন, তিনি যেখানে আছেন সেখানে ও তাঁহার নিকটেই তাহারা আসিয়া থাকিতে পারে।

পাল্লার প্রার্থনা-সভায় মৌন দিনের লিখিত অভিভাষণ পাঠ করা হয়। গান্ধীজী বলেন,—যে বাটীতে তিনি আছেন তাহা এক নাথের বাড়ী। গৃহ-কর্তাকে তিনি ধন্যবাদ দিয়া বলেন, সেখানে তাঁহার ভাল লাগিয়াছে, কিন্তু কেবল সেখানেই নহে, এই নোয়াখালিকেই তাঁহার ভাল লাগিয়াছে। এমন গাছপালা ও স্বর্ণপ্রসূ ভূমি তাঁহার মন মুগ্ধ করিয়াছে। তিনি চাহেন এই স্বর্ণভূমি ফলেফুলে আরও সুশোভিত হয়ে উঠুক। দুই সম্প্রদায়ের মিলিত চেষ্টায় এই গ্রামকে আরও সমৃদ্ধ করিয়া তোলা হউক। দুই সম্প্রদায়ের লোকের সম্মিলিত চেষ্টার মধ্য দিয়াই সাম্প্রদায়িক ঐক্যের বিকাশ ঘটিবে। প্রার্থনা-সভার পর গান্ধীজী নিমন্ত্রিত হইয়া প্রায় এক মাইল পথ অতিক্রম করিয়া গ্রামের জনৈক মুসলমান ভদ্রলোকের বাটী যান।

পাঁচগাঁও

২৮শে জানুয়ারি মঙ্গলবার গান্ধীজী পরবর্তী গ্রাম পাঁচগাঁওয়ে আসিয়া পৌছেন। পাল্লা হইতে পাঁচগাঁওয়ের পথ দীর্ঘ ছিল। ভাওর গ্রামের মধ্য দিয়া গান্ধীজীকে লওয়ার জন্য ঐ গ্রামের অধিবাসীদের আগ্রহে মাত্র তিন দিন

পূর্বে ঐ পথ স্থির হয়। পথের উভয়পার্শ্বে অপেক্ষমান হিন্দু ও মুসলমান জনতা গান্ধীজীকে তাহাদের সশ্রদ্ধ অভিবাদন জানায়। মুসলমান নারীদের নিজ নিজ বাটীর দরজায় দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখা যায়। তিনি দুইজন মুসলমানবাড়ীতেও যান। পরম আতিথেয়তার সহিত তাঁহারা গান্ধীজীকে অন্তঃপুরে লইয়া যান।

পাঁচগাঁওতে খুব কর্মব্যস্ততার মধ্যে গান্ধীজীর দিন অতিবাহিত হয়। পূর্বদিন হিন্দু-মুসলমান ঐক্য-সম্পর্কীয় আলোচনার জন্য শ্রীপ্যারীলাল ও ডাঃ সুশীলা নায়ার নোয়াখালি জেলা মুসলিম লীগ-সম্পাদক মিঃ মুজিবর রহমান, এম. এল. এ.-র সহিত সাক্ষাৎ করেন। ইহার পর ২৮শে রাত্রে জেলা লীগ সম্পাদক ও আরও কয়েকজন লীগ-নেতা গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাৎ করেন।

অপরাহ্ণে নোয়াখালি জেলা মুসলিম লীগের সেক্রেটারী মিঃ মুজিবর রহমানের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধিমণ্ডলী পাঁচগাঁওয়ে মহাত্মার সহিত দেখা করেন এবং এই বিষয়টির উপর বিশেষ জোর দেন যে, নোয়াখালিতে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে হিন্দু-মুসলমানের সমবেত চেষ্টার দ্বারাই তাহা সম্ভবপর হইবে। প্রতিনিধিমণ্ডলীকে সম্বোধন করিয়া মহাত্মা বলেন,—বিপুল শুভেচ্ছা লইয়া আমি নোয়াখালি আসিয়াছি, আমি জানি নোয়াখালিতে যদি আমি ব্যর্থকাম হই—তাহা হইলে আমার সমগ্র অহিংসা-নীতি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইবে।

অপরাহ্ণে প্রার্থনা-সভায় মহাত্মা বলেন—আজ প্রাতে ভ্রমণের সময় আমি একটি হিন্দু ও দুইটি মুসলমান গৃহে গমন করিয়াছিলাম। ঐ সকল বাড়ীতে যাইবার কোন কথা ছিল না। কিন্তু স্নেহের আহ্বান আমাকে টানিয়া লইল। উহারা সকলেই আমাকে কিছু-না-কিছু দিতে ইচ্ছুক ছিলেন। উহারা ফল পাঠাইলে আমি সাদরে তাহা গ্রহণ করিব। আমার নাতনী (মানু গান্ধী) বাড়ীর মেয়েদের সহিত আলাপ করে। এক বৃদ্ধা তাহাকে আলিঙ্গন করেন। এক স্থানে তাঁহাকে রুটি ও মাছের ঝোল খাইতে অনুরোধ করা হয়। উহাদিগকে তুষ্ট করিবার জন্য সেস্থানে তিনি অন্য কিছু আহার্য গ্রহণ করেন। কিন্তু একত্র খাওয়া ও স্নেহের আদানপ্রদানের মধ্যে কোন সম্পর্ক নাই।

পাঁচগাঁওয়ে অতি অল্পসংখ্যক লোক মহাত্মা গান্ধীর সহিত দেখা করেন। মধ্যাহ্নে কর্নেল নিরঞ্জন সিংহ গিল তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন।

অপরাহ্ণে পুলিস সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মিঃ আবদুল্লা (বদলী হওয়ার আদেশপ্রাপ্ত) তাঁহার স্থলে প্রতিষ্ঠিত মিঃ মোয়াজ্জেম আহম্মদ খাঁকে লইয়া গান্ধীজীর নিকট

আসেন। নূতন স্থপারিণ্টেণ্ডেণ্ট তাঁহার পত্নী ও সন্তানগণ সহ আসিয়াছিলেন। তাঁহারা সকলে প্রার্থনা-সভায় যোগ দিয়াছিলেন। নূতন স্থপারিণ্টেণ্ডেণ্ট যখন গান্ধীজীর নিকট বিদায় গ্রহণ করিতে আসেন, তখন গান্ধীজী রসিকতা করিয়া তাঁহাকে বলেন, "আমি এখন আপনার হেফাজতে একজন বন্দী।" তিনি আশা করেন যে, মিঃ আবদুল্লা তাঁহার যেরূপ বন্ধু ছিলেন, নূতন স্থপারিণ্টেণ্ডেণ্টও সেইরূপ বন্ধু হইবেন।

মিঃ আবদুল্লার ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহে কার্যভার বুঝাইয়া দিয়া বদলী হইয়া ফরিদপুরে যাওয়ার স্থির হয়। অক্টোবরের হাঙ্গামার সময়ে তিনি নোয়াখালির পুলিশ স্থপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ছিলেন। তিনি বলেন যে, তিনি ফরিদপুর হইতেও গান্ধীজীর কার্য লক্ষ্য করিবেন। তাঁহার নিশ্চিত বিশ্বাস গান্ধীজীর উদ্দেশ্য সফল হইবে।

প্রার্থনার পর গান্ধীজী একজন মুসলমানের বাড়ীতে গমন করেন। গৃহস্বামী তাঁহাকে কতকগুলি কমলালেবু দেন। গান্ধীজী ঐ সমুদয় সমবেত বালক-বালিকাদের মধ্যে বিতরণ করেন। তাহাদের মধ্যে কমলালেবুর জন্য বেশ হুড়াহুড়ি পড়িয়া গিয়াছিল।

জয়াগ

জয়াগ জিলা-বোর্ডের রাস্তার উপর। পাঁচগাঁও হইতে কতকটা নূতন তৈরী-করা পথে, কতকটা সাধারণ গ্রাম্যপথে ও জিলা-বোর্ডের পথে গান্ধীজী ২৯শে জানুয়ারি বুধবার জয়াগ পৌঁছেন। জয়াগে অনেক মধ্যবিত্ত ভদ্রশ্রেণীর লোকের বাস। অন্যান্য অধিবাসীরা তো আছেনই। পাকাবাড়ী, সুন্দর পুকুর, মঠ ও মন্দির দ্বারা গ্রামটি সজ্জিত। দাঙ্গায় গৃহ ও মঠ-মন্দিরের যথেষ্ট ক্ষতি সাধিত হইয়াছে।

যে বাড়ীতে গান্ধীজী উঠিয়াছিলেন উহা পতাকায় ও পত্রপুষ্পে সজ্জিত করায় মনোরম্ দেখাইতেছিল। গৃহে প্রবেশকালে পূর্ব ব্যবস্থানুযায়ী একটি জাতীয় পতাকা গান্ধীজীর প্রতি পদক্ষেপের সহিত ধীরে ধীরে উত্তোলিত হইতে থাকে। তাঁহার গৃহপ্রবেশের মুহূর্তে উহা উঠান সম্পূর্ণ হয়। এই অঞ্চলের নাথ মেয়েদের নাচিয়া নাচিয়া নামকীর্তনের রীতি আছে। এইস্থানে একদল মেয়ে এই প্রথা অনুযায়ী নৃত্যসহ মধুর কীর্তন দ্বারা গান্ধীজীকে গৃহে প্রবেশকালে সম্বর্ধনা করেন।

বেলা তিনটার সময় কর্মীদের সভায় গান্ধীজীকে কয়েকটি প্রশ্ন করা হয়।

গান্ধীজী সেগুলির উত্তর দেন। প্রার্থনা-সভায়ও গান্ধীজী এই উত্তরের পুনরাবৃত্তি করেন। মঙ্গলবার জিলা মুসলিমলীগের সম্পাদক যে সকল প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তাহার উত্তরে গান্ধীজী যাহা বলিয়াছিলেন প্রার্থনা-সভায় তাহারও উল্লেখ করেন।

প্রার্থনা-সভায় মহাত্মা এক মুসলমান ভদ্রলোকের প্রশ্নের উত্তরে বলেন যে, হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের লোকেরাই তাঁহার প্রার্থনা-সভায় যোগদান করে, ইহাই তাঁহার ইচ্ছা। অমুসলমানদের পক্ষে কোরানপাঠ এবং রামকৃষ্ণের সহিত রহিম-করিমের তুলনা করা অনুচিত বলিয়া মহাত্মা মনে করেন কিনা, মহাত্মাকে এই প্রশ্ন করা হয়। তাঁহারা মহাত্মাকে জানান যে, ইহাতে মুসলমানেরা অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। উত্তরে মহাত্মা বলেন যে, এই আপত্তিতে সঙ্কীর্ণতাই ফুটিয়া উঠিয়াছে, ইহাতে তিনি অতিমাত্রায় ব্যথিত ও বিস্মিত হইয়াছেন। মহাত্মা বলেন, হিন্দুকে ভাল হিন্দু, মুসলমানকে ভাল মুসলমান, খ্রীষ্টানকে ভাল খ্রীষ্টান ও পার্শীকে ভাল পার্শীতে পরিণত করাই তাঁহার উদ্দেশ্য। তিনি কাহাকেও স্বধর্ম ত্যাগ করিতে বলেন না। জগতের সকল ধর্মের অনুশাসন গ্রহণের স্থান তাঁহার ধর্মে আছে।

উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার জন্য হিন্দুগণ কর্তৃক মুসলমানদের নামে প্রদত্ত এজাহারগুলি প্রত্যাহার করা দরকার বলিয়া কেহ কেহ যে প্রস্তাব করিয়াছেন, উহার উল্লেখ করিয়া মহাত্মা বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলেন যে, দুই ভদ্রলোকের মধ্যে সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা ব্যাপারে অপরাধীদের অভিযুক্ত করায় কি করিয়া প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিতে পারে ; তবে মিথ্যা অভিযোগ করা হইয়া থাকিলে তাহা প্রত্যাহার করা দরকার। মহাত্মা বলেন যে, অপরাধীর শাস্তি হওয়া দরকার ; তবে অপরাধীরা যদি অপরাধ স্বীকার করে ও জনসাধারণের বিচার মানিয়া লয়, তাহা হইলে মামলা এড়ান যাইতে পারে। এই প্রচেষ্টায় তিনি সাহায্য করিতে রাজী আছেন। মহাত্মা, গ্রামের যে সকল যুবক গ্রামের বাহিরে থাকেন তাহাদিগকে নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন ও নিজেদের মধ্যে ব্যবস্থা করিয়া এক এক দলে বিভক্ত হইয়া পালাক্রমে পল্লীসেবায় আত্ম-নিয়োগের আহ্বান জানান।

জয়াগয়ে অতি অল্পসংখ্যক লোক গান্ধীজীর দর্শনার্থী হন। জিলা-ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ ম্যাকিনার্নি এবং নবনিযুক্ত ডিভিসন্যাল কমিশনার গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাৎ করেন। অপরাহ্ণে গ্রামের কর্মীগণ মহাত্মা গান্ধীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া

তাঁহাকে দুইটি বিষয় জানান। প্রথমতঃ তাঁহারা জানান যে, মুসলমানেরা বলিতেছে যে, সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের দুর্গতেরা সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের লোকদের বিরুদ্ধে যেসব এজাহার দিয়াছে একমাত্র তাহা প্রত্যাহার করিলেই সাম্প্রদায়িক শান্তি ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর হইবে। দ্বিতীয়তঃ তাঁহারা মহাত্মাজীকে ইহাও জানান যে, গ্রামের শীর্ষস্থানীয় লোকেরা জীবিকার্জনের নিমিত্ত কলিকাতা ও অন্যান্য স্থানে থাকায় পুনর্বসতির কার্যে ব্যাঘাত ঘটিতেছে। গান্ধীজী তাঁহার প্রার্থনান্তিক ভাষণে এই দুইটি বিষয় সম্বন্ধে উপদেশ দেন।

জয়াগয়ে এক মুসলমান প্রতিনিধিমণ্ডলী মহাত্মার সহিত দেখা করেন। তাঁহারা এই অভিমত জ্ঞাপন করেন যে, বাহিরের লোকের উপস্থিতির ফলে শান্তিস্থাপনে বাধার সৃষ্টি হইতেছে। অবশ্য, গান্ধীজীর অবস্থানে তাঁহাদের আপত্তি নাই। কেননা, তিনি কোন অনিষ্ট করিবেন না বলিয়াই তাঁহাদের বিশ্বাস ; তাঁহার (গান্ধীজীর) আন্তরিকতা সম্পর্কে স্থানীয় মুসলমানদের মনে বিশ্বাস সৃষ্টি করার জন্য তাঁহার অন্ততঃ কিছুদিনের জন্য বিহারে যাওয়া উচিত।

প্রতিনিধিদল আরও বলেন, মুসলমানদের উপর উৎপীড়ন চলিয়াছে এবং বহু বৃদ্ধ ও নির্দোষ ব্যক্তি গ্রেপ্তার হইয়াছে। শান্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠার কাজ ত্বরান্বিত করার উদ্দেশ্যে কিছুটা উদারতা প্রদর্শন করা উচিত। গান্ধীজীর প্রার্থনা-সভার উল্লেখ করিয়া তাঁহারা বলেন, গান্ধীজী হিন্দু বলিয়া তাঁহার প্রার্থনা-সভায় কোরান আবৃত্তির মূল্য মুসলমানেরা সম্যক উপলব্ধি করিতে পারিতেছে না এবং তজ্জন্যই তাহারা অধিকতর সংখ্যায় প্রার্থনা-সভায় যোগ দিতেছে না। প্রতিনিধিবর্গ গান্ধীজীকে অনুরোধ জানাইয়া বলেন, আপনি আমাদের জন্য এমন একটি কার্যসূচী রচনা করুন, যাহা অবলম্বন করিয়া আমরা শান্তি ও মৈত্রী প্রতিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ করিতে পারি।

উত্তরে গান্ধীজী বলেন, আমি চিরদিনই গণসমাজের একজন, চিরদিনই আমি গণসমাজের সেবা করিয়া আসিয়াছি—গণসমাজের মধ্যে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে মিলাইয়া দেওয়াই আমার সাধনা। মুসলমানদের অন্তরে পৌঁছিবার অধিকতর কার্যকরী উপায়ের সন্ধান যদি আপনারা দিতে পারেন, তবে আমি নিশ্চয়ই তাহা চিন্তা করিয়া দেখিব ; কিন্তু কোনক্রমেই আমি নোয়াখালি ত্যাগ করিতে পারি না। নোয়াখালিতে অন্য যাহারা কার্যে লিপ্ত রহিয়াছেন, তাঁহারা শান্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠায় বাধা দিয়াছেন কিনা, সেদিকে লক্ষ্য রাখা গভর্নমেণ্টেরই কর্তব্য। বিহার গমনের কথা উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন, নোয়াখালিতে

থাকিয়াই তিনি বিহারের মুসলমানদের জন্য যথাসাধ্য কাজ করিতেছেন। বিহার গভর্নমেণ্টের সহিত তিনি সর্বদাই যোগাযোগ রক্ষা করিতেছেন এবং উক্ত গভর্নমেণ্টের একজন প্রতিনিধিও তাঁহার সঙ্গে রহিয়াছেন। এখন তিনি যদি বিহারে যান এবং দেখিতে পান যে, বিহার গভর্নমেণ্ট যথাসম্ভব সকল কিছুই করিয়াছেন, তবে সে কথাটিও তাঁহাকে দ্বিধাহীনচিত্তে ঘোষণা করিতে হইবে। উহা মুসলিম লীগের বক্তব্যের অনুকূল নাও হইতে পারে।

মুসলমানগণকে ব্যাপকভাবে গ্রেপ্তারের কথা উল্লেখ করিয়া গান্ধীজী বলেন, দৈহিক শাস্তিবিধানের পরিবর্তে বিবেকবুদ্ধিকে জাগ্রত করাই সংস্কারকের কাজ। সারাজীবন তিনি তাহাই করিয়াছেন এবং উহাতে সাফল্যলাভও করিয়াছেন। অবশ্য, খুব বেশী ক্ষেত্রে তাহা সম্ভব হয় নাই। অপরাধীদের বিবেকবুদ্ধি যাহাতে জাগ্রত হয় এবং তাহারা দোষ স্বীকার করে তদ্রূপ চেষ্টা করাই আপনাদের (প্রতিনিধিদলের) কর্তব্য। যতদিন তাহা না হইতেছে, ততদিন অপরাধীদের সর্দারগণকে গ্রেপ্তার করিতেই হইবে।

প্রার্থনা-সভা সম্পর্কে গান্ধীজী বলেন, পরধর্মের প্রতি অসহিষ্ণুতা যদি এতই প্রবল হয় যে, মানুষ তাহার ইচ্ছানুযায়ী প্রার্থনাও করিতে পারিবে না, তবে এই হতভাগ্য ভারতবর্ষের অদৃষ্টে যে কি ঘটিবে তাহা আমি বুঝিতে পারি না। একজন নিষ্ঠাবান মুসলমান বন্ধুর অনুরোধক্রমেই প্রার্থনাকালে কোরান আবৃত্তির ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। ইসলামের নির্দেশের বিরুদ্ধে কাজ করার ইচ্ছা আমার কোনক্রমেই ছিল না। কিন্তু কোরান হইতে আবৃত্তি করিয়া আমি ইসলাম-বিরোধী কাজ করিতেছি কিনা, সে সম্পর্কে একজন বা পাঁচ ছয় জন মুসলমানের অভিমত আমি মানিয়া লইতে পারিব না।

আমকী

কতকটা জিলা-বোর্ডের সোনাইমুড়ী যাওয়ার রাস্তা, বাকীটা মাঠের উপর দিয়া চলিয়া গান্ধীজী ৩০শে জানুয়ারি বৃহস্পতিবার আমকীতে উপস্থিত হন। গ্রামে প্রবেশ করিলে হিন্দু-পল্লীর ভিতর দিয়াই তাঁহাকে লওয়া হয়। পল্লীটি সম্পূর্ণরূপেই ধ্বংস হইয়াছিল। একটি বাড়ীও নাই। যশোদাবাবুর বাড়ীতে গান্ধীজীকে রাখা হয়। সেই বাড়ীতে দুইখানি ছোটঘর দাঁড়াইয়াছিল ইহাই আশ্চর্য। যশোদাবাবু টিনের চালা ও নাড়া, কাশ ইত্যাদির দ্বারা বেড়া দিয়া ছাপরা তৈরী করেন। প্রায় ঘরই নাই। গ্রামবাসীরাও ছিল না।

গান্ধীজীর আগমন উপলক্ষে স্ত্রী-পুরুষ সকলে তীর্থযাত্রীর মত যে যেখানে ছিল সে সেস্থান হইতে তাঁহার দর্শন পাইবার জন্য আসিয়া সমবেত হয়। আর তীর্থস্থানে থাকিবার মত নৌকার ছইয়ের মত করিয়া বা ছাপরা করিয়া রাত্রি-যাপনের ব্যবস্থা করিয়া লয়।

গান্ধীজীর সমাগমে ধ্বংসলীলার পর এই প্রথম সেদিন আবার ছায়াঘন পল্লীর বুকে প্রাণচাঞ্চল্য ও উৎসাহের সাড়া পড়িয়া যায়। ছেলে-মেয়ে, স্ত্রী-পুরুষ, মায়ের কোলে শিশু, লজ্জাবনতা বধূ, সকলে বৃক্ষচ্ছায়ায় এখানে সেখানে বসিয়াছিল, যেন মেলা বসিয়াছে।

এইদিন গান্ধীজীর সহিত এ. ডি. এম. জামান সাহেব ও রিলিফ অফিসার ইউসুফ সাহেব সাক্ষাৎ করেন। ২৩৪৲ টাকায় কি করিয়া বাসের উপযোগী বাড়ী হইতে পারে ইহা তাঁহারই নমুনা ছিল। গান্ধীজী এই নমুনা পছন্দ করিতে পারেন নাই। গৃহে স্থান নিতান্তই অল্প ছিল। কালো টিনের চাদরের বেড়া দেওয়া ঘরখানি একটা বাক্সের মত দেখাইতেছিল। জামান সাহেব বলেন যে, তিনি আর একখানি গৃহ নির্মাণ করাইয়া গান্ধীজীকে দেখাইবেন।

এইদিন হোরেস আলেকজাণ্ডার গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং স্নানের ঘরে গান্ধীজীর সহিত অনেকক্ষণ ধরিয়া আলাপ করেন।

নবগ্রাম

৩১শে জানুয়ারি শুক্রবার গান্ধীজী নবগ্রামে পৌছেন। আমকী হইতে নবগ্রামের পথ ছিল আড়াই মাইল; কিন্তু পথে কয়েকটি বাড়ীতে যাওয়ায় মোট পথ বাড়িয়া যায় এবং বাড়ী বাড়ী অপেক্ষা করিবার জন্য নবগ্রাম পৌছিতে বেলা ৯টা বাজিয়া যায়। নবগ্রাম যাইতে আনন্দিপুর, যুনদপুর, আন্দিরপাড়া ও নন্দীয়াপাড়ার উপর দিয়া গান্ধীজী গমন করেন। পথে গান্ধীজী ২টি মুসলমান-বাটী এবং ১ জন হিন্দুর বাটী যান। সমস্ত বাড়ীতেই গান্ধীজীকে সাদর অভ্যর্থনা জানানো হয়।

নবগ্রাম হিন্দুপ্রধান গ্রাম। যে বাড়ীতে গান্ধীজীর বাসস্থান ছিল, সেই বাড়ীর প্রাঙ্গণেই দাঙ্গার সময় গো-হত্যা করা হয় এবং সকলকে ধর্মান্তরিত করা হয়। এ গ্রামে নরহত্যা হয় নাই, তবে সকল সংখ্যালঘুদের গৃহই লুণ্ঠিত হয় এবং সকলকেই ধর্মান্তরিত করা হয়। কর্মিসভার প্রশ্নগুলির জবাব তিনি প্রার্থনা-সভায় দেন এবং অপরাহ্নে স্ত্রীলোকদের একটি সভা হয়। তাহাতে তিনি

ঘরে ঘরে চরকা ও তাঁত চালাইবার, অস্পৃশ্যতা নিবারণের, গ্রাম সাফাই এবং ব্যক্তিগত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার সম্পর্কে উপদেশ দেন। হিন্দু ও মুসলমান মেয়েদের পর্দা-প্রথা দূর করিবার আবশ্যকতা এবং তাহাদের শিক্ষাবিস্তারের প্রয়োজনীয়তারও উল্লেখ করেন।

অপরাহ্নে মহিলা-সভায় বহুসংখ্যক স্ত্রীলোক উপস্থিত ছিলেন। নবগ্রামের নারীরা গান্ধীজীকে প্রশ্ন করেন, দুর্বৃত্তদের দ্বারা আক্রান্ত হইলে আমরা কি করিব? পলায়ন করিব, না প্রতিরোধ করিব? উত্তরে গান্ধীজী বলেন, ভীরুতা প্রদর্শন অপেক্ষা বরং হিংসার পথই গ্রহণীয়।

আমার নিজের পক্ষে হিংসার কোনই উপযোগিতা নাই। বীরত্বের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন গড়িয়া তুলিতে হইলে অহিংসা-নীতির জন্যই সর্বপ্রকারে প্রস্তুত হইয়া উঠিবে। সে স্থলে জরুরী অবস্থার কথা চিন্তা করিয়া প্রস্তুত থাকার প্রশ্নও উঠে না।

অহিংসার সাধকের পক্ষে জরুরী অবস্থা বলিয়া কিছু নাই—নিঃশব্দে বীরের মত মৃত্যুবরণ করিতেই তিনি প্রস্তুত হইয়া থাকিবেন। নারীই হউক বা পুরুষই হউক, অপরের সাহায্য না পাইলেও তিনি মৃত্যুকে তুচ্ছ জ্ঞান করিবেন। প্রকৃত সাহায্য একমাত্র ভগবানের নিকট হইতেই আসিতে পারে। ইহা ছাড়া আর কোন উপদেশ আমি দিতে পারি না। যে উপদেশ আমি দিয়া আসিতেছি, উহাকে কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করিব বলিয়াই আমি এখানে আসিয়াছি। দুর্বৃত্তদের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া যে সকল নারী বিনা অস্ত্রে প্রতিরোধ করিতে পারিবেন না, তাঁহাদিগকে অস্ত্র হাতে লওয়ার পরামর্শ দিতে হয় না; তাঁহারা নিজেরাই অস্ত্র হাতে লইবেন। নারীরা অস্ত্র হাতে লইবেন কি না এ প্রশ্ন সর্বদাই করা হইতেছে।

এ সম্পর্কে গান্ধীজী বলেন—কিরূপে প্রকৃতিগতভাবে স্বাধীন হইতে হয়, জনসাধারণকে সে শিক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে। অহিংসার পক্ষেই কার্যকরী প্রতিরোধ সম্ভবপর, এই মূল সত্যটি স্মরণ রাখিলেই সেইরূপে তাহাদের কার্যাদি পরিচালিত হইবে। প্রতিরোধের আয়োজনে সাহসিকতার শ্রেষ্ঠতম নিদর্শন অহিংসা-নীতি ছিল না বলিয়া পৃথিবীকে আণবিক বোমার সাহায্যও গ্রহণ করিতে হইয়াছে। ইহার দ্বারাও যাহারা হিংসা-নীতির ব্যর্থতা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে না, স্বভাবতঃই তাহারা সর্বশক্তি প্রয়োগ করিয়া অস্ত্রসজ্জিত হইয়া উঠিবে।

একজন মহিলা প্রশ্ন করেন—দুর্বৃত্তদের দ্বারা আক্রান্ত হইলে নারীরা আত্মসমর্পণ করিবেন, না প্রাণবিসর্জন করিবেন?

উত্তরে গান্ধীজী বলেন, জীবনের যে আদর্শ আমি অনুসরণ করিতেছি, তাহাতে আত্মসমর্পণের কোন স্থান থাকিতে পারে না। নারীরা আত্মসমর্পণ না করিয়া বরং প্রাণবিসর্জনই দিবেন। কিভাবে প্রাণবিসর্জন দিতে হইবে, তাহা বলা আমার পক্ষে সম্ভবপর নহে।

গান্ধীজী আরও বলেন, যাঁহার মন আত্মদানের জন্য প্রস্তুত রহিয়াছে, তাঁহার মনোবল ও অন্তরের পবিত্রতা এত বেশী যে, তাঁহার সম্মুখে আসিয়া আততায়ীও নিরস্ত্র হইয়া পড়িবে। এই বিশ্বাসেই এক্ষেত্রে আত্মহত্যার পরামর্শ দেওয়া হইতেছে।

গান্ধীজী আরও বলেন, আত্মহত্যা বা আততায়ীকে হত্যা এ দুইয়ের মধ্যে একটি বাছিয়া লইতে হইলে আমি নিশ্চয়ই প্রথমটির পরামর্শ দিব।

নবগ্রামে প্রার্থনা-সভায় প্রায় তিন হাজার লোকের সমাবেশ হইয়াছিল। মুসলমানদের সংখ্যাই বেশী ছিল।

প্রার্থনান্তিক বক্তৃতায় গান্ধীজী বলেন, লোক নিজ নিজ গৃহে ফিরিয়া আসিতেছে জানিয়া আমি খুশী হইয়াছি। আশা করি এই পুনর্বসতি চলিতে থাকিবে। আমার মত এই যে, দেশে স্বীয় দেশবাসীর মধ্যে বসবাসকালে মনে ভীতির লেশমাত্র রাখা উচিত নহে। সৃষ্টিকর্তাকে ভয় করিতে শিখিলে, লোক-ভয় বিদূরিত হইবে, নিজেরা ভয় না পাইলে কেহ কাহারও মনে ভীতির সঞ্চার করিতে পারে না। ইহাই আমার ৬০ বৎসরের অভিজ্ঞতা।

এইদিন অপরাহ্ণে একদল ধীবর মহাত্মাজীর সহিত দেখা করিয়া জানান যে, স্থানীয় অধিবাসীদের পুকুরে মৎস্য ধরিয়াই তাহারা জীবিকানির্বাহ করিয়া থাকে, কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় তাহাদের বর্জন করায়, জীবিকার্জন তাহাদের পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। মহাত্মাজী প্রার্থনা-সভায় ইহার উল্লেখ করিয়া বলেন যে, প্রকৃতি এই দেশের প্রতি কৃপণতা করেন নাই। কিন্তু মানুষ যদি নিজেদের রাজনৈতিক মতানৈক্যের বাধা অতিক্রম করিয়া মানবতা ও সৌভ্রাত্রের আহ্বানে সাড়া না দেয়, তাহা হইলে জীবনযাত্রা-নির্বাহ যে অসম্ভব হইয়া উঠিবে ইহাতে আর আশ্চর্য কি? তিনি উভয়কে মৈত্রী-প্রতিষ্ঠার জন্য আন্তরিকভাবে সচেষ্ট হইতে বলেন।

সভায় এ. কাদের নামে একজন মৌলভী একসঙ্গে "রাম রহিম" "কৃষ্ণ করিম"

প্রভৃতি উচ্চারণের ঘোরতর প্রতিবাদ করেন। কিন্তু সভায় উপস্থিত মুসলমানদের মধ্য হইতে এই প্রতিবাদের সমর্থনসূচক কোন উক্তি শ্রুতিগোচর হইল না।

আমিষাপাড়া

পয়লা ফেব্রুয়ারি শনিবার সকালে একঘণ্টাকাল পথ চলিবার পর গান্ধীজী বেলা সাড়ে ৮টায় আমিষাপাড়ায় পৌছেন। 'বরাহীবাড়'তে তাঁহার বাসস্থান নির্দিষ্ট ছিল। এই বাড়ী বরাহীদেবীর দেবোত্তর। মন্দিরটি সাধারণ একটা পাকা ঘর, খুব প্রাচীন। গ্রামের প্রায় সকল অধিবাসীই হিন্দু। এই অঞ্চলে এইরূপ হিন্দুপ্রধান গ্রাম অতি বিরল।

আমিষাপাড়ার প্রার্থনা-সভার ন্যায় এরূপ বৃহৎ প্রার্থনা-সভা আর হয় নাই। প্রায় ১৫ হাজার হিন্দু-মুসলমান এই সভায় সমবেত হইয়াছিলেন। আশ-পাশের বহু গ্রাম হইতেও লোক-জন উপস্থিত হইয়াছিল। হিন্দু-মুসলমানের সংখ্যা প্রায় সমান সমান ছিল। প্রায় একহাজার স্ত্রীলোকও এই সভায় উপস্থিত ছিলেন।

নবগ্রামের প্রার্থনা-সভায় একজন মৌলভী কিছু বলিতে চাহিলে গান্ধীজী তাঁহার বক্তব্য অনুমান করিয়া তাঁহাকে বলিতে অনুমতি দেন। সাধারণতঃ প্রার্থনা-সভায় গান্ধীজী একাই বলিয়া থাকেন। এই ক্ষেত্রে তিনি তাহার ব্যতিক্রম ঘটিতে দেন। মৌলভী সাহেব উষ্মার সহিত এই অভিযোগ করিতেছিলেন যে, গান্ধীজী কেন মুসলমান স্ত্রীলোকদের পর্দা-প্রথা সম্পর্কে বলেন। তাঁহার তো ইসলামীয় আইন সম্পর্কে কিছু বলার অধিকার নাই। গান্ধীজী ইহার উত্তরে আমিষাপাড়া প্রার্থনা-সভায় বলেন যে, মৌলভী সাহেব ইসলামকে সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিতে দেখিয়াছেন। ইসলাম ধর্মপুস্তক পাঠ করার এবং ইসলাম-সম্পর্কিত বাণীর অর্থ করিবার অধিকার তাঁহার আছে বলিয়াই তিনি মনে করেন। মৌলভী সাহেব এই অভিযোগও করিয়াছেন যে, রাম রহিম ও কৃষ্ণ করিম একসাথে কেন উচ্চারিত হইবে। রাম তো ছিলেন রাজার পুত্র, আর রহিম ছিলেন ঈশ্বর; কৃষ্ণ করিম সম্পর্কেও ঐ একই কথা খাটে। মৌলভী সাহেবের এই উক্তিও ইসলাম সম্পর্কে সঙ্কীর্ণ দৃষ্টির পরিচায়ক। ইসলাম তো বাক্সে বদ্ধ করিয়া রাখিবার মত ধর্মমত নহে। মনুষ্যসমাজে সকলে ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারে এবং ইহার ধর্মমত গ্রহণ করিতে পারে। গান্ধীজী এই

আশা প্রকাশ করেন যে, বাংলা তথা ভারতের মুসলমানগণ ইসলামকে সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিতে দেখেন না।

শনিবার আমিষাপাড়ায় স্থানীয় ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট মৌলভী লতিফুর রহমানের নেতৃত্বে একদল প্রতিপত্তিশালী মুসলমান গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাৎ করেন। লুণ্ঠিত দ্রব্যাদি উদ্ধার এবং যক্ষ্মারোগাক্রান্ত পল্লীবাসীদের সমস্যা সম্পর্কে তাঁহারা গান্ধীজীর সহিত আলোচনা করেন।

যে সকল দরিদ্র লোক লুঠতরাজে যোগদান করিয়াছিল, তাহারা লুণ্ঠিত দ্রব্যাদি ফিরাইয়া দিতে রাজী হইয়াছে এবং তাহাদের নিকট লুণ্ঠিত যে সকল দ্রব্য আছে তাহা তাহারা ফিরাইয়া দিবে বলিয়া জানাইয়াছে।

ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট গান্ধীজীকে জানান যে, কলিকাতা প্রভৃতি বড় বড় শহরে জীবিকা-সংস্থানের জন্য যাইয়া কয়েকজন পল্লীবাসী যক্ষ্মা-রোগাক্রান্ত হয়। ইহাদের সংস্পর্শে আসিয়া আরও অনেকের এই রোগ হইতেছে। গান্ধীজী তাঁহাকে এই সকল রোগীর নাম লিখিয়া দিতে বলেন। ইহাদের চিকিৎসার ব্যবস্থার জন্য গান্ধীজী চেষ্টা করিবেন বলিয়া জানান।

শনিবার নোয়াখালির এ্যাডিসন্যাল জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ জামান আমিষা-পাড়ায় যাইয়া গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাৎ করেন।

মিঃ জামান প্রেসের প্রতিনিধিদের নিকট বলেন যে, তিনি দুর্গতদের জন্য আর এক ধরনের কুটীর নির্মাণ করিতেছেন। এই ধরনের কুটীর গান্ধীজী অনুমোদন করিবেন বলিয়া তিনি আশা করেন। প্রথমে যে ধরনের কুটীর নির্মাণ করা হইয়াছিল, তাহা গান্ধীজী মানুষের বাসের অযোগ্য বলিয়াছিলেন। এইবার তিনি যে ধরনের কুটীরনির্মাণের পরিকল্পনা করিয়াছেন সেগুলি বাখারি দিয়া নির্মাণ করা হইবে। এগুলি পূর্বেকার কুটীরের মত টেকসই হইবে না। নূতন ধরনের কুটীরগুলি গান্ধীজী অনুমোদন করিবেন বলিয়া তিনি আশা করেন।

আমিষাপাড়ায় শনিবার প্রার্থনা-সভায় প্রায় ১৫ হাজার নরনারী যোগ দেয়। ইহাদের শতকরা ৯০ জনই মুসলমান। পূর্বদিন মিঃ হোরেস আলেকজাণ্ডার এবং ৮ জন ব্রিটিশ সামরিক কর্মচারী গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন।

এই সকল সামরিক কর্মচারী শীঘ্রই স্বদেশে ফিরিয়া যাইবেন বলেন। তাঁহারা গান্ধীজীর শান্তি-অভিযানে শুভেচ্ছা জানান। ইহাদের মধ্যে একজন অস্ট্রেলিয়ান ছিলেন। তিনি গান্ধীজীকে বলেন যে, তিনি একজন সাংবাদিক। গান্ধীজী হাসিয়া বলেন, "সাংবাদিকরা বড় ভয়াবহ লোক। আমি নিজে একজন

সাংবাদিক বলিয়াই এ কথা বলিতেছি।” গান্ধীজী হাসিতে হাসিতে আরও বলেন, “অস্ট্রেলিয়া শ্বেতাঙ্গদের জন্য একচেটিয়া দেশ, শুধু বর্তমানেই নয়, ভবিষ্যতেও তাহাই থাকিবে দেখা যাইতেছে। এ ব্যাপারে ভারতবর্ষ অতিশয় অতিথিবৎসল।”

ব্রিটিশগিনি হইতে আগত পশ্চিম ভারতের মিঃ আয়ুব মহম্মদ সস্ত্রীক গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাৎ করেন। তিনি ব্রিটিশগিনিতে সাংবাদিক হিসাবে কাজ করেন।

কেন্দ্রীয় সংখ্যালঘু হিন্দু শিখ রক্ষা বোর্ডের পক্ষ হইতে শ্রীনরেন যোশী এবং সর্দার গণেশ সিং আমিষাপাড়ায় গান্ধীজীর সহিত সীমান্ত প্রদেশের হাজারা জেলার অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করেন। গান্ধীজী তাঁহাদিগকে বলেন যে, জনসাধারণ অহিংসার তাৎপর্য উপলব্ধি করিতে পারে নাই দেখা যাইতেছে। তিনি বলেন যে, তিনি হাজারা জেলার অবস্থা সম্বন্ধে জানেন এবং এ সম্পর্কে কর্তৃপক্ষকে লিখিয়াছেন।

সাতঘরিয়া

২রা ফেব্রুয়ারি রবিবার সকালে আমিষাপাড়া হইতে রওনা হইয়া গান্ধীজী সাতঘরিয়া পৌছেন। পথে গান্ধীজীকে ‘ভৌমিকবাড়ী’ ও ‘পালবাড়ী’র ধ্বংসাবশেষ দেখানো হয়। দুইটি বাড়ীই সম্পূর্ণভাবে ভস্মীভূত করা হইয়াছে। দুইখানি বাড়ীতেই বড় বড় পাকা ঘর ছিল। হাঙ্গামার সময় এই দুইখানি বাড়ীতে মোট ১৯ জনকে হত্যা করা হয়।

গান্ধীজী প্রথম যে বিধ্বস্ত বাড়ীতে যান, সেই বাড়ীর একজন লোক গান্ধীজীকে বলেন, গান্ধীজীকে তাঁহার দেওয়ার মত ভস্ম ছাড়া আর কিছুই নাই। হাঙ্গামার সময় তাঁহার বাড়ীতে ৯ জন প্রাণ হারাইয়াছে। গান্ধীজী ইহার উত্তরে বলেন, “আমার হৃদয়ের আকুল আবেদন ভগবানের কাছে, মানুষের কাছে নয়। মানুষকে কাঁদাইবার জন্য আমি এখানে আসি নাই।”

গান্ধীজী আরও বলেন, “ভগবানের ইচ্ছার নিকট আত্মসমর্পণ করা ছাড়া মানুষের আর কিছু করার নাই। কারণ ভগবানের ইচ্ছাতেই সবকিছু হইয়া থাকে। বড় বড় সাম্রাজ্য ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। হিটলার বিশ্বজয় করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁহার কি পরিণতি হইল?”

এখানকার লোকেরা এক সময় উন্মত্ত হইয়া গিয়াছিল। তাই বলিয়া হিন্দু

ও মুসলমানের মধ্যে কোন অসম্প্রীতি থাকা উচিত নয়, কারণ তাহারা পরস্পরের ভাই।

প্রার্থনা-সভায় তিনি পূর্বদিনের ট্রাষ্টি-সম্পর্কিত আলোচনার সূত্র লইয়া ভাষণ দেন। তাঁহাকে প্রশ্ন করা হয় যে, কেবলমাত্র হিংসা দ্বারাই যাহা অর্জিত হইতে পারে, সে সম্পদ কি অহিংসা দ্বারা করা যায়? ইহার উত্তরে তিনি বলেন যে, এইরূপ অর্জিত সম্পদ অহিংসা দ্বারা রক্ষা করাই যায় না এবং অহিংস হইতে হইলে ঐ সম্পদ পরিত্যাগই করিতে হয়।

খোলাখুলিই হউক বা প্রচ্ছন্নভাবেই হউক হিংসার পথ না পাইয়া কি পুঁজি (Capital accumulation) জমানো যায়?

উত্তরে গান্ধীজী বলেন যে, ব্যক্তিবিশেষ দ্বারা হিংসার পথ না লইয়া ঐরূপ ধনসঞ্চয় করা সম্ভব নয়। কিন্তু অহিংস সমাজে ঐরূপ ধনসঞ্চয় স্টেট বা রাজসত্তা কর্তৃক করা যাইতে পারে। এইরূপ করাই বাঞ্ছনীয় এবং অনিবার্য।

প্রশ্ন: যখন কোন ব্যক্তি সম্পদ সঞ্চয় করে, সে সম্পদ আর্থিকই হউক অথবা নৈতিকই হউক, সে তাহা সমাজের অপরের সহযোগিতায় বা সাহায্য দ্বারাই করিতে পারে। এইরূপ স্থলে ঐ সম্পদ নিজের সুবিধার জন্য ব্যবহার করার কি তাহার নৈতিক অধিকার আছে?

উত্তরে তিনি দৃঢ়ভাবে বলেন, অধিকার নাই। ট্রাষ্টির উত্তরাধিকারী কেমন করিয়া নিয়োজিত করা যায়? তাহার কি কেবল কোন নাম মনোনয়ন করারই অধিকার থাকিবে? উত্তরে গান্ধীজী বলেন, যিনি মালিক ছিলেন তাঁহাকেই প্রথম ট্রাষ্টি বলিয়া নির্বাচিত করা উচিত হইবে। কিন্তু এই নির্বাচন স্টেট দ্বারা স্বীকৃত হওয়া চাই। এই ব্যবস্থায় স্টেট এবং ব্যক্তি উভয়ের উপরই একটা সংযম আনে।

সান্ধ্যভ্রমণের সময় গান্ধীজী একটি মুসলমানবাড়ী যান। সেখানে ছেলে-মেয়েদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখিবার প্রতি অভিভাবকদের দৃষ্টি দিতে বলেন।

সাধুরখিল

৩রা ফেব্রুয়ারি সোমবার গান্ধীজী সাধুরখিল পৌঁছেন। সাতঘরিয়া হইতে সাধুরখিলের রাস্তা মাহুতলী গ্রামের উপর দিয়া করা হইয়াছিল। এই গ্রামের পথে একজন কতকটা বিকৃতমস্তিষ্ক লোক গান্ধীজীর হাত চাপিয়া ধরিয়া বলে, বিহারে যাহা ঘটিয়াছে সেজন্য এখানে তোমাকে গ্রেপ্তার করিলাম।

গান্ধীজী হাসিতে থাকেন। অপর সকলেও এই ব্যক্তির কাজ দেখিয়া হাসিতেছিল।

পথে গান্ধীজী একটি হিন্দুদের ভস্মীভূত গৃহ পরিদর্শন করেন এবং আমন্ত্রণ-ক্রমে কিছুক্ষণের জন্য একজন মুসলমান বাসিন্দার গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করেন।

সাধুরখিল মহাত্মাজীর পল্লী-পরিক্রমার প্রথম পর্যায়ের শেষ গ্রাম। এখানে গান্ধীজী দুইদিন অবস্থান করেন। গান্ধীজী যে বাটীতে ছিলেন সেই বাটীর মালিক শ্রীযশোদা পাল অতিথিদের যথাসাধ্য সেবাযত্ন করেন। মহামান্য অতিথির সেবাযত্নের কোন ত্রুটিই তিনি হইতে দেন নাই।

সাধুরখিলে অবস্থানকালে দ্বিতীয় দিনে স্থানীয় মুসলমানেরা গান্ধীজীকে এক সংবর্ধনা-সভায় আমন্ত্রণ করেন। এক মুসলমানবাটী-সংলগ্ন মাদ্রাসা-প্রাঙ্গণে প্রার্থনা-সভার ব্যবস্থা করা হইয়াছে শুনিয়া গান্ধীজী বলেন যে, প্রার্থনার সময় তালি সহকারে রামধুন ও আবৃত্তি করায় তাঁহাদের যদি কোন আপত্তি না থাকে তাহা হইলে তিনি অত্যন্ত খুশীমনেই তাঁহাদের আমন্ত্রণ গ্রহণ করিবেন। আমন্ত্রণকারীরা তাহাতে রাজী হন।

অপরাহ্ণে প্রার্থনা-সভায় বহুসংখ্যক মুসলমান উপস্থিত হইয়াছিলেন। এই সভায় সাধুরখিলের ১৫নং খিলপাড়া ইউনিয়নের মুসলমানদের পক্ষ হইতে গান্ধীজীকে একখানি মানপত্র দেওয়া হয়। মানপত্রটি যে আকারে উপস্থিত করা হইয়াছিল তাহাকে মানপত্র বলা চলে না। ইহাতে মহাত্মাজীর নিকট কতকগুলি বিষয় 'নিবেদন' করা হইয়াছিল। মানপত্রের উত্তরেও গান্ধীজী এই কথার উল্লেখ করিয়া বলেন যে, পত্রটি যেভাবে রচিত হইয়াছে তাহাতে ইহাকে মানপত্র বলা চলে না। পত্রখানিতে তাঁহার নিকট কয়েকটি বিষয় 'নিবেদন' করা হইয়াছে।

পত্রখানি একজন লীগ-নেতা পাঠ করেন। গান্ধীজী সাধুরখিলে আসিলে পর স্থানীয় মুসলমানগণ মুসা-মিঞা মৌলভীর বাটীসংলগ্ন মাদ্রাসা-প্রাঙ্গণে তাঁহার প্রার্থনা-সভা করার জন্য আমন্ত্রণ জানান। গান্ধীজী তাঁহাদিগকে বলেন যে, প্রার্থনায় আবৃত্তি এবং রামধুনে তাঁহাদের আপত্তি না থাকিলে তিনি খুশীমনেই তাঁহাদের আমন্ত্রণ রক্ষা করিবেন।

মানপত্রের উত্তরে গান্ধীজী যে বক্তৃতা করেন, মুসলমানগণ তাহা নিঃশব্দে শ্রবণ করেন। গান্ধীজী বলেন, দাঙ্গার প্রকৃত কারণ গো-বধ বা মসজিদের সম্মুখে বাজনা বাজানো নয়। প্রকৃত কারণ পরস্পরের মধ্যে অবিশ্বাস। এই

অবিশ্বাস যতদিন থাকিবে, ততদিন পরস্পরের মধ্যে তুচ্ছ কারণ লইয়াও দাঙ্গা বাধিতে পারে। তাঁহার নোয়াখালি আসার একমাত্র উদ্দেশ্য হইতেছে এই অবিশ্বাস দূর করা এবং স্থায়ী সৌহার্দ্য প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করা। যতদিন তাঁহাদের মধ্যে এই সম্প্রীতি না আসে ততদিন তিনি নোয়াখালি ত্যাগ করিবেন না।

প্রার্থনা-সভার পর মুসা মিঞা মৌলভী এবং মৌলভী সালমাতুল্লা সাধুরখিলের মুসলমানদের পক্ষ হইতে তাঁহাদের আমন্ত্রণরক্ষার জন্য গান্ধীজীকে কৃতজ্ঞতা জানান। গান্ধীজী সহাস্যে বলেন যে, তাঁহাদের আমন্ত্রণে তিনিও আনন্দিত হইয়াছেন।

রামগঞ্জ থানার অন্তর্গত খিলপাড়া ইউনিয়নের মুসলমানগণের পক্ষ হইতে সাধুরখিল গ্রামে গান্ধীজীকে নিম্নলিখিত মানপত্র দেওয়া হয়ঃ—

হে ভারতের শ্রেষ্ঠ মানব!

“মাসের পর মাস অতিবাহিত হইতে চলিল আপনি নোয়াখালিতে অবস্থান করিতেছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এ জেলায় দাঙ্গা হেতু আমাদের মন অশান্তিতে পরিপূর্ণ থাকায় আমরা আপনার যথোপযুক্ত সম্মান করিতে পারি নাই। এজন্য আমরা আপনার নিকট লজ্জিত আছি। কলিকাতায় দাঙ্গার অব্যবহিত পরেই নোয়াখালিতে হিন্দু-মুসলিম উভয় জাতির ভীতি ও আত্মরক্ষার চেষ্টায় কয়েক থানায় দাঙ্গা দাবানলের মত প্রজ্বলিত হইয়া পূর্বশত্রুতাসাধনের কাজে পরিণত হইয়াছে মাত্র। হিন্দু প্রতিবেশিগণের ধন, মান ও প্রাণ বাঁচাইবার জন্য স্থানীয় মুসলিম লীগ কর্মিগণ ও গ্রাম্যচাষী বিশেষে মুসলিম প্রতিবেশীরা তাহাদের সর্বপ্রকার চেষ্টা ও উপায় অবলম্বন করিয়াছে।

“আপনি এ জেলায় দাঙ্গাবিপন্ন হিন্দুদের জন্য দুঃখিত হইয়া বহুদূর আসিয়া প্রথমতঃ নৌকাযোগে, পুনরায় পদব্রজে বাড়ী বাড়ী ভ্রমণ করিয়া অবস্থা পরিদর্শন করতঃ রিলিফ ইত্যাদি সমস্ত কার্যের বন্দোবস্ত করিতেছেন। ইহা দেখিয়া আমরা সুখী হইলাম। কিন্তু এ জেলার সেবাকার্য ও পরিদর্শন প্রথমবারের নৌকাযোগে অভিযান শেষ করিয়া যদি দ্বিতীয়বার অর্থাৎ বর্তমান পদব্রজের অভিযান ও সেবাকার্য এ জেলা হইতে শতগুণে বিপন্ন বিহারী মুসলমানদের জন্য ব্যয় করিতেন, তবে আমরা ইহা হইতে সহস্রগুণ বেশী সুখী হইতাম।

“এই দেশে হিন্দু-মুসলিম দুই জাতি বহু শতাব্দী ধরিয়া পরস্পর ভাই ভাই হিসাবে বসবাস করিয়া আসিতেছে। সম্প্রতি কয়েক বৎসর হইল ভারতের

স্থানে স্থানে গো-কোরবানী ও প্রতিমা-বিসর্জন ইত্যাদি উপলক্ষ করিয়া দাঙ্গা আরম্ভ হইয়াছে। গো-বধ হিন্দুদের জন্য পাপ, কিন্তু ইহা মুসলমানদের শাস্ত্র-সম্মত কাজ। মুসলমান গোবধ করিলে হিন্দুর পাপ হইতে পারে না। তবে গো-জাতি রক্ষা করিতে যাইয়া মানবজাতি ধ্বংস করা কোন শাস্ত্রের বিধান আছে বলিয়া আমরা জানি না। আবার হিন্দুগণ প্রতিমা পূজা করিয়া জলে ফেলিয়া দিলে মুসলমানদের ধর্মের কোন ক্ষতি হয় বলিয়া আমরা মনে করি না। তবে এই খুঁটিনাটি লইয়া এত দাঙ্গা কেন? দাঙ্গা সংক্রামক ব্যাধির ন্যায় মারাত্মক। সংক্রামক ব্যাধি যেমন গ্রামের কোন মুসলমানবাড়ীতে দেখা দিলে কেবল তথায় সীমাবদ্ধ থাকে না, গ্রামে হিন্দুবাড়ী থাকিলে তথায়ও আরম্ভ হয়; ক্রমে ইহা দেশকে দেশ ছাইয়া ফেলে। দাঙ্গার অবস্থাও তদ্রূপ। তবে দাঙ্গার সূত্রপাতেই আপনি অথবা আপনার প্রতিনিধি দাঙ্গাস্থানে আসিয়া 'গো-বধ' পাপকার্য নয় বলিয়া বুঝান এবং প্রতিমা-বিসর্জনে মুসলমানদের কোন ক্ষতি নাই বলিয়া বুঝাইয়া লোকদের দাঙ্গা হইতে বিরত রাখা উচিত ছিল। রোগের প্রারম্ভে চিকিৎসা না করাতে রোগ ক্রমশঃ জটিল হইয়া পড়িয়াছে এবং বর্তমানে যে অবস্থায় দাঁড়াইয়াছে তাহাতে দেশের ভবিষ্যতে মঙ্গল নাই বলিয়া মনে হইতেছে। এদেশে কুরুপাণ্ডবের কালে একবার ধ্বংসলীলা আরম্ভ হইয়াছিল। দেশকে স্বাধীন করিতে যাইয়া এক জাতি অপর জাতিকে ধ্বংস করিতে আমরা কুত্রাপি শুনি নাই।

"আপনি ভারতের শ্রেষ্ঠ নেতা। ভারতের স্বাধীনতাই আপনার জপমন্ত্র। স্বাধীনতা লাভ করিবার জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া পথের কাঙাল সাজিয়াছেন, আর স্বাধীনতা ভোগকারীরা দাঙ্গা করিতে করিতে বিধ্বস্ত হইতেছে। ভারতবাসীরা এভাবে ধ্বংস হইলে স্বাধীনতা ভোগ করিবে কাহারা? শেষ-কালে পাণ্ডবদের যুদ্ধজয়ের অবস্থার মত দেশের অবস্থা দাঁড়াইবে। আপনারা 'অখণ্ড' ভারত ও মুসলমানগণ 'খণ্ড' ভারত লইয়া জিদ ধরিয়াছেন। খণ্ড ভারত হইলেও ভারত হিন্দু-মুসলিম রাজত্বের সময় যে রকম ছিল, এখনও তদ্রূপ থাকিবে; তবে কালের গতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিয়া ভারতের সংখ্যা-গরিষ্ঠদের জাতীয় কৃষ্টি বজায় রাখিবার জন্য যে প্রদেশে ভারতের সংখ্যালঘিষ্ঠরা সংখ্যাগরিষ্ঠ, সে প্রদেশে সে জাতি অপর জাতির ধর্ম ও স্বার্থরক্ষা করিয়া দেশ-শাসন চালাইবে। তবে এজন্য এত মারামারি কাটাকাটি কেন? যদি এদেশে দাঙ্গা না হইত তবে অখণ্ড ভারতের প্রচার চলিতে পারিত। কিন্তু যখন

পুনঃপুনঃ দাঙ্গার পর দাঙ্গা হইয়া গেল, তখনও ভারতকে অখণ্ড রাখার অর্থ ভারতের সংখ্যালঘিষ্ঠ জাতিকে চিরতরে পদানত রাখার ব্যবস্থা নয় কি ?

"হে ভারতের শ্রেষ্ঠ নেতা ! আপনি বলিয়াছিলেন, এ জেলায় থাকিয়া বিহারের সমস্যা সমাধান করিবেন, করুন। বিহার কেন, আমরা আপনাকে অনুরোধ করি, আপনি এখানে থাকিয়া অনতিবিলম্বে ভারতের সমস্ত নেতৃবৃন্দকে ডাকিয়া সমগ্র ভারতের সমস্যার সমাধান করুন, তাহাতে আপনার যশও বৃদ্ধি পাউক, আমাদের চক্ষুও সার্থক হউক এবং জীবনের শান্তি ফিরিয়া আসুক। আপনি ভারতের স্বাধীনতার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেছেন, সেকথা আমাদের অজানা নাই। তবে বর্তমান আকারের আত্মবিবাদের সমাধান না হইলে ভারত চিরতরে অশান্তির অতলগর্ভে নিমজ্জিত থাকিবে। ভারতের অশান্তিতে আপনার অশান্তি। ভারতের শান্তিতে আপনার শান্তি ও সুনাম।

"আপনি বর্তমান যুগে ভারতের কেন, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নেতা, বিশেষতঃ আপনি ভারতবাসী, আপনার নিকট আমাদের এই দাবি—আপনি এখানে থাকিয়া ভারতের সংখ্যালঘিষ্ঠ জাতিদের আত্মনিয়ন্ত্রণ ও জাতির কৃষ্টি বজায় রাখার জন্য তাহাদের দাবি সমর্থন করিয়া ভারতের আত্মবিবাদ মিটাইয়া দিয়া সম্মিলিতভাবে ভারতের মুক্তি-সংগ্রামকে জয়যুক্ত করুন।

"হে মিলনের অগ্রদূত ! আপনি শান্তিস্থাপনের উদ্দেশ্যে এ জেলায় অবস্থান করিতেছেন ইহাতে আমরা সন্তুষ্ট। তবে বর্তমানে এ জেলার এক জাতি অপর জাতির উপর দোষী ও নির্দোষ নির্বিশেষে আসামী শ্রেণীভুক্ত করিয়া যে সমস্ত মোকর্দমা দায়ের করিয়াছে, তাহাতে দেশে শান্তির পরিবর্তে অশান্তি সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা বেশী। তাই আমরা আপনাকে অনুরোধ করিতেছি, কিভাবে এখানে প্রকৃত শান্তি স্থাপিত হইবে, আপনি তাহার পথনির্দেশ করুন। অবশেষে আমরা আপনার দীর্ঘায়ু কামনা করি।"

সাধুরখিলে প্রথমদিন প্রার্থনা-সভা গান্ধীজীর বাসস্থানের কিছুদূরে একটি খোলা মাঠে হয়। এইদিন সভায় হিন্দু-মুসলমান সংখ্যায় প্রায় সমান সমান উপস্থিত ছিলেন।

মহাত্মাজী তাঁহার প্রার্থনান্তিক বক্তৃতায় নিখিল ভারত মুসলিম লীগের করাচী অধিবেশনের প্রস্তাবটি উল্লেখ করিয়া বলেন, আমি আবার মুসলমান

ভাইদের অনুরোধ করিব তাঁহারা যেন গণপরিষদে যোগ দেন এবং তাঁহাদের বক্তব্যসমূহ ঐ পরিষদে পেশ করিয়া পরিষদকেই যেন তাঁহারা নিজের মতে আনিতে চেষ্টা করেন। আমি আশা করি, আমার মুসলমান ভাইরা একমাত্র তরবারির শক্তির উপরেই তাঁহাদের আস্থা স্থাপন করেন না ; সুতরাং সেক্ষেত্রে তাঁহাদের নিজেদের ও ভারতের মঙ্গলের জন্য তাঁহাদের গণপরিষদে যোগদানই একমাত্র কর্তব্য।

ব্রিটিশের সম্বন্ধে মহাত্মাজী বলেন যে, তাহারা ১৬ই মে তারিখের ঘোষণা অনুযায়ী কার্য করিতে বাধ্য। লীগের সাম্প্রতিক প্রস্তাবে কংগ্রেস প্রস্তাব সম্পর্কে কপটতার অভিযোগ করা হইয়াছে ; গণপরিষদের নির্বাচন ও অন্যান্য কার্যাবলীকেও বেআইনী বলা হইয়াছে। মহাত্মা গান্ধী বলেন, কোন দুইটি লব্ধপ্রতিষ্ঠ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে, একের অপরকে অসম্মান করা সাজে না। একে অপরকে শত্রু বলিয়া বিবেচনা করারও কোনই কারণ নাই। ইহার দ্বারা স্বাধীনতার পথ মুক্ত করা সম্ভব হইবে না। গণপরিষদের কার্য যদি বে-আইনীই হইয়া থাকে, তবে সে সম্বন্ধে আদালতে অভিযোগ জানানো উচিত। আর যদি সেই ১৯২০ সালের মত আদালতকে তাঁহারা স্বীকার না করেন, তবে বেআইনীর প্রশ্নই উঠিয়া যায়। মহাত্মা গান্ধী তাই লীগ-নেতাদের গণপরিষদে যোগদানের জন্য অনুরোধ জানাইবেন। যদি কিছুতেই যোগদান না করেন, তবে যেন তাঁহারা অপেক্ষা করিয়া পরিষদের ঐকান্তিকতার বিচার করিয়া দেখেন, তাঁহারা কিরূপে মুসলমান-সমস্যার সমাধান করেন। তরবারির দ্বারা মীমাংসা না করিতে হইলে ইহাই একমাত্র পথ। লীগপন্থীরা বলিয়াছেন, গণ-পরিষদ কেবলমাত্র হিন্দুদেরই প্রতিনিধি, কিন্তু কার্যতঃ গণপরিষদে তপসিলী, খ্রীষ্টান, পার্শী, এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান, যাঁহারা নিজেদের ভারতমাতার সন্তান বলিয়া মনে করেন, তাঁহাদের সকলেরই প্রতিনিধি আছেন। ডাঃ আম্বেদকর পরিষদে যোগ দিয়া বুদ্ধিমানের কাজই করিয়াছেন।

ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট সম্বন্ধে গান্ধীজী বলেন, তিনি আশা করেন, আর যাহাই হউক না কেন, তাহারা নিজেদের ঘোষণা অনুযায়ীই কাজ করিবে। পরিশেষে মহাত্মাজী সমবেত জনতার উদ্দেশে বলেন, হিন্দু ও মুসলমান একে অপরের শত্রু নহে।

তিনি হিন্দু-মুসলমান জনসাধারণকে সতর্ক করিয়া বলেন যে, তাহারা যেন পরস্পর পরস্পরকে শত্রু বলিয়া মনে না করে। লীগ উক্ত মর্মে কোন

ঘোষণা করে নাই। রাজনৈতিক বিবাদ যেন রাজনীতির নেতৃবৃন্দের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। বিবাদ গ্রামবাসীদের মধ্যে সংক্রামিত হইলে বিপর্যয় রোধ করা যাইবে না। পারস্পরিক সামঞ্জস্য বধান ও বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণের মধ্য দিয়াই ভারতের মুক্তি লাভ হইবে, অস্ত্রের হানাহানিতে তাহা সম্ভব হইবে না।

প্রার্থনার পর গান্ধীজী স্থানীয় একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমন করেন; ঐ স্থানে ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট মৌলবী ইলিয়াস তাঁহাকে অভ্যর্থনা করেন।

মহাত্মা গান্ধীর পল্লী-পরিক্রমার সার্থকতা ও সম্ভাব্যতা

প্রথম পর্যায়

মহাত্মাজীর পল্লী-পরিক্রমার অনুরূপ দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাসে দুর্লভ। কোন মত প্রতিষ্ঠার প্রয়াস নাই, কোন বিশেষ ধর্মের আহ্বান নাই, আয়োজনকে চিত্তাকর্ষক করিবার কোন সমারোহ নাই—আছে শুধু সত্যকে জানিবার—বুঝিবার আগ্রহ, সত্যকে প্রতিষ্ঠা দিবার পরিবেশ সৃষ্টি। সত্যাগ্রহীর সর্বশ্রেষ্ঠ কাজ।

গান্ধীজী তাঁহার পল্লী-পরিক্রমার প্রথম পর্যায়ে রামগঞ্জ ও বেগমগঞ্জ থানার অন্তর্গত ত্রিশটি গ্রাম পরিভ্রমণ করেন। গ্রামগুলির নাম—শ্রীরামপুর, চণ্ডীপুর, মসিমপুর, ফতেপুর, দাসপাড়া, জগৎপুর, লামচর, করপাড়া, সাহাপুর, ভাটিয়ালপুর, নারায়ণপুর, রামদেবপুর, পরকোট, বাদলকোট, আতাখোরা, শিরণ্ডি, কেথুরি, পাণিয়ালা, দলতা, মুরাইম, হীরাপুর, বান্সা, পাল্লা, পাঁচগাঁও, জয়াগ, আমকী, নবগ্রাম, আমিষাপাড়া, সাতঘরিয়া, সাধুরখিল। প্রথম পর্যায়ের পরিক্রমায় গান্ধীজী প্রায় ৮০ মাইল হাঁটিয়াছেন। তাহা ছাড়া সান্ধ্যভ্রমণে পল্লীবাসীদের বাড়ী যাওয়া উপলক্ষে তিনি আরও প্রায় ৪০ মাইল হাঁটিয়াছেন।

পল্লী-পরিক্রমার সময় স্থানীয় মুসলমান জনসাধারণ মহাত্মাজীর উদ্দেশ্য এবং তাঁহার ব্যক্তিত্বের নিরপেক্ষ গুণাবলী ও অম্লান মাধুর্যকে দিনের পর দিন কি ভাবে গ্রহণ করিয়াছে নিম্নে তাহার বিবরণ হইতে তাঁহার পল্লী-পরিক্রমার ফলাফল সম্পর্কে জনসাধারণ তাঁহাদের অন্তরের প্রশ্নের একটা জবাব খুঁজিয়া পাইবেন বলিয়া আমার বিশ্বাস।

প্রতিদিনকার যে বিবরণ নিম্নে দেওয়া হইল, তাহা হইতে আমরা দেখিতে পাই—মুসলিম জনগণ তাঁহার সান্নিধ্য ত্যাগ করে নাই। মহান্ অতিথিকে অভ্যর্থনা করিয়া কেহ কেহ তাঁহাদের অন্তঃপুরেও লইয়া গিয়াছেন, কেহ কেহ নানা প্রশ্ন করিয়া সমস্যাটা কোথায় তাহা জানিতে চাহিয়াছেন, কেহ কেহ প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন প্রতিবেশী সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকেরা যাহাতে নিরাপদে এবং শান্তিতে বসবাস করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা তাঁহারা করিবেন,—এমন

কি লুণ্ঠিত দ্রব্যও ফিরাইয়া দিবেন এমন আশ্বাস দিতেও কেহ কেহ কুণ্ঠাবোধ করেন নাই। হিন্দুদের মধ্যে যাঁহারা উপদ্রুত হইয়া অথবা উপদ্রবের ভয়ে দেশত্যাগী হইয়াছিলেন, দেশে ফিরিতে ভরসা পাইতেছিলেন না, তাঁহারাও ক্রমে ক্রমে উপলব্ধি করিয়াছেন—সুখে হউক, দুঃখে হউক যে ভূমিতে তাঁহারা জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, যে ভূমির ঐতিহাসিক বিবর্তনে তাঁহাদের মানসিক সম্পদ সঞ্চিত হইয়াছে—সেই ভূমির অপর বাসিন্দাদের সহিত তাঁহাদিগকে বসবাস করিতেই হইবে, অন্যথায় কোথাও তাঁহাদের স্থান হইবে না।

গান্ধীজী যখনই কোন মুসলমানবাটী হইতে আমন্ত্রণ পাইয়াছেন, তখনই সেই বাটীতে গিয়া বাটীর লোকজনের সহিত দেখা-সাক্ষাৎ করিয়াছেন, পরম আত্মীয়ের ন্যায় তাহাদের সহিত কথাবার্তা বলিয়াছেন, আলাপ-আলোচনা করিয়াছেন এবং নানা বিষয়ে তাহাদের উপদেশ দিয়াছেন। তাহা ছাড়া বিনা আমন্ত্রণেও তিনি প্রাতঃ-পরিক্রমণ ও সান্ধ্যভ্রমণের সময় বহু মুসলমানবাটীতে গিয়াছেন। প্রত্যেক বাটীতেই তাঁহাকে সাদর অভ্যর্থনা জানানো হইয়াছে। গান্ধীজীর প্রতি তাহাদের প্রীতিস্বরূপ তাহারা তাঁহাকে কমলালেবু ও ডাব উপহার দিয়াছে। গান্ধীজীকে তাহাদের বাটীতে লওয়ার জন্য সর্বদাই তাহাদের মধ্যে আন্তরিক আগ্রহ দেখা গিয়াছে। গান্ধীজীকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য প্রাচুর্যের প্রয়োজন হয় না। দরিদ্র দেখিলে তিনি যেন তাহাকে আরও আপন করিয়া লইতে চাহেন। দারিদ্র্যকে তিনি অন্তরের সহিত ঘৃণা করেন। সেইজন্যই দরিদ্রদের প্রতি তাঁহার এই অগাধ সহানুভূতি।

মুসলমানদের মধ্যে পর্দা-প্রথা অত্যন্ত কঠোর। গান্ধীজীর সহিত সর্বদাই কিছু কিছু লোকজন থাকার জন্য মুসলমানবাটীতে গেলে তাঁহাকে বাহিরের বৈঠকখানায় বসিতে দেওয়া হইত। অবশ্য প্রায়ই বাটীর স্ত্রীলোকদের অনুরোধ রক্ষা করিবার জন্য গান্ধীজীকে অন্তঃপুরে যাইয়া তাঁহাদের দর্শন দিতে হইত। গান্ধীজীকে এককোয়া কমলালেবু বা একটু ডাবের জল খাওয়াইবার জন্য তাঁহাদের কি আন্তরিক আগ্রহ! ফতেপুরে ইব্রাহিম সাহেবের আতিথ্য এবং নারায়ণপুর ও মুরাইমে যথাক্রমে বাদশা মিঞা আমিন ও হবিবুল্লা পাটোয়ারীর গৃহে তাঁহাদের আতিথ্যের কথা উল্লেখ করিয়া গান্ধীজী বলিয়াছেন—'তাঁহাদের আন্তরিকতায় মুগ্ধ হইয়াছি।'

১৪ই জানুয়ারি প্রাতঃ-পরিক্রমণের সময় গান্ধীজী মহম্মদ ইদ্রীস, আবদুল মজিদ ও মিঞা জান নামে তিনজন মুসলমানের বাটী যান। মহম্মদ ইদ্রীস

আগের দিন সকালে সাহাপুরে আসিয়া গান্ধীজীকে তাঁহার ভাটিয়ালপুর গ্রামের বাটীতে একবারের জন্য যাইতে অনুরোধ করেন। গান্ধীজী পরদিন ভাটিয়ালপুর যাইবার পথে সম্ভব হইলে তাঁহার অনুরোধ অবশ্যই রক্ষা করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দেন। ইদ্রীস সাহেবের সহিত আমার কিছুক্ষণ আলাপ হয়। আমার একটি প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন—'১৯২১ সালে খিলাফত আন্দোলনের সময় তিনি গান্ধীজীকে প্রথম দেখিয়াছিলেন, তাহার পর দীর্ঘ ২৫ বৎসর পরে আবার তাঁহার দর্শন লাভ করিলেন। পার্থক্য এই যে, সে সময় গান্ধীজীর দর্শনলাভ করিতে তাঁহাকে বেশ বেগ পাইতে হইয়াছিল, কিন্তু এবারে অতি সহজেই তাঁহার দর্শনলাভ করিলেন।' তিনি আরও বলেন যে, 'গান্ধীজীকে তাঁহার বাটীতে লইয়া যাওয়ার 'বরাত' যে কোনদিন তাঁহার আসিবে একথা তিনি কখন কল্পনাও করেন নাই। আজ 'খোদা' তাঁহাকে যে সৌভাগ্য জুটাইয়া দিয়াছেন সে সৌভাগ্য তিনি ছাড়িবেন কেন?'

পরদিন গান্ধীজী সকালে ভাটিয়ালপুরের কাছাকাছি পৌঁছিলে পথে ইদ্রীস সাহেব তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁহাকে তাঁহার বাটীতে লইয়া যান। বাটীর বৈঠকখানার একপাশে গান্ধীজীর বসিবার জন্য একটি চেয়ার ও টেবিল সাজাইয়া রাখা হইয়াছিল। টেবিলের উপর একপাশে কতকগুলি কমলালেবু ও দুইটি ডাব গান্ধীজীর জন্য রাখা হইয়াছিল। ইদ্রীস সাহেবকে করজোড়ে তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইতে দেখিয়া গান্ধীজী সহাস্যবদনে বলেন, "কেমন, আপনার বাটীতে আসলাম তো।" অতঃপর গান্ধীজী নিজহস্তে কমলালেবুগুলি উপস্থিত বালক-বালিকাদের মধ্যে বিলাইয়া দেন। ইদ্রীস সাহেব জানান যে, বাটীর মহিলারা তাঁহাকে দেখিতে চাহিতেছেন। গান্ধীজী ভিতরে গিয়া তাঁহাদের দর্শন দেন। এই স্থানে বাটীর স্ত্রীলোকদের সহিত গান্ধীজীর একখানি ফটো তোলা হয়।

মহম্মদ ইদ্রীসের বাটী যাওয়ার পূর্বে গান্ধীজী পথে আরও দুইটি মুসলমান বন্ধুর বাটীতে যান। প্রথম যেখানে যান, সে বাটীর মালিকের নাম আবদুল মজিদ। বহির্বাটীতে গান্ধীজীকে বসিতে দেওয়া হয়। মজিদ সাহেব ও বাটীর অন্যান্য লোকজন গান্ধীজীকে সাদর অভ্যর্থনা জানান। একজনের ক্রোড়ে একটি শিশু ছিল। শিশুটির মুখে একজিমা হইয়া মুখ অসাধারণ ফুলিয়া ছিল। গান্ধীজী বিশেষ আগ্রহের সহিত শিশুটির বিষয় জিজ্ঞাসা করেন এবং ডাঃ সুশীলা নায়ারকে শিশুটিকে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে বলেন। ডাঃ নায়ার শিশুটিকে পরীক্ষা করিয়া ঔষধের বন্দোবস্ত যাহাতে হয় সে ব্যবস্থা করেন।

আসিবার সময় গান্ধীজী ডাঃ নায়ার ও শ্রীমতী মানু গান্ধীকে বাটীর স্ত্রীলোকদের সহিত আলাপ করিয়া আসিতে বলেন। ডাঃ নায়ার ও শ্রীমতী মানু গান্ধী বাটীর ভিতরে গিয়া স্ত্রীলোকদের সহিত প্রায় ১০ মিনিট ধরিয়া কথাবার্তা বলেন।

অতঃপর গান্ধীজী যে বাটীতে যান, সে বাটীর মালিকের নাম মিঞাজান। মিঞাজান অতি বৃদ্ধ। গান্ধীজী বাটীর ভিতরে যাইতে চাহিলে বৃদ্ধ প্রথমতঃ ইতস্ততঃ করে। গান্ধীজী বুঝিতে পারিয়া সহাস্যবদনে বলেন—আচ্ছা, আমি ভিতরে যাইতে চাহি না। আমার সাথে যে দুইজন মেয়ে আছে তাহারাই ভিতরে যাউক। উপস্থিত সকলে বৃদ্ধের বিব্রত ভাব দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিয়া করিয়া উঠে। অতঃপর বৃদ্ধ গান্ধীজীকে ভিতরে যাইতে দিতে রাজী হন এবং তাঁহারা তিনজন বৃদ্ধের পিছন পিছন বাটীর ভিতর যান। মুসলমান পারিবারিক জীবনে পর্দাপ্রথার কঠোরতার জন্য গান্ধীজীর সহিত আর যাঁহারা থাকেন, তাঁহাদের সকলকেই সব ক্ষেত্রেই বাহিরে অপেক্ষা করিয়া থাকিতে হয়। গান্ধীজী সাধারণতঃ বাটীর মহিলাদের পর্দাপ্রথার কঠোরতা দূর করিয়া হিন্দু নারীদের ন্যায় প্রতিবেশিগণের সহিত মেলামেশা করিতে উপদেশ দেন। তাঁহাদের কিছুক্ষণ করিয়া চরকা কাটিতে ও শিক্ষালাভের প্রতি উৎসাহী হইতে বলেন। তিনি বলেন যে, বাটীর মহিলারা যদি প্রত্যহ কিছুক্ষণ করিয়া চরকা কাটে তাহা হইলে তাহাদের বস্ত্র-সমস্যার কিছুটা সমাধান হইতে পারে।

ভাটিয়ালপুরে গান্ধীজী প্রার্থনা-সভার পর, যে বাটীতে ছিলেন সেই বাটীতে গৃহদেবতার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। ধূপ, ধূনা শাঁখ, কাসর, ঘণ্টা ও হরিধ্বনিতে ঠাকুরঘরসংলগ্ন প্রাঙ্গণ মুখর হইয়া উঠে এবং চারিদিকে এক অপূর্ব পরিবেশের সৃষ্টি হয়। হাঙ্গামার তিন মাস পরে সেদিন আবার প্রথম স্থানীয় হিন্দুরা প্রাণ ভরিয়া হরিধ্বনি করিল। ঠিক যখন হরিধ্বনি চলিতেছে এই সময় স্থানীয় অধিবাসী আবদুল রেজ্জাক, মিঃ খালেক ও আরও কয়েকজন মুসলমানকে ভীড় ঠেলিয়া গান্ধীজীর সম্মুখে হাজির হইতে দেখা যায়। তাঁহারা গান্ধীজীকে বলেন যে, স্থানীয় হিন্দুরা যাহাতে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে তাহাদের ধর্মাচরণ করিতে পারে এখন হইতে সে বিষয়ে তাঁহারা যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন। গান্ধীজী তাঁহাদের বলেন—সে তো খুব ভাল কথা। ঈশ্বর তো আসলে একই, যেভাবেই আমরা তাঁহাকে ডাকি না কেন।

গান্ধীজীর সান্ধ্যভ্রমণের সময় স্থানীয় উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের কয়েকজন ছাত্র গান্ধীজীকে কয়েকটি প্রশ্ন করেন। গান্ধীজী ধৈর্যের সহিত সব কয়টি

প্রশ্ন শুনেন এবং একে একে প্রত্যেকটির উত্তর দেন। পরে তাহাদের সহিত কথাবার্তাকালে তাহারা বলে যে, তাহাদের সব কয়টি প্রশ্নের উত্তর মিলিলেও গান্ধীজী বিহার না যাওয়া সম্পর্কে যাহা বলিয়াছেন উহা তাহাদের মনঃপূত হয় নাই। তাহারা আরও বলে যে, গান্ধীজীর যুক্তির পর অবশ্য আর কোন যুক্তিই খাটে না।

ভাটিয়ালপুর হইতে নারায়ণপুর যাইবার পথে গান্ধীজী ডুরে আলি মিঞা নামে একজন মুসলমানের বাড়ী যান। গান্ধীজীকে বাহিরে একখানি ভাঙ্গা চেয়ারে বসিতে দেওয়া হয়। গান্ধীজী ডাঃ সুশীলা নায়ার ও শ্রীমতী মানু গান্ধীকে বাটীর ভিতর গিয়া মেয়েদের সহিত আলাপ করিয়া আসিতে বলেন। ইহার পর ডাঃ নায়ার ও শ্রীমতী মানু গান্ধী বাটীর ভিতর যান। গান্ধীজী এই সময় বাটীর লোকদের সহিত কথাবার্তা বলেন। তিনি এই বাটীতে কতজন লোক থাকেন এবং তাঁহাদের কতখানি জমি আছে জানিতে চাহেন এবং এই ধরনের আরও ছোটখাট প্রশ্ন করেন। তাঁহারাও প্রত্যেকটির উত্তর দেন।

নারায়ণপুরে গান্ধীজী বাদশা মিঞা আমিন নামে জনৈক মুসলমান গৃহস্থের বাটীতে অতিথি হন। বাদশা মিঞা আমিনরা পাঁচ ভাই। তাঁহারা গান্ধীজীর যত্নের ক্রটি করেন নাই। গান্ধীজীর সুবিধা-অসুবিধার প্রতি লক্ষ্য রাখিবার জন্য বাটীর সকলকেই সমস্ত দিন কর্মব্যস্ত হইয়া ছুটাছুটি করিতে দেখা যায়। পরদিন সকালে বিদায়গ্রহণের সময় বাদশা মিঞা আমিন ও বাটীর কয়েকজন গান্ধীজীর নির্গমন-পথে করজোড়ে দাঁড়াইয়া থাকেন এবং গান্ধীজী ঘর হইতে বাহির হইবামাত্র মস্তক অবনত করিয়া প্রাতঃপ্রণাম জানান। গান্ধীজী মুসলমান মতে "খোদাহাফেজ" বলিয়া বিদায়গ্রহণের সময় সহাস্যবদনে রসিকতা করিয়া বলেন—একদিনের জন্য আপনাদের আতিথ্য গ্রহণ করিতে চাহিয়াছিলাম। সময়ের মেয়াদ ফুরাইয়াছে, তাই এখন বুঝি আমাকে তাড়াইয়া দিতেছেন। গান্ধীজীর রসিকতা বুঝিয়া উপস্থিত সকলেই হাসিতে থাকে। গ্রামের অনেক মুসলমানও বৈঠকখানার প্রাঙ্গণে সমবেত হইয়াছিলেন। গান্ধীজী বাহির হইলে তাঁহারা গান্ধীজীকে 'আদাব' জানান এবং বহুদূর পর্যন্ত তাঁহারা গান্ধীজীর অনুগমন করেন।

নারায়ণপুরের পর রামদেবপুর, পরকোট, বদলকোট ও আতাখোরায় গান্ধীজী মুসলমানবাটী হইতে বিশেষ আমন্ত্রণ পান না। গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে

ভ্রমণের সময় পথিপার্শ্বে অপেক্ষমান মুসলমানদের মধ্যে গান্ধীজীকে দেখিবার জন্য সর্বদাই একটা আগ্রহ দেখা গিয়াছে।

আতাখোরা হইতে শিরণ্ডী যাইবার পথে গান্ধীজী তিনটি মুসলমানবাটীতে যান। শিরণ্ডী হইতে খাদিপ্রতিষ্ঠানের অরুণাংশু বাবু আতাখোরায় আসিয়াছিলেন। তিনি আতাখোরা হইতে শিরণ্ডী পর্যন্ত গান্ধীজীর অনুগমন করেন। তাঁহার নেতৃত্বে পথে 'বন্দে মাতরম্' ও 'আল্লা-হো-আকবর' ধ্বনি করা হয়। এইরূপ ধ্বনি গান্ধীজীর গ্রাম হইতে গ্রামান্তর ভ্রমণপথে ইহাই সর্বপ্রথম। বহু মুসলমান গ্রামবাসীও গান্ধীজীর অনুগমন করিতেছিলেন। ডাঃ সুশীলা নায়ার, শ্রীমতী আভা গান্ধী ও শ্রীমতী মানু গান্ধীও এইদিন গান্ধীজীর সহিত ছিলেন। তাঁহারা "কৃষ্ণ ও করিম", "রাম ও রহিম" নামকীর্তন করিতে করিতে গান্ধীজীর অনুগমন করিতেছিলেন। গান্ধীজী প্রথম যে মুসলমানবাটী যান, সেই বাটীর মালিকের নাম আবদুল লতিফ পণ্ডিত। আবদুল লতিফ মুসলমানমতে গান্ধীজীকে 'সেলাম' জানাইয়া একখানি চেয়ার আগাইয়া দিয়া তাঁহাকে আসন গ্রহণ করিতে বলেন। গান্ধীজী আসন গ্রহণ করিলে ডাঃ নায়ার, শ্রীমতী আভা গান্ধী ও শ্রীমতী মানু গান্ধী বাটীর ভিতরে স্ত্রীলোকদের সহিত আলাপ-পরিচয় করিতে যান।

সেখান হইতে রওনা হইয়া কিছুদূর অগ্রসর হইলে পথিমধ্যে ফজলুল কারী নামে একজন মুসলমান গান্ধীজীকে 'সেলাম' জানাইয়া তাঁহাকে পাঁচ মিনিটের জন্য একবার তাঁহার বাটীতে বসিয়া যাইতে অনুরোধ করেন। গান্ধীজী চলিতে চলিতে সহাস্যবদনে তাঁহাকে বলেন—আচ্ছা, আচ্ছা চলো। গান্ধীজীর যাওয়ার পথের পাশেই এই মুসলমান ভদ্রলোকের বাটীর বৈঠকখানার সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে গান্ধীজীর বসিবার জন্য একটি মঞ্চ নির্মাণ করা হইয়াছিল। মঞ্চের উপরে একটি সুন্দর চাঁদোয়া খাটান হইয়াছিল। পুষ্প ও পত্রে মঞ্চের চারিদিক সুসজ্জিত করা হইয়াছিল। একরাশ কমলালেবু ও ডাব গান্ধীজীর জন্য একপাশে সযত্নে সাজান ছিল। সমস্ত জাঁকজমক ও আড়ম্বর দেখিয়া বুঝা যাইতেছিল যে, গান্ধীজীর প্রতি এই মুসলমান পরিবারের শ্রদ্ধা ও ভালবাসা কত আন্তরিক। গান্ধীজী আসন গ্রহণ করিলে "বন্দে মাতরম্" ও "আল্লা-হো-আকবর" ধ্বনি করা হয়। কয়েকজন মুসলমানও এই ধ্বনিতে যোগদান করেন। ইহাতে স্থানীয় একজন মুসলমান উত্তেজিত হইয়া বলিয়া উঠেন, আপনারা এখানে যাহারা মুসলমান আছেন তাঁহারা 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনিতে যোগদান করিবেন না। ডাঃ নায়ার

ইহার উত্তরে তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বলেন—আমরা হিন্দুরা 'আল্লা-হো-আকবর' ধ্বনি করিতে পারি, আপনাদের 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি করিতে আপত্তির কি কারণ থাকিতে পারে। উত্তরে তিনি বলেন—আপত্তির কারণ আছে। কিন্তু কারণটা কি তাহা আর বুঝাইয়া বলিলেন না।

গান্ধীজী আসন গ্রহণ করিয়া স্তূপীকৃত কমলালেবুগুলির দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিলেন—সমস্তগুলিই কি আমাকে খাইতে হইবে? অতঃপর তিনি নিজহস্তে সেগুলি উপস্থিত বালক-বালিকাদের মধ্যে বিতরণ করেন।

পথে গান্ধীজী আর একজন মুসলমানের বাড়ী যান, এখানেও বাড়ীর লোকজন বিশেষ সমাদরের সহিত গান্ধীজীকে অভ্যর্থনা করে। একজন যুবক বাটীর মধ্যে দৌড়াইয়া গিয়া গান্ধীজীর বসিবার জন্য একটি চেয়ার লইয়া আসে।

শিরণ্ডীতে গান্ধীজী যে বাটীতে উঠেন সেই বাটীতে ঢুকিবামাত্রই মনে হইল চারিদিকে কেমন একটা থমথমে ভাব। আঙ্গিনা দিয়া লোকজন চলাফেরা করিতেছিল। কিন্তু কাহারও মুখে টু-শব্দটি পর্যন্ত নাই। কারণটা সকলেরই জানা ছিল, একজন মুসলমানরমণী হিন্দু-মুসলিম ঐক্যসাধনের জন্য প্রাণ দিতে বসিয়াছেন। গান্ধীজীর পরম অনুগতা শিষ্যা তিনি। তিনি প্রথমে এই গ্রামে আসিয়া দেখিলেন, মানুষ হিংসা ও অসত্যের পথে ইসলামের মহত্বকে অবনমিত করিয়াছে। স্থানীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নারী ও পুরুষদের দুর্দশা দেখিয়া তাঁহার অন্তরের মানুষ কাঁদিয়া উঠিল।

গান্ধীজী যেদিন শিরণ্ডী পৌছেন সেইদিন আমতুস সালামের অনশনের পঞ্চবিংশতি দিবস। এই দিন বেলা ১টা পর্যন্ত গান্ধীজীর মৌনের সময় নির্দিষ্ট ছিল। গান্ধীজী আমতুস সালামের শয্যাপার্শ্বে স্থান গ্রহণ করিয়া ডান হাত তাঁহার মস্তকে রাখিয়া বহুক্ষণ ধরিয়া নিবিষ্টচক্ষে তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া থাকেন।

এই দিন গান্ধীজী মৌন অবসানের পর রামগঞ্জ থানার মুসলমানদের পক্ষ হইতে একদল প্রতিনিধি আমতুস সালামের অনশন সম্পর্কে তাঁহাদের মতামত জানাইবার জন্য গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাৎ করেন। প্রতিনিধিদলে ছিলেন রামগঞ্জ থানা মুসলিম লীগ-সম্পাদক মিঃ এম. এ. রসিদ, মিঃ আনোয়ার উল্লা, কর্মী এ. মতিম চৌধুরী, এ. লতিফ পাল, ফজলুলহক কারী, এইচ. পাটোয়ারী, এ খালের পণ্ডিত ও আমিহুল্লা চৌধুরী প্রভৃতি। গান্ধীজীর সহিত তাঁহাদের কথাবার্তা ও পরিশেষে হিন্দুদের ধর্মাচরণে পূর্ণ স্বাধীনতাদানের প্রতিশ্রুতি এবং

বিবি আমতুস সালামের অনশনভঙ্গ সম্পর্কে আগেই আনুপূর্বিক বিবৃত করিয়াছি। সুতরাং এস্থানে তাহার আর পুনরাবৃত্তি করিতে চাই না।

এখানে শুধু এইটুকুই বলিতে চাই যে, এইভাবে অখ্যাত এক সুদূর গ্রামে গান্ধীজীর শুভ আগমনে সত্য ও অহিংসার পথে ভারতের একটি বিরাট সমস্যার সমাধান ক্ষুদ্রাকারে অথচ পূর্ণাঙ্গভাবে আত্মপ্রকাশ করিল। গান্ধীজীর হৃদয়জয়ের অভিযানের প্রথম পর্ব এইভাবে সাফল্যের গৌরবে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। গান্ধীজীর সহিত এই প্রতিনিধিদলের সমস্তদিন ধরিয়া কথাবার্তা আলাপ-আলোচনা হইতে তাঁহাদের আন্তরিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। গান্ধীজীও সারাক্ষণ ধরিয়া তাঁহাদের সহিত যেভাবে কথাবার্তা চালাইয়াছেন, তাহাতে ইহাও স্পষ্ট হইয়া উঠে যে, গান্ধীজী শেষ পর্যন্ত তাঁহাদের আন্তরিকতায় নিঃসন্দেহ হইয়াই তবে আমতুস সালামকে অনশনত্যাগের অনুরোধ করিয়াছিলেন।

গান্ধীজীর গ্রাম হইতে গ্রামান্তর ভ্রমণের পথে পরবর্তী তিনটি গ্রামে তিনি কোন মুসলমানবাড়ী হইতে আমন্ত্রণ পান না। এই তিনটি গ্রামে একটা জিনিস লক্ষ্যে পড়িল, যাহা যতই দিন যাইতেছিল ততই ক্রমপরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছিল। তাহাদের নিজেদের অথবা তাহাদের সম্প্রদায়ের লোকদের দুষ্কর্মের জন্য গ্রামবাসীদের মধ্যে একটা অনুশোচনার ভাব ক্রমশঃ দেখা দিতেছিল। তাহাদের কাজকর্ম ও কথাবার্তা হইতে তাহাদের মানসিক পরিবর্তনের এই দিকটির আভাস পাওয়া যাইতেছিল। কেথুরীতে দেখিলাম যেস্থানে গান্ধীজীর প্রার্থনা-সভা হওয়ার কথা ছিল, স্থানীয় মুসলমানগণ সকাল হইতেই ঝাঁটা, খোন্তা ও দা হাতে নিজেরাই সেইস্থান পরিষ্কারের কাজে লাগিয়া গিয়াছে এবং প্রার্থনা-প্রাঙ্গণের প্রবেশপথে এবং পথের আরও দুইটি স্থানে কলাগাছ পুঁতিয়া গেট প্রস্তুত করিয়াছে। তাহাদের সহিত কথাবার্তা-কালে তাহারা বলে, দুষ্কর্ম আমিই করি আর অন্যেই করুক, দোষটা আমাদের সমগ্র মুসলমানসমাজের উপরই আসিয়া পড়িয়াছে। তাহাদের কাজ ও কথার মধ্যে বেশ একটা আন্তরিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। এতদিন সমস্ত গ্রামে স্থানীয় মুসলমানদের মুখে একই কথার পুনরাবৃত্তি শুনিয়া আসিতেছিলাম। আমরা কিছু করি নাই, বাহির হইতে মুসলমানরা আসিয়া এই কাজ করিয়াছে। দালতাতে দেখিলাম সেই দারুণ শীতের প্রভাতে কয়েকজন মুসলমান ঝাঁটা-হাতে যাওয়ার পথ পরিষ্কার করিতেছে। অনুসন্ধান করিয়া জানিলাম তাহারা

গ্রামের দরিদ্র সাধারণ মুসলমান। অযাচিতভাবেই তাহারা এই কাজ করিতেছে। কেহই তাহাদের এই কাজ করিতে বলে নাই বা তাহাদের ডাকে নাই।

পাণিয়ালায় প্রার্থনা-সভায় প্রায় ৫ হাজার হিন্দু-মুসলমান সমবেত হইয়াছিল। মুসলমানদের সংখ্যাই বেশী ছিল। আশেপাশের ও দূরবর্তী গ্রাম হইতেও বহু-সংখ্যক মুসলমান গান্ধীজীকে দেখিবার ও তাহার মুখের কথা শুনিবার জন্য পাণিয়ালায় আসে। সভা আরম্ভ হওয়ার কিছুক্ষণ পরই মুষলধারে বৃষ্টি নামে। কিন্তু বৃষ্টি সত্ত্বেও কেহ সভা ত্যাগ করে না। এই ঘটনাকে তাহাদের আগ্রহের পরীক্ষা বলা চলে। একটা আন্তরিক আগ্রহ না থাকিলে কেহই এইভাবে বৃষ্টিতে ভিজিয়া সভায় দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিত না।

দালতার পরবর্তী গ্রাম মুরাইম-এ গান্ধীজী হবিবুল্লা পাটোয়ারীর বাড়ীতে থাকেন। হবিবুল্লা পাটোয়ারী পূর্বাহ্নেই গান্ধীজীকে তাঁহার বাড়ীতে থাকিবার জন্য আমন্ত্রণ জানাইয়াছিলেন। পাটোয়ারী সাহেব ও তাঁহার পরিবারস্থ সকলে গান্ধীজীর সুখসুবিধার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহাদের আতিথেয়তার মধ্যে আন্তরিকতার অভাব ছিল না। প্রার্থনা-সভায় এইজন্য গান্ধীজী পাটোয়ারী পরিবারের আতিথেয়তার উল্লেখ করিয়া কৃতজ্ঞতা জানান। গান্ধীজী বিদায়-গ্রহণের সময় তাঁহার খোঁজ করিলে তিনি দৌড়াইয়া গান্ধীজীর সম্মুখে নতমস্তক হইয়া "আশীর্বাদ" প্রার্থনা করিলেন। হীরাপুরে প্রার্থনা-সভাতেও তাঁহাকে গান্ধীজীর আসনের অতি নিকটে মাটিতে বসিয়া থাকিতে দেখিলাম।

মুরাইম-এ প্রার্থনা-সভায় প্রায় ১০ হাজার হিন্দু-মুসলমান সমবেত হইয়াছিল। সংখ্যায় মুসলমানই বেশী উপস্থিত ছিল। আশেপাশের বহু গ্রাম হইতে মধ্যাহ্ন হইতেই দলে দলে লোক আসিয়া সমবেত হইতেছিল। কয়েক দিন হইতেই গান্ধীজীর সান্ধ্যসভায় অধিক লোক উপস্থিত হইতেছিল। পূর্ব দুই দিন হইতে এইদিন জনসমাগম আশাতিরিক্ত বেশী হইয়াছিল। গান্ধীজী বলেন যে, ইহা হিন্দু-মুসলমানের পরস্পরের প্রতি ক্রমবর্ধমান সম্প্রীতি-সদ্ভাবের পরিচায়ক বলিয়া ভাবিতে তিনি বিশেষ আনন্দ লাভ করিতেছেন।

হীরাপুর, বানশা ও পাল্লা এই তিনটি গ্রামের মধ্যে পাল্লায় একটি মুসলমানের বাটী ছাড়া আর কোথাও মুসলমানবাটী হইতে গান্ধীজী আমন্ত্রণ পান না। তবে সর্বত্রই গান্ধীজীর কর্মপদ্ধতি ও কথাবার্তার প্রতি সাধারণ মুসলমান পল্লীবাসীদের একটা শ্রদ্ধার ভাব দেখা যায়। বান্‌শা গ্রামে

সাংবাদিকদের তরফ হইতে স্বাধীনতা-দিবস উপলক্ষে হিন্দু-মুসলমান একত্র ভোজনের কথা হইলে কয়েকজন মুসলমানকে নিমন্ত্রণ করিতে গেলে তাঁহারা তৎক্ষণাৎ রাজী হন। তাঁহাদের বলা হয় যে, গান্ধীজী হিন্দু ও মুসলমান পরস্পরের মধ্যে মানুষের সম্পর্ক স্থাপন করিতে চাহেন। তাঁহার নিকট হিন্দু-মুসলমান ভেদ নাই। 'আমরা সকলেই ঈশ্বরের সন্তান', তিনি এই কথাই আমাদের স্মরণ করাইয়া দিতে আসিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন বলেন যে, গান্ধীজীকে তিনি এই প্রথম দেখিলেন। তাঁহার দর্শনলাভ করিয়া তিনি নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করিতেছেন। তাঁহারা সকলেই প্রস্তাবিত ভোজে যোগদান করিতে সম্মত হন। অবশ্য কোন কারণবশতঃ শেষ পর্যন্ত এই একত্র ভোজের ব্যবস্থা স্থগিত করিতে হইয়াছিল।

পাল্লায় রুস্তম আলি মাস্টার নামে স্থানীয় এক মুসলমান ভদ্রলোকের আমন্ত্রণে গান্ধীজী তাঁহার বাটীতে যান। রুস্তম আলি মাস্টার ১১নং মহম্মদপুর ইউনিয়নের ভূতপূর্ব প্রেসিডেণ্ট। তিনি প্রার্থনা-সভায় যাওয়ার পূর্বে গান্ধীজীর সেক্রেটারী অধ্যাপক নির্মল বসুর নিকট তাঁহার আবেদন জানান। তিনি অধ্যাপক বসুকে বলেন যে, তিনি শুনিয়াছেন, কোন মুসলমান গান্ধীজীকে বাটীতে আমন্ত্রণ করিলে তিনি সে আমন্ত্রণ রক্ষা করেন। গান্ধীজী যদি একবার তাঁহার বাটীতে যান, তাহা হইলে তিনি নিজেকে পরম সৌভাগ্যবান বলিয়া মনে করিবেন। প্রার্থনা-সভার পর রুস্তম আলি গান্ধীজীকে পথ দেখাইয়া তাঁহার বাটীতে লইয়া যান। প্রার্থনা-সভার স্থান হইতে ঐ বাটী প্রায় এক মাইলের পথ ছিল। সম্মুখে হিন্দুদের সহিত কয়েকজন মুসলমানও গান্ধীজীর চলার পথ পরিষ্কার করিতে করিতে চলিতেছিল। গান্ধীজী বাটীর ভিতর প্রবেশ করেন। বাটীর স্ত্রীলোকদের সহিত গান্ধীজী প্রায় ১৫ মিনিট ধরিয়া কথাবার্তা বলেন। গান্ধীজী তাহাদের নিকট মেয়েদের শিক্ষা ও তাহাদের মধ্যে পর্দাপ্রথা দূর করিবার আবশ্যকতার কথা বলেন। বিদায়গ্রহণের সময় তাঁহারা গান্ধীজীকে একটু কিছু খাইতে অনুরোধ করেন। গান্ধীজী বলেন যে তিনি তো এসময় কিছু খান না। ইহাতে তাঁহারা গান্ধীজীকে বলেন যে, গান্ধীজী যদি সামান্যকিছুও তাঁহাদের বাটীতে গ্রহণ করেন তাহা হইলে তাহাদের কল্যাণ হইবে। তখন গান্ধীজী একটু ডাবের জল পান করেন। আলি পরিবারের আন্তরিকতায় গান্ধীজী মুগ্ধ হন।

পাল্লা হইতে পাঁচগাও যাইবার পথে গান্ধীজী দুইটি মুসলমানবাটীতে যান।

পাল্লায় সান্ধ্যভ্রমণের সময় নাদু মোল্লা ও বাদু মোল্লা নামক দুইজনের বাটীতে যান। নাদু মোল্লা ও বাদু মোল্লা দুই ভাই। তাঁহাদের বাড়ী পাশাপাশি। গান্ধীজী তাঁহাদের বহির্বাটীতে উপস্থিত হইলে দুইভাই গান্ধীজীকে কিভাবে অভ্যর্থনা করিবেন তাহা লইয়া তাঁহাদের ব্যস্ততায় বিশেষ আন্তরিকতা প্রকাশ পায়। একজন ছুটিয়া একটি ভাঙ্গা চেয়ার আনিয়া গান্ধীজীকে বসিতে দেন। একটি টেবিলও আনা হয়। ঘরে কমলালেবু ছিল। গাছে ডাব তো আছেই। তখনই লোক দিয়া ডাব পাড়াইয়া, কমলালেবু ও ডাব দিয়া তাঁহারা তাঁহাদের মহামান্য অতিথিকে অভ্যর্থনা করেন। তাঁহারা গান্ধীজীকে বলেন যে, তাঁহারা অত্যন্ত দরিদ্র। তাঁহাদের কিছুই নাই। গান্ধীজী উত্তরে বলেন, সে তো ভালই, আমিও তো দরিদ্র। অতঃপর গান্ধীজী তাঁহাদের কতখানি আবাদী জমি আছে তাহা জানিতে চাহেন এবং এইরূপ ছোটখাট আরও দুই চারটি প্রশ্ন করেন। সেখান হইতে গান্ধীজী পার্শ্ববর্তী আর এক মুসলমান ভ্রাতার বাড়ীতে যান। সেখানে গান্ধীজীকে কতকগুলি কমলালেবু দেওয়া হয়; গান্ধীজী সেগুলি নিজহাতে উপস্থিত বালক-বালিকাদের মধ্যে বিলাইয়া দেন।

সান্ধ্যভ্রমণের সময় গান্ধীজী রাজা মিঞা ও মকলুস রহমান নামে দুইজনের বাড়ীতে যান।

গান্ধীজীকে দেখিবার জন্য, তাঁহার কথা শুনিবার জন্য মুসলমান পল্লীবাসীদের মধ্যে ক্রমবর্ধমান আগ্রহ দেখা যায়। গান্ধীজীর চলার পথের উভয় পার্শ্বস্থ মুসলমানবাটীর স্ত্রীলোক এমন কি বালক-বালিকারাও গান্ধীজীকে দেখিবার জন্য বাড়ীর বহিঃপ্রাঙ্গণে ছুটিয়া আসিয়াছে।

গান্ধীজী আমকী হইতে নবগ্রাম যাওয়ার পথে দুইটি এবং আমকীতে সান্ধ্য-ভ্রমণের সময় একটি মুসলমানবাড়ী যান।

সাধারণতঃ সান্ধ্য-ভ্রমণের সময় তিনি যখন কোন মুসলমানবাড়ী যাইতেন, সেই সময় ভ্রমণে বাহির হওয়ার পর স্থানীয় মুসলমানগণ তাঁহাকে পথ হইতে আমন্ত্রণ করিয়া লইয়া যাইতেন। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে পথিপার্শ্বে কোন মুসলমানবাড়ী পড়িলে তিনি স্বেচ্ছায়ও সেই বাড়ীতে গিয়া বাড়ীর মালিক ও ছেলেমেয়েদের সহিত আলাপ করিয়া আসিতেন। এইভাবে গান্ধীজী ধীরে ধীরে মুসলমানপল্লীবাসীদের হৃদয় জানিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহাদের সহিত কথাবার্তায় তাঁহাদের সর্বপ্রকার কল্যাণের প্রতি মহাত্মার আগ্রহ ও আন্তরিকতায় তাঁহাদের মনও সাড়া না দিয়া পারে নাই।

আমকী হইতে নবগ্রাম যাইবার পথে গান্ধীজী তুইটি মুসলমানবাড়ী যান। আমকীতে সান্ধ্য-ভ্রমণের সময় আক্তারের জামান নামে একজন স্থানীয় মুসলমান অধিবাসী গান্ধীজীকে তাঁহার বাড়ীতে আমন্ত্রণ করিয়া লইয়া যান। নবগ্রামযাওয়ার পথে তিনি পথিপার্শ্বস্থ যে তুইটি মুসলমানবাড়ী যান সেই তুইটি বাড়ীর মালিকের নাম যথাক্রমে হবিবুল্লা মাস্টার এবং সোলাম আলি ব্যাপারী। সমস্ত বাড়ীতেই গান্ধীজীকে সাদর অভ্যর্থনা জানান হয়। তাঁহাদের অভ্যর্থনার মধ্যে আগ্রহ ও আন্তরিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। নোয়াখালির পল্লীবাসীরা সাধারণতঃই অতিথিপরায়ণ। ডাব, কমলালেবু, পান-স্থপারি প্রভৃতি দিয়া তাঁহারা গান্ধীজীকে অভ্যর্থনা করেন। হবিবুল্লা মাস্টারের বাড়ীতে গান্ধীজীকে কতকগুলি কমলালেবু দিলে গান্ধীজী সেগুলি ছেলেমেয়েদের মধ্যে বিলি করিতে থাকেন। হবিবুল্লা মাস্টারও কয়েকটি কমলা লইয়া ছেলেমেয়েদের দিতে থাকেন। বিহার সরকারের প্রতিনিধি শ্রীযত্নবংশ সহায়ও গান্ধীজীর সহিত ছিলেন। গান্ধীজী হাসিতে হাসিতে হবিবুল্লা মাস্টারকে বলেন—"যত্নবংশজীর হাতেও একটি কমলা দিন। উনি বিহারের লোক। এইবার তাঁহাকে বন্ধু করিয়া লউন।" হবিবুল্লা মাস্টার যত্নবংশজীর হাতে একটি কমলা দেন। গান্ধীজী হাসিতে হাসিতে বলেন, "শত্রুকে বন্ধু বানানই আমার কাজ।"

রাম রহিম—কৃষ্ণ করিম

নবগ্রামে প্রার্থনা-সভায় প্রায় তিন হাজার লোক হয়। মুসলমানদের সংখ্যাই বেশী ছিল। জনতা শান্তভাবে ও আগ্রহের সহিত প্রার্থনার পরবর্তী বক্তৃতা শ্রবণ করে। গান্ধীজীর আসনের অতি নিকটে ডানধারে একজন মৌলভী বসিয়াছিলেন। পরে জানিলাম তিনি একজন গোঁড়া মুসলমান। তাঁহার নাম আবতুল কাদের মোল্লা। গান্ধীজীর বক্তৃতার পর নির্মলবাবু বাংলা অনুবাদ করিয়া শুনান শেষ হওয়ামাত্র মৌলভী সাহেব চট করিয়া দাঁড়াইয়া পাঁচ মিনিট বক্তৃতা করিবার জন্য গান্ধীজীর নিকট অনুমতি চাহেন। গান্ধীজী অনুমতি দিলে তিনি উচ্চৈঃস্বরে বক্তৃতা করিতে থাকেন। মৌলভী সাহেবের বক্তব্যের মর্মার্থ এই যে, প্রার্থনা-সভায় 'রাম রহিম', 'কৃষ্ণ করিম' প্রভৃতি একসঙ্গে উচ্চারণ করায় ইসলামের অবমাননা করা হইয়াছে। মৌলভী সাহেব তাঁহার উক্তির অনুকূলে যুক্তি দেখাইতে গিয়া বলেন যে, রাম একজন

মানুষের নাম, আর রহিম খোদার নাম, সেইরকম কৃষ্ণ মানুষের নাম আর করিম খোদার নাম। সুতরাং খোদার নামের সহিত মানুষের নাম জুড়িয়া উচ্চারণ করা ইসলামবিরোধী। মৌলভীসাহেব তাঁহার স্বধর্মীদের এইটুকু 'সহজ কথা' বুঝাইতে গিয়া বক্তৃতার নামে লম্ফঝম্ফ ও চীৎকার করিয়া একেবারে অস্থির। মৌলভী সাহেব বড় আশা করিয়াছিলেন, তিনি তাঁহার মুসলমানভাইদের নিকট হইতে সমর্থন লাভ করিবেন। কিন্তু সমর্থন পাওয়া তো দূরের কথা, তাঁহার মূর্খতা ও ধর্মান্ধতার জন্য নিন্দা ও টিট্‌কারিই লাভ করিলেন। এমন কি কয়েকজন নেতৃস্থানীয় মুসলমান তাঁহাদের গ্রামের পক্ষ হইতে গান্ধীজীর নিকট উক্ত মৌলভীর আচরণের জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন। তাঁহারা গান্ধীজীর নিকট বলেন যে, উক্ত মৌলভী সাহেবের ব্যবহারে তাঁহারা লজ্জিত। প্রার্থনা-সভার শেষে ফিরিবার সময় মুসলমানপল্লীবাসীদের চলিতে চলিতে বলিতে শুনা যায়, মৌলভীসাহেবের কথায় কোনই যুক্তি নাই। রহিম যেমন খোদার নাম তেমন আবার মানুষকেও তো রহিম নামে ডাকা হয়। কৃষ্ণ করিমের বেলাও তো সেইরূপ খাটে। তবে মৌলভী সাহেবের এত রাগের কারণ কি ?—তাঁহার পাশের একজন হিন্দু বলেন—কারণ তো আপনারাই ভাল জানেন। উত্তরে একজন মুসলমান বলেন, 'আমরা অশিক্ষিত হইলেও আমরা এইটুকু বুঝি।' তাঁহার নাম সেকেন্দার মিঞা। তিনি পার্শ্ববর্তী ডোমরিয়া গ্রাম হইতে গান্ধীজীর দর্শনের জন্য আসিয়াছিলেন। তিনি আরও বলেন যে, 'হাজার হইলেও গান্ধীজী তাঁহাদের অতিথি এবং তিনি তো তাঁহাদের ভালই চান। তাঁহারা গরীব চাষা। গান্ধীজী চেষ্টা করিলে তাঁহাদের অবস্থা আবার ফিরিবে।' গান্ধীজী প্রার্থনা-সভায় বক্তৃতায় কৃষকদের জমির উপর যে দাবির কথা উল্লেখ করেন, তাহার উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন যে, হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে দরিদ্রের উপর তাঁহার চিরকালই সহানুভূতি আছে। খিলাফত আন্দোলনের সময় তাঁহারা হিন্দু-মুসলমান মিলিয়া যে সমস্ত গান করিতেন তাহাও সুর করিয়া গাহিয়া শুনান। তাহার মধ্যে একটির কিয়দংশ নিম্নে দেওয়া হইল :—

"গান্ধী আর সৌকতআলি
দেশ করেছে ভবেরাজ
রাজার পক্ষে হয়ে বাদী
বিবাদ করে অনুক্ষণ।

রাজা প্রজা বিবাদ হোল
ইংরাজ মাল বন্ধ হোল
রূপার টাকা বিলাত নিল
নোট কাগজের আগমন।...”

পথ চলিতে চলিতে তাঁহাদের সহিত আরও অনেক কথা হইল। মোল্লাদের কথা উল্লেখ করিয়া তাঁহারা বলেন যে, এখানে গ্রামে গ্রামে এইরূপ বহু মোল্লা আছেন, তাঁহারা ধর্মান্ধ মুসলমান, তাঁহাদের হাতেই কলকাঠি।

যাঁহাদের কথা বলিলাম, তাঁহারাই দরিদ্র গেঁয়ো মূর্খ চাষা বলিয়া জনসমাজে পরিচিত। কিন্তু তাঁহাদের সহিত না মিশিলে তাঁহাদের অন্তরের পরিচয় পাওয়া যায় না। তাঁহাদের অর্থনৈতিক দুর্গতিই তাঁহাদের সম্মুখে আসন্ন সঙ্কট। দারিদ্র্যের কশাঘাতে তাঁহাদের শরীর ও মন জর্জরিত। অথচ দেশের জনসংখ্যার শতকরা ৮৫ ভাগ তাঁহারাই। তাঁহারা মারামারি কাটাকাটি চান না। তাঁহারা চান শান্তিতে বাসবাস করিতে। অনেক মুসলমানের অনুশোচনা আসিয়াছে এবং তাঁহারা গান্ধীজীর শান্তি-অভিযানের সহিত সক্রিয়ভাবে সহযোগিতাও করিতেছিলেন।

নবগ্রাম হইতে আমিষাপাড়া যাইবার পথে গান্ধীজী বসু মিঞা চৌকিদার ও আলি আজ্জাম মাস্টার (সমরখিল গ্রামে) নামে দুইজন মুসলমানের বাড়ী যান। দুই বাটীতেই তাঁহাকে সাদর অভ্যর্থনা জানান হয়। তাঁহাকে আসনে বসাইয়া বাটীর ভিতর হইতে কমলালেবু ও পান আনিয়া দেওয়া হয়।

আমিষাপাড়ায় প্রার্থনা-সভায় অভূতপূর্ব জনসমাবেশ হয়। আমিষাপাড়া উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়-সংলগ্ন মাঠে সভা হয়। হিন্দু-মুসলমানের সংখ্যা প্রায় সমান সমান ছিল। গ্রামবাসীদের পক্ষ হইতে গান্ধীজীর যথাযোগ্য অভ্যর্থনার ব্যবস্থার জন্য কয়েকজন কর্মীর মধ্যে মৌলভী মহম্মদ মুসলিম নামে একজন ছিলেন। গান্ধীজীর সহিত মহম্মদ মুসলিমের পূর্বেই পরিচয় ছিল। তিনি এক সময় বহু দিন গান্ধীজীর সহিত সবরমতী আশ্রমে ছিলেন। গ্রাম হইতে গ্রামান্তর ভ্রমণের সময় তিনি ৩টি গ্রামে যাইবার পথে গান্ধীজীর পথপ্রদর্শকের কাজ করেন। আমিষাপাড়ায় প্রার্থনা-সভায় এই বিপুল জন-সমাবেশের পশ্চাতে অন্যান্য কর্মীদের সহিত মৌলভীসাহেবের আন্তরিক প্রচেষ্টা ছিল।

আমিষাপাড়ার ৪নং ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট লুতফর রহমান গান্ধীজীর সহিত দেখা করেন। হাঙ্গামার সময় যাহারা সক্রিয়ভাবে লুঠতরাজ ও অন্যান্য

অনাচারে যোগদান করিয়াছিল তিনি তাহাদের মনোভাব সম্বন্ধে গান্ধীজীকে জানান। গান্ধীজীর সান্ধ্যভ্রমণের সময় তিনিও গান্ধীজীর সহিত ছিলেন। সেই সময় তাঁহার সহিত কথাবার্তাকালে তিনি বলেন যে, দোষী মুসলমানদের মধ্যে ক্রমশঃই তাহাদের কৃতকর্মের জন্য একটা অনুশোচনা দেখা দিতেছে। তাহাদের মধ্যে অনেকে লুঠের মালপত্র ফিরাইয়া দেওয়া স্থির করিয়াছে। তবে তাহাদের মনে গ্রেপ্তারের ভয় পুরামাত্রায় আছে। সেইজন্য ইচ্ছা সত্ত্বেও পুলিসের ভয়ে কিছু করিতে পারিতেছে না। তিনি বলেন যে, এসম্পর্কে যে সমস্যা দেখা দিয়াছে সে বিষয়ে গান্ধীজীর উপদেশগ্রহণের জন্যই তিনি তাঁহার সহিত দেখা করিয়াছিলেন। গান্ধীজীর সহিত তাঁহার বিস্তৃত আলোচনা তিনি প্রকাশ করিতে চাহেন না। তবে তিনি একথা বলেন যে, তিনি আমিষাপাড়া ও পার্শ্ববর্তী আরও ৯টি গ্রামের মুসলমানদের তরফ হইতে গান্ধীজীর সহিত কথা-বার্তা বলিয়াছেন। তিনি বলেন যে, এই ১০টি গ্রামে ৫৭টি গরু মারা বা অপহৃত হইয়াছে। এই সমস্ত গ্রামে যে সকল গরু অপহৃত বা হত্যা করা হইয়াছে, গ্রামের মুসলমানদের তরফ হইতে ক্ষতিপূরণস্বরূপ প্রতিটি গরুর জন্য গরুর মালিককে ৫০৲ টাকা করিয়া দিয়া একটা মিটমাট করিবার জন্য তাহাদের মধ্যে আগ্রহ দেখা গিয়াছে। রহমানসাহেব এই বিষয়ও গান্ধীজীকে জানান এবং উপদেশ গ্রহণ করেন।

ধর্মান্তরই কি সমাধান?

সাতঘরিয়ায় সান্ধ্যভ্রমণের সময় গান্ধীজী স্থানীয় উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের শিক্ষক করিম বক্স মাস্টারের বাড়ী যান। সান্ধ্যভ্রমণের সময় করিম বক্স মাস্টার গান্ধীজীকে তাঁহার বাটীতে যাইতে অনুরোধ করেন এবং তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া তাঁহাদের বাটীতে লইয়া যান। সেদিন গান্ধীজীর মৌন-দিবস ছিল। বহির্বাটীতে পৌছিলে বাটীর ও পাড়ার বহু ছেলেমেয়ে তাঁহাকে ঘিরিয়া ধরে। তাহাদের নোংরা কাপড়চোপড় ও উস্‌কোখুস্‌কো চুল দেখিয়া গান্ধীজী তাহাদের অভিভাবকদের ছেলেমেয়েদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হইয়া চলিতে শিক্ষা দেওয়ার জন্য বলেন। গান্ধীজী মৌন ছিলেন, সেইজন্য লিখিতভাবে এই উপদেশ দেন। পরে তাঁহাকে বাটীর ভিতরে লইয়া একটি ঘরে বসিতে দেওয়া হয়, সেখানে তিনি বাটীর মহিলাদের সহিত কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলেন; ফিরিবার সময় করিম বক্স মাস্টার বাসস্থান পর্যন্ত গান্ধীজীর সহিত ছিলেন। তাঁহার সহিত কথাবার্তার

সময় তিনি আমাকে একটি প্রশ্নের উত্তরে জানান যে, এই গ্রামে সমস্ত হিন্দু অধিবাসীরাই ধর্মান্তরগ্রহণে বাধ্য হইয়াছে। কারণ ইহা ছাড়া আর গত্যন্তর ছিল না। তাঁহার কথায় আমি বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিলাম—কেন আপনি যে বলিতেছিলেন, এ গ্রামের কোন মুসলমান হাঙ্গামায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যোগদান করেন নাই। তবে সমস্ত হিন্দু ধর্মান্তরগ্রহণে বাধ্য হইল—ইহা হইতে ইহাই কি ধারণা করা স্বাভাবিক নয় যে, এই ধর্মান্তরকরণ ব্যাপারে তাহাদের মৌন সম্মতি ছিল? উত্তরে তিনি বলেন, সকলের ছিল না। কাহারও কাহারও ছিল একথাও অস্বীকার আমি করি না। তবে আমার পক্ষ হইতে আপনাকে আমি এই কথা বলিতে পারি যে তখনকার পরিস্থিতিতে হিন্দু অধিবাসীদের ধর্মান্তরগ্রহণ করিতে বলা ছাড়া তাহাদের প্রাণরক্ষার আর কোনই উপায় ছিল না। ধর্মান্তরগ্রহণ না করিলে হয়তো দুর্বৃত্তেরা তাহাদের রেহাই দিত না। আমি প্রশ্ন করিলাম—ধর্মান্তরগ্রহণ করিলেই তাহাদের অক্ষতদেহে রেহাই দেওয়ারই বা কারণ কি? উত্তরে তিনি বলিলেন—তাহার একমাত্র কারণ, সরলপ্রাণ ধর্মনিষ্ঠ মুসলমানদের বুঝান হইয়াছে, পাকিস্তান এমন এক স্থান, যে স্থানে মুসলমান ছাড়া আর কাহারও থাকিবার অধিকার নাই। মুসলমান ছাড়া আর সকলেই বিধর্মী। লীগ গভর্নমেণ্ট কায়েম হওয়ার সাথে সাথে একথাও প্রচার করা হইয়াছে যে, বাংলায় পাকিস্তান কায়েম হইয়াছে।

সাধুরখিল যাইবার পথে গান্ধীজী হবিবুল্লা ড্রাইভারের অনুরোধক্রমে তাহার বাড়ী যান। সাধুরখিলে দ্বিতীয় দিনে প্রাতর্ভ্রমণের সময় আমিনউল্লা খোন্দকার নামে অপর এক মুসলমানবাটীতে যান।

হবিবুল্লা ড্রাইভারের বাটী যাওয়ার পূর্বে গান্ধীজী একটি পোড়া বাটী দেখেন। সেস্থান হইতে বাহির হইলে সেই বাটীর লোকজনের মুখে শুনিলাম যে, এই গ্রামের একজন দরিদ্র মুসলমান তাঁহাদের প্রাণ রক্ষা করিয়াছেন। কিছুদূর অগ্রসর হইতেই দেখিলাম পথে একজন গান্ধীজীকে তাঁহার বাটী যাইবার জন্য অনুরোধ করিতেছেন। উপরিউক্ত দগ্ধ বাটীর একজন অধিবাসী তাঁহাকে দেখাইয়া বলিলেন ইনিই হবিবুল্লা মাস্টার। গান্ধীজী তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করেন এবং তখনই তাঁহার বাটী যান। হবিবুল্লা মাস্টারের বহির্বাটীতে গান্ধীজীর জন্য পূর্বেই একটি আসন সজ্জিত করিয়া রাখা হইয়াছিল। হবিবুল্লা সাহেব ও তাঁহার আত্মীয়স্বজন গান্ধীজীকে সাদর অভ্যর্থনা জানান।

সাধুরখিলে অবস্থানকালে দ্বিতীয় দিন স্থানীয় মুসলমানরা গান্ধীজীকে এক

সম্বর্ধনা-সভায় আমন্ত্রণ করেন। প্রার্থনা-সভা এক মুসলমানবাটীসংলগ্ন মাদ্রাসা-প্রাঙ্গণে নির্দিষ্ট করা হইয়াছে শুনিয়া গান্ধীজী বলেন যে, প্রার্থনার সময় রামধুন ও আবৃত্তি করায় তাঁহাদের যদি কোন আপত্তি না থাকে তাহা হইলে তিনি খুশীমনেই তাঁহাদের আমন্ত্রণ রক্ষা করিবেন। প্রার্থনার পর সভায় ১৫নং খিলপাড়া ইউনিয়নের মুসলমান অধিবাসীদের তরফ হইতে গান্ধীজীকে একটি মানপত্র দেওয়া হয়।

সাধুরখিলে দ্বিতীয় দিনে প্রার্থনা-সভা সালেমুল্লা সাহেবের বাড়ীতে হয়। মুসলমানদের মধ্যে এই অঞ্চলে তাঁহার বিশেষ খ্যাতি আছে। সালেমুল্লা সাহেব গান্ধীজীকে খোলাখুলি জানান যে, হাতে তাল দিয়া রামধুনসহ প্রার্থনা তাঁহার বাটীতে করায় তাঁহার কোন আপত্তি নাই।

প্রার্থনা-সভায় কয়েকজন মুসলমান অধিবাসী গান্ধীজীকে বাংলায় একখানি পত্র পড়িয়া শুনান। ইহাতে গান্ধীজীর স্তুতি ছিল এবং কয়েকটি সাময়িক প্রশ্নের আলোচনা ছিল। গান্ধীজী ঐ পত্র পড়িতে অনুমতি দেন। উহাতে যে সকল সমস্যা আলোচনা হইয়াছিল, পাঠান্তে তাহার জবাব দেন।

মহাত্মার পল্লী-পরিক্রমা

দ্বিতীয় পর্যায়

পল্লী-পরিক্রমার দ্বিতীয় পর্যায়ে মহাত্মাজী ১৮টি গ্রাম পরিভ্রমণ করেন। দ্বিতীয় পর্যায়ে বিজয়নগর ও রায়পুরায় দুই দিন করিয়া এবং শেষ গ্রাম হাইমচরে গান্ধীজী ছয় দিন অবস্থান করেন।

গান্ধীজী দ্বিতীয় পর্যায়ে নিম্নলিখিত গ্রামগুলি পরিক্রমণ করেন:— (১) শ্রীনগর ; (২) ধর্মপুর ; (৩) প্রসাদপুর ; (৪) নন্দীগ্রাম ; (৫) বিজয়নগর ; (৬) হামচাঁদী ; (৭) কাফিলাতলি ; (৮) পূর্ব কেরোয়া ; (৯) পশ্চিম কেরোয়া ; (১০) রায়পুরা , (১১) দেবীপুর ; (১২) আলুনিয়া ; (১৩) বিরামপুর ; (১৪) বিশকাটালী ; (১৫) কমলাপুর ; (১৬) চরকৃষ্ণপুর ; (১৭) চরসোলাদি ও (১৮) হাইমচর।

গান্ধীজীর পল্লী-পরিক্রমায় নোয়াখালির কোন কোন মহল হইতে অসন্তোষ প্রকাশ করা হইয়াছে। কোন কোন স্থানে প্রচ্ছন্নভাবে প্রতিবন্ধকতাও সৃষ্টি করা হইয়াছে। যাঁহারা বিরোধিতা করিয়াছেন, সংখ্যায় মুষ্টিমেয় হইলেও তাঁহাদের উপর কোন রাজনৈতিক দলের হাত ছিল বলিয়া অনেকের ধারণা। দুর্বৃত্তরা তখনও দুষ্কর্মের প্রশ্রয় দিয়া কোন কোন স্থানে শান্তিস্থাপনে ব্যাঘাত সৃষ্টি করিতেছিল। এই সম্পর্কে দায়িত্বশীল এবং শান্তিপ্রিয় কোন কোন মুসলিম মহল হইতে এই মত প্রকাশ করা হয় যে যাহারা দুর্বৃত্ত তাহারা সর্বদাই দুষ্কর্ম করিবার উদ্দেশ্যে সুযোগ খুঁজিবে ইহা স্বাভাবিক। তাহাদের দমন করা গভর্নমেণ্টের কাজ। তবে সাধারণ পল্লীবাসী মুসলমান, যাহাদের একসময় ভুল বুঝাইয়া ক্ষেপাইয়া তোলা হইয়াছিল, তাহারা তাহাদের ভ্রম বুঝিতে পারিয়াছে এবং কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনাও করিতেছে। তাঁহারা আরও বলেন, "দুর্বৃত্তদের পাগলামির জন্য আমাদের হিন্দু-ভাইদের যেমন দুর্ভোগ ভুগিতে হইতেছে, আমরাও তাহা হইতে একেবারে বাদ পড়ি নাই।"

জীবনের বহু দুঃসাধ্য ব্রতে গান্ধীজী সফল হইয়াছেন। যে সংকল্প লইয়া গান্ধীজী নোয়াখালিতে কাজ করিতেছিলেন তাহাতে সাফল্য অর্জন সম্পর্কে তাঁহার পক্ষে দ্বিতীয় পর্যায় পরিক্রমণের শেষ পর্যন্তও সঠিক করিয়া কিছু বলা সম্ভব হইয়া উঠে নাই। তবে ভ্রমণের ফলাফল লক্ষ্য করিয়া মহাত্মাজী একথা

বলিয়াছেন যে, যথাযোগ্য ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইলে পর সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকদের উপদ্রুত অঞ্চল পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া আসা তিনি সমর্থন করিবেন। সংখ্যাগরিষ্ঠেরা যদি কোনক্রমেই সংখ্যালঘুদের বরদাস্ত না করে, তবে সে ক্ষেত্রে গভর্নমেণ্টেরও কিছু করিবার নাই। যথাযোগ্য ক্ষতিপূরণের বিনিময়ে তাহাদের স্থানত্যাগ করিয়া আসাই বাঞ্ছনীয়।

তিনি একথাও বলিয়াছেন, "যদি আমি ব্যর্থও হই, তথাপি সত্য লোপ পাইবে না। আমি আমার আদর্শকে জগতের সম্মুখে তুলিয়া ধরিব, আমি জীবিতই থাকি আর নিশ্চিহ্ন হইয়া যাই, তাহাতে কিছু আসে যায় না।"

শ্রীনগর

শ্রীনগরে গান্ধীজীর বাসস্থান সাধুরখিল হইতে মাত্র দুই মাইলের পথ ছিল। ৫ই ফেব্রুয়ারি বুধবার প্রত্যূষে চল্লিশ মিনিটে প্রায় দুই মাইল পথ অতিক্রম করিয়া গান্ধীজী শ্রীনগরে উপস্থিত হন। স্বেচ্ছাসেবকদল পূর্বরাত্রে ধানক্ষেতের মধ্য দিয়া গান্ধীজীর শ্রীনগর যাওয়ার পথ পরিষ্কার করিয়া রাখিয়াছিল। ভোরের কুয়াশা অপসৃত হইবার পূর্বেই গান্ধীজী যাত্রা করেন।

এই গ্রামের খুব নিকটেই শ্রীমতী বীণা দাসের ক্যাম্প। তিনি গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া স্থানীয় অবস্থা জানান।

শ্রীনগরে হিন্দু ও মুসলমানের সংখ্যা প্রায় সমান সমান। হিন্দুদের ভিতর নাথ (তাঁতি) সম্প্রদায়ের লোকই প্রায় অর্ধেক, বাকী বেশীর ভাগই বারুজীবী। এস্থানের সকলকেই ধর্মান্তরিত করা হইয়াছিল। সকল বাড়ীই লুণ্ঠিত হইয়াছিল। অনেক বাড়ী পোড়ানও হয়। হাঙ্গামার সময় এই গ্রামে একজন মারা যায়। মহাত্মার আগমনের সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের প্রায় অর্ধেক লোক পুনরায় গ্রামে ফিরিয়া আসে।

শ্রীনগরে কয়েকজন মুসলমান বন্ধু মহাত্মা গান্ধীর নিকট একটি বিবৃতি পাঠ করেন এবং তাহাতে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছিল :—

যে সমস্ত প্রদেশের শক্তি আছে, তাহাদের নিজস্ব গঠনতন্ত্র রচনার জন্য আপনি নির্দেশ দিয়াছেন এবং ব্রিটিশ সৈন্যদলকে স্বাধীনতা অর্জনের প্রমাণস্বরূপ ভারত ত্যাগ করিতে বলিয়াছেন।

ভারতের স্বাধীন প্রদেশসমূহে, আপনার মতে ভোটাধিকারের ভিত্তি কিরূপ

হইবে? সাম্প্রদায়িক নির্বাচন-প্রথার পরিবর্তে কি জনসাধারণের বৃত্তি-নির্বাচনের ভিত্তিস্বরূপ হইবে?

সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায় কিংবা বৃত্তিগত গোষ্ঠীর জন্য আসন সংরক্ষিত করিয়া যুক্তনির্বাচন-প্রথা প্রবর্তিত হইবে? কোন নির্দিষ্ট গোষ্ঠীকে প্রতিনিধি প্রেরণের বিশেষ সুবিধা দেওয়া হইবে কি না? যদি দেওয়া হয় তবে কোন গোষ্ঠীকে? সকলের জন্য কি প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে যুক্তনির্বাচন-প্রথা প্রবর্তিত হইবে?

উল্লিখিত প্রশ্নগুলি সম্বন্ধে মহাত্মা গান্ধী সুস্পষ্ট উত্তর প্রদান করেন। মহাত্মা বলেন যে, কোন প্রদেশের অধিকাংশ অধিবাসী সমর্থন করিলে উক্ত প্রদেশের পক্ষে নিজস্ব গঠনতন্ত্র রচনা করিয়া কার্যকরী করার অধিকার অবশ্যই আছে। মহাত্মা গান্ধী আরও বলেন যে, যাহারা নিজেদের প্রতিপক্ষকে ধ্বংস না করিয়া প্রতিপক্ষ দ্বারা নিজেদের ধ্বংস চান, তাহাদের স্বাধীনতা জগতের কোন শক্তির পক্ষে হরণ করা সম্ভব নয়। তিনি বলেন যে, ১৯১৯ সালে তিনি এই নীতির প্রবর্তন করেন। কিন্তু বর্তমানে এই নীতি বিশেষভাবে পুষ্টিলাভ করিয়াছে। ব্রিটিশ মন্ত্রী-মিশনের পরিকল্পনার অনুকূলে তিনি তাঁহার মত প্রকাশ করেন। তাঁহার মতে মন্ত্রী-মিশনের পরিকল্পনা কোন নির্দিষ্ট প্রদেশের ঘোষিত নীতি প্রতিহত করিতে সক্ষম নয়। মহাত্মা গান্ধী আরও বলেন যে, যদি উহা বাংলা প্রদেশের পক্ষে সম্ভব হয়, তাহা হইলে অন্যান্য প্রদেশের পক্ষে উহা আরও অধিক পরিমাণে সম্ভব। কারণ, ঐ সমস্ত প্রদেশের প্রতিনিধিগণ গণপরিষদে যোগদান করিয়াছেন। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সম্পর্কে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট যাহা ঘোষণা করিয়াছেন, সেই বিষয়ে তিনি সম্পূর্ণ উদাসীন। তাঁহার মতে উহা ভারতের অধিবাসীর উপর নির্ভর করিতেছে; কোন বৈদেশিক শক্তির পক্ষে উহা কার্যকরী করা সম্ভব নয়। ব্রিটিশ সরকারের পরিকল্পনা প্রত্যাহৃত হইলে ভারতবর্ষ কি করিবে—এই প্রশ্ন সম্পূর্ণভাবে অপ্রাসঙ্গিক। বিশৃঙ্খল অবস্থায় জীবনযাপন করিতে ভারতবাসীরা অভ্যস্ত। পণ্ডিত নেহরু এবং তাঁহার বন্ধুবর্গের অন্তর্বর্তী সরকারে যোগদানকালে পণ্ডিত নেহরু বলিয়াছেন যে, তাঁহাদের যোগদান বিশেষ সুখকর নহে বরং ইহা বিপজ্জনক। তাহাদের লক্ষ্য স্বাধীনতা এবং যে-কোন বিপর্যয় ঘটুক না কেন তাঁহারা স্বাধীনতা লাভ নিশ্চয় করিবেন। স্বভাবতঃ যখন জনসাধারণ কোনরূপ দ্বিধা না করিয়া অহিংস নীতি গ্রহণ করিয়াছে, তখন তাঁহার পক্ষে সন্দেহাতীতভাবে ইহা বলা সম্ভব হইয়াছিল।

অপরপক্ষে, ভারতবাসীরা যদি সিদ্ধান্ত করে যে, তরবারির সাহায্যে তাহারা ব্রিটিশকে ভারত ত্যাগ করিতে বাধ্য করিবে, তাহা হইলে তাহাদের সিদ্ধান্ত বিশেষভাবে ভ্রমাত্মক হইবে। তাহারা ইংরাজের দৃঢ়তা এবং সাহস সম্বন্ধে অজ্ঞ। ইংরাজরা তরবারির শক্তির নিকট কোনক্রমে আত্মসমর্পণ করিবেন না, কিন্তু যে অহিংস নীতি মৃত্যুর পরিবর্তে মৃত্যুকে ঘৃণার সহিত অবজ্ঞা করে, সেই নীতির শৌর্যবীর্যকে প্রতিহত করার শক্তি ইংরাজের নাই। অহিংসা অপেক্ষা কোন নীতিকে অধিক শক্তিশালী বলিয়া তিনি মনে করেন না। ভারতবর্ষ এখনও স্বাধীনতা লাভ করে নাই, তাহার কারণ হইতেছে যে, ভারতবাসী এখনও অহিংস নীতিতে সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাসী নয়। যাহা হউক, ভারতের শাসনতন্ত্র সম্বন্ধে ব্রিটিশ সরকারের ঘোষণা তাঁহার মতে ভারতের ক্রমবর্ধমান অহিংস শক্তির প্রত্যুত্তর ভিন্ন আর কিছুই নয়। যদি তাঁহারা বিগত যুদ্ধের পরিকল্পনা পড়িয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহারা পরিষ্কারভাবে বুঝিতে পারিবেন যে, শত্রুপক্ষ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলেও মিত্রপক্ষের জয় মোটেই লাভজনক হয় নাই। এই যুদ্ধের ফলে বহু নরনারীর নির্মম ধ্বংস ছাড়াও জগতে খাদ্য ও বস্ত্রের বিশেষ অভাব তাহাদের দ্বারা সৃষ্টি হইয়াছে। মিত্রপক্ষ এইরূপ নির্মম ও অমানুষ হইয়া পড়িয়াছেন যে, তাঁহারা শত্রুপক্ষকে ক্রীতদাস পর্যায়ভুক্ত করিবার আশা পোষণ করিতেছেন। প্রশ্ন হইতেছে যে, কাহার প্রতি করুণা প্রদর্শন বিশেষভাবে করা উচিত—শত্রুপক্ষ না মিত্রপক্ষ? সেইজন্য তিনি জনসাধারণকে অহিংস নীতিতে আস্থাশীল হইয়া যে কোন অবস্থার জন্য প্রস্তুত থাকিতে বলেন। ভোটাধিকার সম্বন্ধে মহাত্মাজী বলেন যে, ২১ কিংবা ১৮ বৎসরের উর্ধ্বে প্রত্যেক নরনারীর ভোটাধিকারের প্রথায় তিনি বিশ্বাসী। তাঁহার মতে বৃদ্ধলোকের ভোটাধিকার থাকা উচিত নয় বলিয়া তিনি মনে করেন। বৃদ্ধদের ভোটের অধিকার থাকিলে কোন কিছু লাভ হইবে না। যাঁহারা মৃত্যুপ্রান্তে আসিয়াছেন তাঁহাদের ভারতবর্ষ এবং জগতের উপর কোন অধিকার নাই। তাহাদের জন্য মৃত্যু; যুবকদের নিকট সার্থকতা আছে জীবনের। পঞ্চাশ বৎসরের যাহারা উর্ধ্বে এবং ১৮ বৎসরের যাহারা নিম্নে তাহাদের জন্য তিনি বাধানিষেধ আরোপ করিতে চান। অবশ্য বিকৃতমস্তিষ্কের এবং নীচাশয় ব্যক্তিদেরও তিনি ভোটাধিকার হইতে বঞ্চিত করিতেই ইচ্ছুক। ভারতবর্ষ স্বাধীন হইলে তিনি সাম্প্রদায়িক প্রথা অব্যাহত রাখিতে চাহেন না। সংরক্ষিত আসনসহ যুক্তনির্বাচন-প্রথা প্রবর্তিত হওয়া অত্যাবশ্যক। মুসলমান, শিখ, পার্শি কিংবা কোন সম্প্রদায়ের

জন্য বিশেষ সুবিধা তিনি কল্পনা করিতে পারেন না। তাঁহার মতে কেবলমাত্র যাঁহারা কুষ্ঠরোগগ্রস্ত তাহাদেরই কোন কিছু সুবিধা দেওয়া যাইতে পারে। উহা সমাজের অন্যায়ের প্রত্যুত্তর মাত্র। যাহারা সমাজে নীতিবহির্ভূত কার্য করিয়া থাকে, তাহারা যদি নিজেদের সমাজ হইতে দূরে রাখিতে চেষ্টা করে, তাহা হইলে কুষ্ঠরোগগ্রস্ত ব্যক্তিদের সমাজে আর কোন স্থানই থাকিবে না।

ধর্মপুর

৬ই ফেব্রুয়ারি বৃহস্পতিবার এক ঘণ্টা দশ মিনিটের মধ্যে প্রায় ৩ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া গান্ধীজী সকাল ৮-৪৫ মিনিটের সময় ধর্মপুরে পৌছেন। এই গ্রামে প্রধানতঃ মুসলমানদেরই বাস। গ্রামটি শ্রীনগরের পশ্চিমে অবস্থিত। ধর্মপুরযাত্রার পথে গান্ধীজী প্রায় ১০টি তোরণ অতিক্রম করেন। সেগুলি পত্রপুষ্পে সজ্জিত ছিল এবং "বাপুজী স্বাগতম্", "বন্দে মাতরম্", "জয় হিন্দ্", "হিন্দু-মুসলমান এক হউক" প্রভৃতি বাণীও তোরণগাত্রে লিখিত ছিল। গান্ধীজী ইংরাজীতে 'ওয়েলকাম' (Welcome) লেখায় অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। যাত্রার মধ্যে গান্ধীজী কেবলমাত্র আস্গর ভুইঞার গৃহেই কিছুক্ষণের জন্য থামেন। সেখানে তাঁহাকে সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করা হয়। গান্ধীজীকে কয়েকটি লেবু দেওয়া হইলে, তিনি তৎক্ষণাৎ ঐগুলি ক্রীড়ারত বালকদের মধ্যে বিতরণ করিয়া দেন।

এই গ্রামে হিন্দু মাত্র ৪ ঘর, বাকী সবই মুসলমান। সকলকেই ধর্মান্তরিত করা হয় ও সমস্ত বাড়ী লুণ্ঠিত হয়।

পথে গান্ধীজী যখন আসগর আলি ভুইঞার বাটীতে যান, আসগর আলি সে সময় বাড়ীতে ছিলেন না। তাঁহার আত্মীয় সেকেন্দর ভুইঞা, মফিজুল আমেদ ও বাটীর লোকজন গান্ধীজীকে সাদর অভ্যর্থনা জানায়। গান্ধীজীকে অনুরোধ করিলে, তাঁহাদের বাটী যাইতে পারেন এই আশায় পূর্বেই তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য বহির্বাটীতে চেয়ার-টেবিল সজ্জিত করিয়া রাখা হইয়াছিল। পাতাবাহার ও ফুল দিয়া টেবিলটি সুন্দরভাবে সাজান হইয়াছিল। গান্ধীজী আসন গ্রহণ করিলে বাটীর একটি ছোট মেয়ে গান্ধীজীর গলায় একটি মালা দেয়। সেকেন্দর ভুইঞা গান্ধীজীকে বলেন যে, এই মেয়েটি পূর্বেও অপর একটি গ্রামে গান্ধীজীকে দেখিতে গিয়াছিল এবং সেইবারও তাঁহাকে একটি মালা দিয়াছিল। গান্ধীজী হাসিতে হাসিতে সেই মালাটি মেয়েটির গলায়

পরাইয়া দেন। গান্ধীজী বাটীর মালিকের খোঁজ করিলে সেকেন্দর ভূইঞা তাঁহাকে জানান যে, তিনি কোন কর্মোপলক্ষে বাহিরে গিয়াছেন। সেকেন্দর ভূইঞার আত্মীয় মফিজুল আমেদও গান্ধীজীকে একটি মালা দেয়। গান্ধীজী তাহার বিষয় জানিতে চাহিলে সে বলে যে, সে স্থানীয় উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে সপ্তম শ্রেণীতে পড়ে। গান্ধীজী তাহার হাতে ও মেয়েটির হাতে একটি করিয়া কমলালেবু দেন। সেকেন্দর ভূইঞা অন্যমনস্কভাবে একটি পাতাবাহারের ডাল লইয়া নাড়াচাড়া করিতে করিতে হঠাৎ একটি অদ্ভুত জিনিস তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সেই ডালটির একস্থান হইতে দুইটি ডাল বাহির হইয়াছে এবং দুইটি ডালে দুই রকম পাতা ছিল। তিনি ডালটি গান্ধীজীকে দেখাইয়া বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলেন যে, এরূপ কিভাবে হইল। গান্ধীজী ডালটি হাতে লইয়া হাসিতে হাসিতে বলেন, "ইহার একটি মুসলমান অপরটি হিন্দু"। অবশ্য পরে গান্ধীজী এইরূপ হওয়ার বৈজ্ঞানিক কারণও বুঝাইয়া বলেন। এইস্থানে কিছুক্ষণের জন্য বেশ একটা সহজ সরল আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়। গান্ধীজীর শিশুসুলভ সারল্য ও সদাহাস্যময় মুখমণ্ডল সেখানে উপস্থিত সকলের অন্তর স্পর্শ না করিয়া পারে নাই। সকলেই গান্ধীজীর ছোটখাটো ব্যাপার লইয়া রসিকতা ও হাসির সঙ্গে সঙ্গে প্রাণ খুলিয়া তাঁহার সহিত হাসিতে থাকে। ঐ বাটীর মেয়েরাও ঘরের দরজা-জানালার ফাঁক দিয়া আগ্রহের সহিত সমস্ত লক্ষ্য করিতেছিলেন।

ধর্মপুরে গান্ধীজী তাঁহার নগ্নপদে হাঁটিবার কথা উল্লেখ করিয়া বলেন যে, খালিপায়ে তিনি হাঁটিতেছেন ইহাতে বিস্ময়ের কিছু নাই। লোকে পায়ে হাঁটিয়াই তীর্থযাত্রা করে। ইহা ভারতবর্ষের চিরন্তন রীতি। ইহার জন্য দূরদূরান্তর হইতে সাংবাদিকগণ আসিয়া ভীড় করিবেন কেন? পায়ে হাঁটিতে তাঁহার কোনই কষ্ট হয় না, এখানে নগ্নপদে চলা কিছুই আশ্চর্য নহে। নোয়াখালির মাটি মখমলের মত নরম। আর রাস্তায় যেখানে ঘাস আছে তাহা সতরঞ্চের মত মসৃণ। "খালিপায়ে হাঁটিতে আমার কোনই কষ্ট হয় না। ভগবান করেন তো এই তীর্থযাত্রা নির্বিঘ্নে সমাপন করিতে পারিব।"

ধর্মপুরে মাড়োয়ারী রিলিফ সোসাইটির চিকিৎসা বিভাগের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট গান্ধীজীকে জানান যে, হিন্দু-মুসলমান ভেদ না করিয়া

সকলেরই তিনি চিকিৎসা করিতেছেন এবং মুসলমান স্ত্রী-পুরুষ সকলেই খুশী মনে তাঁহাদের সেবা গ্রহণ করিতেছে। তিনি গান্ধীজীকে একথাও লিখিয়াছেন যে, এই অঞ্চলের মুসলমানেরা দরিদ্র। যেখানেই তিনি গিয়াছেন, সর্বত্রই তিনি নোংরা অস্বাস্থ্যকর অবস্থা লক্ষ্য করিয়াছেন। এই সম্পর্কে তিনি গান্ধীজীকে বলিতে অনুরোধ করিয়াছেন। এই কথার উল্লেখ করিয়া গান্ধীজী বলেন যে, তিনি এ বিষয়ের আলোচনা আগ্রহের সহিতই করিবেন। ৫০ বৎসরেরও অধিককাল ধরিয়া তিনি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার বিষয়ে চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। একটি বিষয়ে তিনি পাশ্চাত্যবাসীদের প্রশংসা না করিয়া পারিতেছেন না বলিয়া তিনি খুশী। তাহা হইতেছে এই যে, স্বাস্থ্যবিধির নিয়ম তিনি এই পাশ্চাত্যবাসীর নিকটই শিখিয়াছেন। যে পুকুরের জলে লোকে স্নান করে, কাপড় কাচে, সেই পুকুরের জলই পান করে। ইহা পীড়াদায়ক। এই অভ্যাস বিশ্রী ও স্বাস্থ্যসম্মত নহে। রাস্তাঘাটে যেখানে সেখানে থুথু ফেলে, নাক ঝাড়ে। ইহা যে অন্যায় এই বোধটাও লোকের নাই। ইহার ফলে ভারতবাসী আমরা নানা রোগে ভুগিয়া থাকি। বংশপরম্পরায় দারিদ্র্য এই সব আধি-ব্যাধির মূলে রহিয়াছে। আমরা যে আজও বাঁচিয়া আছি, মরিয়া শেষ হই নাই ইহাই আশ্চর্যের বিষয়। ভারতবর্ষের শতকরা মৃত্যুসংখ্যা সর্বোচ্চ। আমরা যাহারা বাঁচিয়া আছি তাহারাও জীবন্মৃত। নোয়াখালির অধিবাসীরা স্বাস্থ্যবিধিপালনে অচিরেই সচেষ্ট হউন, ইহাই তাঁহার অনুরোধ। দরিদ্রও নিখুঁত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকিতে পারে।

ধর্মপুরে প্রার্থনা-সভায় গান্ধীজী কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর দেন। তাঁহাকে দেশীয় রাজ্য সম্বন্ধে অভিমত জিজ্ঞাসা করা হয়। অখণ্ড ভারতে দেশীয় রাজ্যের সমস্যাসমূহের মীমাংসা রাজ্যের শাসকবর্গ করিবেন অথবা দেশীয় রাজ্যের প্রজাগণ করিবেন, এই প্রশ্নের উত্তরে গান্ধীজী বলেন:—তিনি তো দীন প্রজা মাত্র। তবে এই গণনায় তিনি একক নহেন, সংখ্যায় কোটি কোটি। সংখ্যায় তো রাজন্যবর্গ ৬৪০, কিন্তু বাস্তবদৃষ্টিতে দেখিলে তাঁহারা সংখ্যায় একশতও হইবেন না। তাঁহারা ছয়শতই হউন বা একশতই হউন, সে প্রশ্ন অবান্তর। তাঁহারা সংখ্যায় এত নগণ্য যে, জাগ্রত ভারতে তাঁহারা একমাত্র প্রজাভৃত্য হিসাবেই তিষ্টিতে পারিবেন। আজিকার মত নামে প্রজাভৃত্য নহে, কাজে। ইংরাজেরা সমস্ত রাজগণের ও তাঁহাদের প্রজাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করিয়া বিঘ্ন উপস্থিত করিবে, অন্যের মত আমি ইংরাজদের

এত হীন মনে করি না। মন্ত্রীমিশনের প্রস্তাবের অন্তরালে তেমন ইঙ্গিত নাই। কিন্তু আমি বলি ভারতবাসী ব্রিটিশ মন্ত্রীমিশনের দিকে তাকাইয়া থাকিবে কেন? স্বাধীনতা অর্জনে কৃতসংকল্প ভারতবাসীকে তাঁহাদের অভীষ্ট হইতে বিচ্যুত করে, এরূপ শক্তি ইংরাজের নাই, এমন কি ইংরাজ তথা রাজন্যবর্গের সম্মিলিত শক্তিরও নাই।

প্রসাদপুর

৭ই ফেব্রুয়ারি শুক্রবার গান্ধীজী ধর্মপুর হইতে রওনা হইয়া সকাল ৮টা ১০ মিনিটের সময় প্রসাদপুর পৌছেন। দুই মাইল রাস্তা অতিক্রম করিতে তাঁহার ৪০ মিনিট লাগে। প্রসাদপুরের লোকসংখ্যা ৩৪০০। তন্মধ্যে হিন্দুদের সংখ্যা ৯০০। হিন্দুরা কুম্ভকার, নাপিত, বারুজীবী—এই কয়েক শ্রেণীতে বিভক্ত। মুসলমানেরা ক্রমে ক্রমে হিন্দুদের বৃত্তি গ্রহণ করিতেছে।

প্রসাদপুরে মেজর জেনারেল শাহ্ নওয়াজ, শ্রীহরিদাস মিত্র ও শ্রীমতী বেলা মিত্র গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাৎ করেন।

ধর্মপুরের পথে গান্ধীজী আসগর আলি মাস্টার নামে যে ভদ্রলোকের বাড়ী গিয়াছিলেন সেই বাড়ীর একটি তেরচৌদ্দ বৎসরের বালিকা গান্ধীজীকে একখানি পত্র লেখেন। গান্ধীজী প্রসাদপুর হইতে সেই পত্রের উত্তর দেন। বালিকাটির পত্রে গান্ধীজীর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া খোদার নিকট তাঁহার উদ্দেশ্যের সাফল্য কামনা করা হইয়াছে।

মহাত্মা গান্ধী বাংলা ভাষায় ঐ চিঠির উত্তর দেন। গান্ধীজীর এই চিঠিখানি নিম্নে দেওয়া হইল :—

কল্যাণীয়া কামরুন্নেসা—

তোমার পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। কিন্তু এত প্রশংসা করিয়াছ কেন, মা, আমি তো সকলের মত একজন মানুষ। আমি অবিরত এই প্রার্থনাই করি—ঈশ্বর-আল্লা তেরী নাম, সবকো সন্মতি দে ভগবান। ঈশ্বর তোমার নাম, হে ভগবান আপনি সকলকে শুভমতি দান করুন। আমার অন্তরের এই প্রার্থনার সহিত তুমিও স্বীয় প্রার্থনা যোগ করিও।

শুভাশীর্বাদ ইতি—

মোঃ কঃ গান্ধী।

উন্মুক্ত আকাশের নীচে এক মাঠে গান্ধীজীর সান্ধ্য প্রার্থনা-সভা হয়।

প্রার্থনা-সভায় প্রায় ২ হাজার লোক হয়। মুসলমানেরা খুব কম সংখ্যায় এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। সভায় শতাধিক স্ত্রীলোকও উপস্থিত হইয়াছিলেন।

মেজর জেনারেল শাহ্ নওয়াজ, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত, শ্রীযুক্ত কুমারচন্দ্র জানা, শ্রীযুক্ত হরিদাস মিত্র এবং অন্যান্য বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি এই দিন সভায় উপস্থিত ছিলেন। শ্রীমতী বেলা মিত্র প্রার্থনা-সভায় গান করেন।

গান্ধীজী তাহার প্রার্থনোত্তর ভাষণে শ্রমধারা ও আহার্যসংগ্রহ সম্পর্কে বলেন, প্রত্যেকেই যদি স্বীয় পরিশ্রম দ্বারা জীবিকানির্বাহ করে, জগৎ স্বর্গে পরিণত হইবে।

গান্ধীজী বলেন, ঝুঁকিদার ব্যবসায়ে যে অর্থোপার্জন হয়, তিনি তাহাকে সদুপায়ে অর্জিত অর্থ মনে করেন না। কাহারও পক্ষে কু-অভ্যাস ত্যাগ করাও যে অসম্ভব, তাহাও তিনি মনে করেন না। অসাধারণ প্রতিভা সম্পর্কে বিশেষ বিবেচনার কোন প্রয়োজন নাই। নিজের আহার্য-সংগ্রহের জন্য প্রত্যেকেই যদি শারীরিক পরিশ্রম করেন, কবি, ডাক্তার এবং উকিল প্রভৃতি তাঁহাদের মনীষা মানবের সেবার কাজে লাগান, এই নিঃস্বার্থ কর্তব্য-নিষ্ঠার ফলে তাঁহাদের সৃষ্টি আরও উন্নত হইবে।

গান্ধীজী বলেন, তিনি খয়রাতি দান পছন্দ করেন না এবং বহু বৎসর যাবৎ শ্রম দ্বারা জীবিকার্জন সম্পর্কে প্রচার করিতেছেন।

জিলা-ম্যাজিস্ট্রেট ও জামান সাহেব গান্ধীজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এই প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন, তাঁহারা আশ্রয়প্রার্থীদের সাহায্যদান সম্পর্কে তাঁহার মতামত জানিতে চাহিয়াছেন। কচুরিপানা অপসারণ, রাস্তা মেরামত, পল্লী পুনর্গঠন প্রভৃতি কার্য তাঁহারা ইতিপূর্বেই স্থির করিয়াছেন। যাঁহারা এই সমস্ত কার্যের কিছু করিবেন, তাঁহারাই রেশন পাইবেন। গান্ধীজী বলেন, তিনি এই পরিকল্পনা পছন্দ করেন। কিন্তু যেহেতু তিনি বাস্তবমুখী আদর্শবাদী, তিনি আশ্রয়প্রার্থীদের অসুবিধায় ফেলিতে চান না। আশ্রয়প্রার্থীদের সম্মুখে নানাপ্রকার কার্য থাকিবে। তাহাদিগকে নোটিশ দেওয়া হইবে যে, একমাসের মধ্যে যদি তাহারা ইহার মধ্যে কোন একটি কার্য গ্রহণ না করে, অথবা অন্য কোন গ্রহণযোগ্য কাজের প্রস্তাব না করে এবং শরীর সুস্থ থাকা সত্ত্বেও যদি পরিশ্রম করিতে সম্মত না হয়,

আশ্রয়প্রার্থীদের তাঁহারা বলিয়া দিবেন যে, নোটিশের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে তাহাদের আর সাহায্য করা সম্ভব হইবে না।

তিনি আশ্রয়প্রার্থীদের ও বন্ধুবান্ধবদের গভর্নমেণ্টের এই পরিকল্পনায় সহযোগিতা করিতে বলেন। কোন শারীরিক পরিশ্রম না করিয়া নিয়মিত খাদ্য আশা করা যে-কোন নাগরিকের পক্ষে অন্যায়।

লোকজনদের তিনি বাড়ীঘর ত্যাগ করিবার পরামর্শ দিবেন না। যে কোন অবস্থার মধ্যে যদি একজন হিন্দুও নিজেকে নিরাপদ মনে করেন, ইহা তাঁহার নিকট ভাল মনে হয় এবং তিনি আশা করেন যে, মুসলমানগণ তাহার নিরাপত্তা রক্ষা করিবেন। সকলে নিজ নিজ মতে ভগবানের সেবা করুন ইহাই তিনি চান।

প্রসাদপুরে সান্ধ্যভ্রমণের সময় গান্ধীজী অনুরোধক্রমে একটি মুসলমান-বাটীতে যান। বাটীর মালিক আবদুল জব্বর হাজী গান্ধীজীকে আসন দিয়া বসিতে অনুরোধ করেন। গান্ধীজী বলেন যে, তিনি একটু হাঁটিতে চাহেন এবং এখন তাঁহার বসিতে ইচ্ছা করিতেছে না। কিন্তু হাজী সাহেব তাহাতে সন্তুষ্ট হইতে পারেন না। হাজীসাহেব বলেন যে, তিনি যখন তাঁহার বাটীতে আসিয়াছেন তখন সামান্য সময়ের জন্যও তাঁহাকে বসিয়া যাইতেই হইবে। গান্ধীজী হাসিতে হাসিতে আসন গ্রহণ করেন এবং বলেন, "এইবার হইয়াছে তো!" হাজী সাহেব সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িয়া হাসিতে থাকেন।

নন্দীগ্রাম

৮ই ফেব্রুয়ারি শনিবার গান্ধীজী নন্দীগ্রামে পৌছেন। প্রসাদপুর হইতে নন্দীগ্রামের দূরত্ব তিন মাইল। এই পথ ৮৫ মিনিটে অতিক্রম করিয়া ৮-৫৫ মিনিটের সময় গান্ধীজী নন্দীগ্রামে পৌছেন। মেজর জেনারেল শাহ্ নওয়াজ, শ্রীযুত হরিদাস মিত্র এবং শ্রীমতী বেলা মিত্র গান্ধীজীর সহিত নন্দীগ্রামে যান। নন্দীগ্রাম হইতে শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র নাগ গান্ধীজীকে লইবার জন্য প্রত্যূষে প্রসাদপুরে আসেন।

প্রসাদপুর হইতে নন্দীগ্রাম যাইবার পথে মুসলিম স্বেচ্ছাসেবকদেরও গান্ধী-জীর কিছু কিছু মালপত্র বহন করিয়া লইয়া যাইতে দেখা যায়। নন্দীগ্রাম, বিজয়নগর ও হামচাঁদী প্রভৃতি গ্রামেও মুসলিম স্বেচ্ছাসেবকদের গান্ধীজীর আগমনে ব্যবস্থাপক কার্যাদিতে যোগদান করিতে দেখা যায়।

নন্দীগ্রামে দুর্গতনিবাসে তখনও দুইশতাধিক আশ্রয়প্রার্থী ছিল। এই গ্রামে ৩০০০ হাজার হিন্দু ও ২০০০ মুসলমানের বাস। হিন্দুদের ভিতর নাথ ও মৎস্যজীবীই বেশী। মুসলমানেরা পূর্বে মাছ বেচিত না। এক্ষণে তাহারাও একাজ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। তাহারা কাপড়ও বুনিতেছে তবে তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য নহে।

নন্দীগ্রামে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ ও শ্রীযুক্তা লাবণ্যপ্রভা দত্ত গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাৎ করেন।

প্রার্থনা-সভায় খুব লোক হইয়াছিল। উপস্থিত স্ত্রীলোকদের হিসাব হইতে বাদ দিলে হিন্দু-মুসলমানের সংখ্যা প্রায় সমান ছিল। কোন বন্ধু গান্ধীজীকে চারিটি প্রশ্ন করেন। উত্তরে গান্ধীজী বলেন, বয়কটের কথা আমি শুনিয়াছি এবং কোন কোন সভায় পূর্বে সে সম্বন্ধেও বলিয়াছি। আমার বিশ্বাস,—একথা আমি জানি যে, এই বয়কট গোটা নোয়াখালির কথা নহে। খুব সম্ভব অল্প লোকই বয়কটের পক্ষে। বয়কট কতটা ব্যাপক জানি না। যতটাই হউক না কেন, একথা নিঃসংশয়ে বলিব যে তাহা একান্ত অসঙ্গত। বয়কটে কাহারও ক্ষতি ছাড়া লাভ হইবে না—না যাহারা বয়কট করিবে তাহাদের, না যাহাদের বয়কট করা হইবে তাহাদের। একথা আজই বলিতেছি তাহা নহে, বিগত ষাট বৎসর ধরিয়া আমি ইহা বলিয়া আসিতেছি। কিন্তু একটা অবস্থায় বয়কটের কথা বাস্তব প্রশ্নে পরিণত হইতে পারে। মুসলমানেরা যদি হিন্দুদিগকে শত্রু মনে করে ও তাহাদিগকে নোয়াখালি হইতে বিতাড়িত করিতে চাহে তবেই সেই অবস্থার উদ্ভব হইবে। তবে তাহা হইবে যুদ্ধঘোষণারই সামিল। ভারতবাসী মাত্রেই অতি জঘন্য বোধে ঘৃণায় তাহা হইতে দূরে থাকিবে। বিচ্ছিন্ন বয়কট প্রচেষ্টার উত্তরে হিন্দুদের আমি জমি পতিত রাখিতে বলি, যেমন রাখে অস্ট্রেলিয়ার অধিবাসীরা। যে পরিমাণ জমি নিজেরা চাষ-আবাদ করিতে পারিবে তদতিরিক্ত জমি তাহারা বেচিয়া ফেলিতেও পারে। নিজ চেষ্টায় যতটা জমি চাষ করা যায় তাহার অতিরিক্ত জমি না রাখাই সর্বোত্তম পথ। তাহাই আমাদের লক্ষ্য হওয়া চাই ও তদনুযায়ী চেষ্টা করা চাই।

ভয় পরিহার

নোয়াখালিতে তিন মাস আছি। তাহা বৃথা যায় নাই একথা মনে করিতে আমার ভাল লাগে। পরে কি হইবে জানি না, এখন তো দেখিতেছি হিন্দুরা ভয় অনেকটা পরিহার করিয়াছেন।

তৃতীয় প্রশ্নের উত্তরে গান্ধীজী বলেন—নোয়াখালিতে কিছুসংখ্যক শান্তিকামী মুসলমান আছেন, প্রশ্নকর্তা একথা স্বীকার করিয়াছেন দেখিয়া আমি আনন্দিত। দুষ্ট দুরাচারীদের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার মত সাহস তাহাদের মধ্যে সঞ্চারিত হইয়াছে কিনা, সে সম্বন্ধে কিছু না বলিয়া এই কথাই মাত্র বলিব যে, শান্তিকামী মুসলমান আছেন, না থাকিলে তো এস্থান নরক হইত। উপরে হিন্দুদের কথায় যাহা বলিয়াছি শান্তিকামী মুসলমানদের সম্বন্ধে তাহাই বলি—তাঁহারা ভয় পরিহার করিয়াছেন। মুসলমান বন্ধুরাই নিশ্চিত বলিতে পারেন আমার এই কথা সত্য কিনা। কিন্তু আমার তো ধারণা কতিপয় মুসলমান বন্ধুর মনের পরিবর্তন হইয়াছে। উদাহরণস্বরূপ ভাটিয়ালপুরের একজন মুসলমানের কথা বলিতে পারি। তিনি বলিয়াছিলেন যে, মন্দির তাঁহারা ভাঙ্গিয়াছেন, ভবিষ্যতে মন্দির আক্রান্ত হইলে জীবন দিয়া তাহা রক্ষা করিবেন। পরিক্রমায় অনুরূপ আশাপ্রদ অপর উদাহরণও দেখিয়াছি।

অন্য প্রশ্নের উত্তরে গান্ধীজী বলেন—আমার চরিত্র যদি নিষ্কলঙ্ক হয়, মনে মুখে যদি আমি এক হই, তাহা হইলে আমার কাজের ফল ফলিবেই। আমার মৃত্যুতেও তাহার ক্ষয় হইবে না। কি ব্যক্তিগত জীবনে, কি সার্বজনীন জীবনে একই রূপ নিখুঁত ও পবিত্র হওয়া চাই। সেবার প্রেরণায় যদি তাঁহারা কাজে লিপ্ত হইয়া থাকেন, দেহে-মনে যদি তাঁহারা পবিত্র হন, আমার নামের আকর্ষণে যদি তাঁহারা আকৃষ্ট না হইয়া থাকেন তবে আমার সহকর্মীদের সমবেত প্রায়শ্চিত্ত সময়ে ফলপ্রসূ হইবেই হইবে। কর্মীর মৃত্যুর সাথে তাহার ভালকাজ ধুইয়া মুছিয়া যায় এইরূপ অন্ধ সংস্কার আমি কখনও মনে স্থান দিই নাই। পক্ষান্তরে, সত্যিকার খাঁটিকাজের ফল কর্মীর মৃত্যুর পর চিরকাল অমর হইয়া থাকে।

বিজয়নগর

৯ই ফেব্রুয়ারি রবিবার গান্ধীজী বিজয়নগরে পৌছেন। বিজয়নগরে গান্ধীজী দুইদিন অবস্থান করেন।

নন্দীগ্রাম হইতে বিজয়নগরের পথ দীর্ঘ ছিল। অনুমান সাড়ে তিন মাইল হইবে। গান্ধীজীর যাইতে দেড় ঘণ্টা লাগে। পথে একটি বাটীতে গান্ধীজীকে অভ্যর্থনা করা হয়। এইদিন অপরাহ্ণে কয়েকজন মুসলমান তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কতকগুলি প্রশ্ন করেন।

বিজয়নগরে গান্ধীজী ও অপর সকলের বেশ সন্তোষজনক ব্যবস্থা হইয়াছিল। বিজয়নগরে মহিলা-কর্মিগণ গান্ধীজীকে জানান যে, তাঁহারা স্থানীয় মুসলমানবাটীর স্ত্রীলোকদের মধ্যে মিশিতেছেন। তাঁহাদের অভিজ্ঞতা এই যে, দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে এত অবিশ্বাস রহিয়াছে যে, ঐক্য-প্রতিষ্ঠার কাজ বড়ই কঠিন। মহিলা-কর্মী শ্রীযুক্তা অশোকা গুপ্তা বিজয়নগরে গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া নারী-কর্মীদের সম্পর্কে তাঁহার উপদেশ গ্রহণ করেন।

এই গ্রামে একজন স্থানীয় লোক গান্ধীজীকে প্রশ্ন করেন যে, বিগত হাঙ্গামায় হিন্দুদের লাঙ্গল গরু প্রভৃতি লুণ্ঠিত হইয়াছে। অন্যদিকে মুসলমানেরা হিন্দুর চাষ-আবাদ করিতে নারাজ হওয়ার ফলে হিন্দুরা লঙ্কা ও সরিষার ফসল হারাইয়াছে। বোরো ও আউস বোনার সময় হইয়াছে। হিন্দুদের না আছে লাঙ্গল, না আছে চাষ করিবার লোক। উপায় কি?

উত্তরে গান্ধীজী বলেন, "ইহা সত্য হইলে অত্যন্ত দুঃখের কথা। এতটুকু জমি অনাবাদী পড়িয়া না থাকে তাহা দেখা গভর্নমেণ্টের কর্তব্য। খাদ্যশস্যের জমি গভর্নমেণ্ট অনাবাদী পড়িয়া থাকিতে দিতে পারেন না। এ বিষয়ে জমির মালিকের মাথাব্যথা হইতে গভর্নমেণ্টের মাথাব্যথা অনেক বেশী, অন্ততঃ হওয়া চাই; সুতরাং এ বিষয়ে জমির মালিক গভর্নমেণ্টের সাহায্য চাহিবে। আর গভর্নমেণ্টের স্পষ্ট কর্তব্য হইতেছে যে, ঐসব জমি চাষের সুব্যবস্থা করিয়া দেওয়া। কোন্ জমি হিন্দুর আর কোন্ জমি মুসলমানের সে কথা ঠেলিয়া ফেলিয়া চাষ-আবাদের অত্যাবশ্যক কাজে মুসলমানদের লাগান গভর্নমেণ্টের দায়। ক্ষেতমজুর ন্যায্য মজুরি পায় কিনা তাহা তো সরকার দেখিবেনই।

বিজয়নগরে গান্ধীজীর প্রথমদিনের প্রার্থনা-সভা গান্ধীজীর বাসস্থান হইতে প্রায় দেড়মাইল দূরে ধোপাপাড়ায় ঠিক করা হইয়াছিল। ধোপারা জানাইয়াছিল যে, ঐ পাড়ায় গান্ধীজীর প্রার্থনা-সভা না করা হইলে তাহারা সত্যাগ্রহ করিবে। দ্বিতীয় দিনের প্রার্থনা-সভা গান্ধীজীর বাসস্থানের নিকটে একটি মাদ্রাসা-সংলগ্ন প্রাঙ্গণে হয়। প্রথম দিনের প্রার্থনা-সভায় খুব লোক হয়। মুসলমানের সংখ্যাও অন্ততঃপক্ষে শতকরা ৩০ জন ছিল।

গান্ধীজী প্রথম দিনের প্রার্থনা-সভায় কর্মীদের কতকগুলি প্রশ্নের উত্তর দেন।

প্রশ্ন : দেখা গিয়াছে কিছুদিন কাজ করিবার পর কর্মীরা প্রভুত্বপ্রয়াসী হইয়া উঠে। তাহার সহকর্মীরা এইরূপ প্রভুত্বপ্রয়াসী কর্মীকে কিভাবে সংযত রাখিবে? অন্য কথায়, সংস্থার গণতান্ত্রিক রূপ কিভাবে বজায় রাখা যায়? প্রভুত্বপ্রয়াসী কর্মীর সহিত অসহযোগ করা যাইবে না, কেননা তাহাতে সংস্থার হানি হইবে।

উত্তর : ইহা প্রশ্নকর্তারই কেবল অভিজ্ঞতা নহে। প্রায় সর্বত্রই এরূপ দেখা যায়। প্রভুত্বপ্রয়াস মানুষের রক্তে মাংসে, আর সাধারণতঃ কর্মীর মৃত্যুতেই তাহার শেষ হয়, তৎপূর্বে নহে। প্রভুত্বপ্রয়াসী সহকর্মীকে সংযত রাখা সহজ কাজ নহে। কারণ তাহারা নিজেরাও প্রায়ই এই দুর্বলতা হইতে মুক্ত নহে। যতক্ষণ ষোলআনা গণতন্ত্রসম্মত কোন সংস্থা চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ না করিতে পাইতেছি ততদিন পূর্ণ গণতান্ত্রিক সংস্থার রূপ যে কি তাহা আমরা নিঃসংশয়ে বলিতে অক্ষম। নিখুঁত গণতন্ত্র নিখুঁত অহিংসার ভিত্তিতেই কেবল সম্ভব। প্রশ্নকর্তা যদি হিংসামূলক অসহযোগের (সর্বত্র না হইলেও, প্রায়ই তো হিংসামূলক) কথা বলিতেন, তবে বলিতাম যে তাঁহার প্রশ্নটি ঠিকই হইয়াছে। অহিংস অসহযোগের রূপ যে কি তাহা আমি জানি। অহিংস অসহযোগের অভিজ্ঞতা হইতে বলিতে পারি যে, ভাল উদ্দেশ্যে অসহযোগ করিলে তাহা কখনও বিফল হয় না। আর তাহাতে সংস্থারও কোন ক্ষতি হয় না। প্রশ্নকর্তা যে অসহযোগের কথা বলিয়াছেন, খুব ভালোর দিক হইতে দেখিলে তো তাহা প্রচ্ছন্ন বই কিছুই নহে। ব্যর্থ অসহযোগের দৃষ্টান্ত হরিজন ও ইয়ং ইণ্ডিয়া পত্রে বহু মিলিবে। উহাদের ব্যর্থতার মূলে দুইটি মারাত্মক ত্রুটি বিদ্যমান, হয় তাহা ছিল অংশতঃ অহিংসামূলক, নয়তো একেবারেই হিংসামূলক। দীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতা হইতে বলিতে পারি যে, যাহারা অপরের বিরুদ্ধে প্রভুত্বপ্রয়াসের অভিযোগ করে, তাহারা নিজেরাও সেই দোষে কম দোষী নহে। এরূপ ক্ষেত্রে দোষ নির্ণয় করা দুরূহ। একগণ্ডা ও চারের ব্যবধান নির্ণয় চেষ্টার মতই তাহা নিরর্থক।

প্রশ্ন : এমন গ্রাম দেখি না যেখানে দলাদলি, বাদ-বিসম্বাদ নাই। এমতাবস্থায় স্থানীয় লোকের সাহায্য গ্রহণ করিতে গেলেই ইচ্ছায় হউক অনিচ্ছায় হউক ক্ষমতা হস্তগত করিবার গ্রাম্য নীতির আবর্তে পড়িতে হয়। এই

অবাঞ্ছনীয় অবস্থার হাত হইতে বাঁচিবার উপায় কি? গ্রামের দলাদলি হইতে দূরে থাকিয়া বাহিরের কর্মীর দ্বারা কাজ করিতে চেষ্টা করিব কি?

উত্তর: ভারতবর্ষের ইহা খুবই দুর্ভাগ্য। শহরের দলাদলি ও বাদ-বিসম্বাদ হইতে পল্লী-অঞ্চলও মুক্ত নহে। গ্রামবাসীর শুভাশুভের দিকে লক্ষ্য নাই, নিজ ক্ষমতা প্রতিপত্তি কি করিলে বৃদ্ধি হইবে, সেইদিকেই দৃষ্টি। এরূপ কাজে গ্রামের সাহায্য হয় না, তাহা হয় পথের বাধা। ফলাফলের কথা না ভাবিয়া যতদূর সম্ভব গ্রামের লোকের সহায়তায়ই কাজ করিতে হইবে। কর্মীর মনে যদি ক্ষমতা হস্তগত করিবার লোভ না থাকে, তবে কাজ ঠিকই চলিবে। একথা আমাদের সতত মনে রাখিতে হইবে যে, দেশের মেরুদণ্ডস্বরূপ গ্রামকে উপেক্ষা করার অমার্জনীয় দোষে শহরের শিক্ষিত নরনারীরাই দোষী। সে কথা মনে রাখিলে আমরা কখনও ধৈর্যহারা হইব না। এমন গ্রাম আমি দেখি নাই, যেখানে একজনও নিষ্ঠাবান কর্মী নাই। এরূপ কর্মীর সন্ধান যে আমরা পাই না, তাহার কারণ গ্রামে যোগ্য লোক থাকিতে পারে, একথা আমরা মনে আনি না; অনেক সময় অহমিকা হইতে আমাদের দূরে থাকিতে হইবে। এদল, ওদল কোন দলই আমাদের কাছে নাই। যাহারা আমাদের যথার্থ সহায়তা করিবে, তাহাদের সহায়তা আমরা লইব। এইভাবে চলিলেই গ্রাম্য রাজনীতি হইতে আমরা দূরে থাকিতে পারিব। গ্রামবাসীদের উপেক্ষা করিয়া চলিলে মারাত্মক ভুল করা হইবে। সেস্থলে নিষ্ফলতা অনিবার্য। একথা জানি বলিয়া এক গ্রামে একাধিক কর্মীকে আমি বসিতে দেই নাই। অবশ্য এই নিয়মের ব্যতিক্রম করা হইয়াছে। অবাঙালী কর্মীর সহিত একজন বাঙালী কর্মীকে দোভাষী রূপে দেওয়া হইয়াছে। যতদূর দেখিতেছি এই নীতিতে কাজ করার ফল ভালই হইতেছে। অতএব আপনার কথায় আমি কান দিব না। পক্ষান্তরে একথাও আমি বলিব যে, কোন কিছু ভাল করিয়া পরীক্ষা করার পূর্বেই সাত-তাড়াতাড়ি আমরা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করিয়া বসি। ইহা আমাদের একটা বদ-অভ্যাসে পরিণত হইয়াছে। গ্রামের কর্মী পাওয়া যায় না। বহিরাগত কর্মী চলিয়া গেলেই তাহার আরব্ধ কার্য খতম হইয়া যায়। এইরূপ অপবাদ দেওয়া অন্যায়। দুই এক বছর কাজ করার পরেও যদি স্থানীয় লোকের সহায়তা পাওয়া না যায়, তাহা হইলেও নিশ্চিতরূপে বলা যাইবে না যে, গ্রামের লোকের দ্বারা কাজ করান যায় না বরং তাহার উল্টাটাই সত্য। প্রধান কর্মীর প্রতি আমার স্পষ্ট উপদেশ এই যে, বাহিরের কোন কর্মী সঙ্গে থাকিলে তাহাকে

সরাইয়া দিন। বুদ্ধিবিবেচনাপূর্বক নির্ভীকভাবে একাই কাজ করিয়া যান। অকৃতকার্য যদি না হন তবে বুঝিবেন আপনি কাজের লোক আছেন। অন্য কাহাকেও দোষী করিবেন না।

প্রশ্ন : নোয়াখালির বিধ্বস্ত অঞ্চলে খাদিকার্য প্রবর্তনের কথা উঠিয়াছে। এই কার্য বাহির হইতে চরখার কার্যে কুশলী লোক আনিয়া বাহিরের অর্থে আরম্ভ করা উচিত হইবে, অথবা স্থানীয় লোকের দ্বারা-স্থানীয় অর্থে ধীরে ধীরে গড়িয়া তোলা ঠিক হইবে ?

উত্তর : আপনি যেমন বলিয়াছেন, সে কথার পুনরাবৃত্তি করিয়া আপনার প্রশ্নের জবাব দিতেছি। স্থানীয় লোকের দ্বারা স্থানীয় লোকের অর্থে ধীরে ধীরে খাদিকার্যের সবটা বুনিয়াদ গড়িয়া তুলুন। তবে সূতা কাটা বলিতে আমি যাহা বুঝি তাহার সম্যক্ জ্ঞান ও কৌশল আপনার থাকা চাই। সেখানে ত্রুটি থাকিলে চলিবে না। সূতাকাটার মর্মকথা যে কি তাহা জানিবার আগ্রহ থাকিলে, হরিজনের পৃষ্ঠা হইতে তাহা আপনি নিঃসন্দেহে খুঁজিয়া লইবেন।

বিজয়নগরে থাকাকালীন দ্বিতীয় দিন সকালে গান্ধীজীর পার্শ্ববর্তী গ্রাম গোপীনাথপুরে ফজলুল করিম চৌধুরী নামে এক মুসলমান অধিবাসীর বাড়ী যাওয়ার কথা ছিল। পথ ছিল দূরের। গান্ধীজীকে যতখানি দূরত্বের কথা বলা হইয়াছিল সেই বাটীর দূরত্ব তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী ছিল। প্রায় ৪৫ মিনিট পথ চলিবার পর গান্ধীজী একটু পরিশ্রান্ত মনে করেন। তিনি দূরত্বের কথা আবার জানিতে চাহেন। স্থানীয় একজন লোক বলেন যে, গন্তব্যস্থানে পৌছিতে এখনও ১৫ মিনিট লাগিবে। গান্ধীজীর সেদিন মৌনদিবস ছিল। গান্ধীজী লিখিয়া জানান যে, তাঁহাকে যে এতখানি পথ চলিতে হইবে তাহা পূর্বে তাঁহাকে ঠিকভাবে জানান হয় নাই। তিনি বলেন, আমাকে যদি অসাড় হইয়া পড়িয়া যাইতে না হয় তাহা হইলে আমার আর অগ্রসর হওয়া চলে না। এই বলিয়া তিনি ফিরিয়া আসেন। তাঁহার বাসস্থানে ফিরিতে পুরা ১ ঘণ্টা ২০ মিনিট সময় লাগে। তিনি বলেন যে, এতটা পথ চলা তাঁহার শক্তির অতীত এবং ভবিষ্যতে যখন তাঁহাকে কেহ কোথাও যাইতে নিমন্ত্রণ করিবেন তাহার পূর্বে সহজে ধীরে ধীরে পা ফেলিয়া যেন দেখিয়া লওয়া হয় যে, কতটা সময় লাগিবে।

গান্ধীজী গোপীনাথপুরের হিন্দু ও মুসলমান অধিবাসীদের নিকট না যাইতে পারায় ত্রুটি স্বীকার করেন এবং প্রার্থনা-সভায় ইহাও বলেন যে, গোপীনাথপুরের

অধিবাসীদেরও নোয়াখালির অধিবাসীর নিকট ত্রুটি স্বীকার করিতে হইবে যে, তাঁহারা তাঁহাদের কথা ঠিক ঠিক বলেন নাই।

দ্বিতীয় দিন বিজয়নগরে প্রার্থনা-সভায় গান্ধীজী কয়েকজন মুসলমান বন্ধুর কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর দেন।

প্রশ্ন: আপনি বলিয়াছেন যে, উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে যতদিন পূর্ণ শান্তি ও ভ্রাতৃভাব প্রতিষ্ঠিত না হইবে ততদিন আপনি এখানে থাকিবেন এবং প্রয়োজন হইলে আপনি মৃত্যুবরণ করিবেন। কিন্তু এখানে আপনার এতদিনের অবস্থানে ভারতবাসীর তথা জগৎবাসীর দৃষ্টি অযথাই নোয়াখালির প্রতি নিবদ্ধ হইবে না কি? আর তাহার ফলে এ কথাই লোকের মনে হইবে না কি যে এখানে এখনও অরাজকতা চলিতেছে? মুসলমানেরা যদিও শীঘ্র এখানে তেমন কিছু করে নাই।

উত্তর: "এখানে আমার অবস্থানের ফলে কোন নিরপেক্ষ লোকের মনে এরূপ অমূলক ধারণার সৃষ্টি হইতে পারে না। আমি এখানে আপনাদের বন্ধু ও সেবক হিসাবেই আসিয়াছি। হাঁ—আমি তো বলিয়াছি যে, নোয়াখালি সোনার দেশ এবং হিন্দু-মুসলমান মিলিয়া মিশিয়া বন্ধুর মত থাকিলে, নোয়াখালি স্বর্গ হইবে। আমার এখানে অবস্থানহেতু এই কথা অবশ্যই দূর-দূরান্তরে প্রচলিত হইয়াছে। কে জানে পরিশেষে আমি অকৃতকার্য হইব কি না এবং লোকে বলিবে কি না যে অহিংসার প্রায় কিছুই আমি জানি না। ইহা ছাড়া এখানে আমি থাকিবই বা কেন? হিন্দু-মুসলমান যথার্থ বন্ধুভাবে বাস করিতেছে দেখিতে পাইলেই আমি চলিয়া যাইব। কিন্তু দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে, যে সকল সংবাদ আজও আমি পাইতেছি তাহা হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে এরূপ মধুর সম্পর্কের সংবাদ নহে।

প্রশ্ন: মুসলমানদের কাছ হইতে হিন্দুদের এখন আর কোন ভয় নাই, মুসলমানেরা এই আশ্বাস দেওয়া সত্ত্বেও এবং যেখানে যেখানে হিন্দুরা ফিরিয়া আসিয়াছে তথায় মুসলমানেরা তাহাদের কথামত কাজ করা সত্ত্বেও হিন্দুরা ফিরিতেছে না। ইহা হইতে এ কথাই কি মনে হয় না যে, খামকাই হিন্দুরা দূরে থাকিয়া দেখাইতে চাহে যে এখানে এখনও অশান্তির শেষ হয় নাই?

উত্তর: খামকা দুই-একজন হিন্দু ঘরদুয়ার ছাড়িয়া অন্য স্থানে থাকিতে পারে। কিন্তু বহুর সম্পর্কে একথা বলা চলিবে না। সঙ্গত কারণ ছাড়া কেহই বাড়ীঘর ছাড়িয়া নির্বাসনে থাকিতে চাহে না। কে কোথায় আছে তাহা

আমি জানি না, কিন্তু ইহা জানি যে ভয়ে ও অনাহারে মাথা গুঁজিবার স্থান নাই বলিয়া তাহারা অন্যত্র আছে। সে যাহাই হউক সরকারী কর্মচারীরা আমাকে বলিয়াছেন যে, লোকে আশানুরূপ ফিরিয়া আসিতেছে। উহা অপেক্ষা অধিক সংখ্যায় আসিতে থাকিলে তাঁহারা তাল সামলাইতে পারিবেন না। প্রত্যক্ষ যাহা দেখা যাইতেছে তাহা উপেক্ষা করিয়া প্রমাণসাপেক্ষ পেঁচালো সিদ্ধান্ত করা কাজের কথা নয়। তবে এমনটা যদি হয় যে, কাহারও প্ররোচনায় তাহারা বাড়ী ফিরিয়া আসিতেছে না, সেক্ষেত্রে প্ররোচকের দণ্ডের ব্যবস্থা আইনই করিবে। ফলে বৃক্ষের পরিচয়। ভিটাবাড়ীছাড়া হিন্দুরা নিজ নিজ গৃহে ফিরিয়া আসুক,বেশির ভাগ মুসলমানের ইহাই যদি মনের কথা হয়,তাহা হইলে হিন্দুরা খুশী মনেই ফিরিয়া আসিবে সন্দেহ নাই। কিন্তু প্রশ্নকর্তা যেরূপ সুন্দর কথা বলিয়াছেন, আসলে ব্যাপারটা তাহা নহে।

প্রশ্ন : মুসলমানপ্রধান প্রদেশে মুসলমানেরা এবং হিন্দুপ্রধান প্রদেশে হিন্দুরা অবাধ স্বাধীনতা ভোগ করিবে ইহাই পাকিস্তানের কথা। তবে ইহাতে কংগ্রেসের আপত্তি কেন?

উত্তর : উত্তর সোজা। পাকিস্তান বলিতে মুসলমানপ্রধান প্রদেশে যদি কেবলমাত্র মুসলমানদের ও হিন্দুপ্রধান প্রদেশে কেবলমাত্র হিন্দুদেরই স্বাধীনতা বুঝায় তবে তাহা কখনই গ্রাহ্য হইতে পারে না। সুখের বিষয় কোন মুসলমান নেতা, সর্বোপরি কায়েদ-ই আজম কখনই পাকিস্তানের এইরূপ অর্থ করেন নাই। বিহারে হিন্দুরা স্বাধীন, আর মুসলমানেরা হিন্দুদের দাস হইবে কেন? অথবা মুসলমানেরা বাংলার বাদশাহ, এবং হিন্দুরা মুসলমানের নফর —এরূপই বা হইবে কেন?

প্রশ্ন : সর্বত্রই যে গোলমাল তাহার মূলে রহিয়াছে কংগ্রেস-লীগ বিরোধ। কংগ্রেস-লীগ বিরোধের অবসান না হইলেও কি এখানে কখনও মৈত্রী প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে? আর যদিই বা ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে তাহা কতদিন স্থায়ী হইবে?

উত্তর : আমি স্বীকার করি যে, কংগ্রেস-লীগ বিরোধ চলিতে থাকিলে হিন্দু-মুসলমান ঐক্য স্থায়ী হইতে পারে না। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও আমি আশা করি যে, সময় থাকিতে নোয়াখালির হিন্দু-মুসলমান আপনারা পরস্পরের প্রকৃত বন্ধুর মত চলিবেন, এবং কংগ্রেস-লীগ বিরোধ থাকা সত্ত্বেও আপনারা বন্ধুভাবে বাস করিতে পারেন সেই দৃষ্টান্ত আপনারা ভারতবাসীর কাছে বিশেষ

করিয়া কংগ্রেস লীগের কাছে ধরিবেন। এ উদ্দেশ্যেই আমি এখানে আসিয়াছি। পূর্ণ অহিংসার পরীক্ষায় আমি উত্তীর্ণ হইতে চাই। আমার অহিংসায় যদি খুঁত না থাকে, তবে আমার ঈপ্সিত বন্ধুত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবেই। ঐক্য যদি প্রতিষ্ঠিত না হয়, তবে তাহা আমার ত্রুটির জন্যই হইবে না। কিন্তু অহিংসার পরাজয় কখনও হয় না, তাই তো আমি বলিয়াছি—হয় অভীষ্ট লাভ, নয়তো সেই চেষ্টায় নোয়াখালিতে জীবনযাপন করিব। আমার এই সাধনায় প্রশ্নকর্তাকে সহায় হইতে আবাহন করিতেছি।

হামচাঁদী

১১ই ফেব্রুয়ারি মঙ্গলবার গান্ধীজী হামচাঁদীতে আসেন। হামচাঁদীতে হিন্দুদের বাস খুব কম। যে বাড়ীতে গান্ধীজী থাকেন উহা একটি ধ্বংসাবশেষ। অনেক বড় বড় ঘর পুড়িয়া ছাই হইয়াছে। একটা পাকাঘরের এক অংশ দাঁড়াইয়া আছে। দরজা-জানালাগুলি পুড়িয়া গিয়াছে। সেই অংশেই গান্ধীজী থাকেন। গান্ধীজী গ্রাম হইতে গ্রামান্তর ভ্রমণকালে পোড়া বাটীতে পোড়া ঘরে সেই প্রথম থাকিলেন।

বিজয়নগর হইতে হামচাঁদী আসার পথে তাঁহাকে প্রধানতঃ মুসলমান-অধ্যুষিত গ্রাম অতিক্রম করিয়া আসিতে হয়। কতিপয় দুর্বৃত্ত গান্ধীজীর পরিক্রমা-পথ আবর্জনাপূর্ণ করিয়া রাখিয়াছিল।

অবশ্য অগ্রগামী কর্মীদল পূর্বেই পথ পরিষ্কার করিয়া রাখিয়াছিলেন।

হামচাঁদী আসার পথে গান্ধীজী একমাত্র শশিভূষণ সাহার গৃহে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়াছিলেন। এই গৃহটি সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হইয়াছে এবং বাড়ীর কোন কোন লোক তখন সবেমাত্র প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন।

হামচাঁদীতে আসাম প্রদেশের কাছাড় জেলা হইতে আগত এক মণিপুরী প্রতিনিধিদল গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যে অভিযোগ করেন, তাঁহার প্রার্থনান্ত ভাষণে মহাত্মা গান্ধী উহার উল্লেখ করিয়া বলেন যে, ৪৫ বৎসর পূর্বে লণ্ডনে অধ্যয়নকালে তিনি মণিপুরীদের বীরত্বকাহিনী শুনিতে পান। মণিপুরী প্রতিনিধিদল তাঁহার নিকট অনুযোগ করেন যে, আসামের বর্ণহিন্দুরা মণিপুরীদের নিজেদের অংশস্বরূপ বিবেচনা করিলেও তাহাদের স্বার্থের প্রতি অবহিত নহে; মণিপুরীদের একটি পৃথক ভাষা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য আছে বলিয়া দাবি করা হইয়াছে। প্রতিনিধিদল আরও অনুযোগ করিয়াছেন যে, অসমীয়া

বর্ণহিন্দুরা তাহাদের মধ্যে মণিপুরীদের উপস্থিতি শুধু সংখ্যাবৃদ্ধির সুযোগ হিসাবে ব্যবহার করিতেছে। কিন্তু তাহারা মণিপুরীদের স্বার্থ সম্পর্কে অবহিত নয়। এরূপ অবস্থায় তাহাদের স্বার্থরক্ষার জন্য কোনরূপ ব্যবস্থা হওয়া উচিত বলিয়া তাঁহারা অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।

মহাত্মা গান্ধী বলেন যে, হিন্দুধর্মকে টিকিয়া থাকিতে হইলে জাতিভেদ-প্রথার বিলোপ প্রয়োজন। বর্ণহিন্দু বলিতে যদি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য—এই তিন শ্রেণীকে মাত্র বুঝায় তাহা হইলে উহারা নগণ্য সংখ্যালঘু মাত্র। ব্রিটিশ শক্তির অপসারণ ঘটিবার এবং স্বাধীনতা অর্জিত হইবার পর উচ্চবর্ণের কোনরূপ অস্তিত্ব থাকিবে না। তিনি আশা করেন যে, সর্বপ্রকার অসাম্য অতীতের কাহিনীতে পরিণত হইবে। সেরূপ অবস্থায় নির্যাতিতগণ নিজেদের আত্মশক্তি ফিরিয়া পাইবে।

হামচাঁদীতে গান্ধীজী কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর দেন।

প্রশ্ন ঃ আপনি নরনারী সকলকেই পরিশ্রম করিতে বলিয়াছেন। নিজে যতটা জমি কেহ চাষ করিতে পারে তাহার অধিক জমি কাহারও রাখা উচিত নহে, একথাও বলিয়াছেন। কিন্তু আমাদের বর্তমান সামাজিক অবস্থায় তাহা কি সম্ভব?

উত্তর ঃ আমি স্বীকার করি যে আমি এরূপ পরামর্শ দিয়াছি, আর এখনও দিতেছি। আদর্শ সমাজে যেরূপ ব্যবস্থা হওয়া উচিত আমি তাহাই বলিয়াছি। এই ক্ষেত্রে তো আমার এইরূপ পরামর্শ দায়ে ঠেকিয়া ভাল হওয়ার পরামর্শ। একথা যে বলিতেছি তাহার কারণ, খবর পাইতেছি যে, যাহারা সাধারণতঃ জমি চাষ করিত সেই মুসলমানেরা আজ জমি চাষ করিতে নারাজ। ছেলে-মেয়েদের শিক্ষা এবং বৃদ্ধ ও অসমর্থদের প্রশ্ন ওঠা উচিত নহে, ছেলেমেয়েরা বাড়ীতে পারিবে। থাকিল বৃদ্ধ ও অসমর্থদের কথা। যে লোক খুশীমনে কাজ করিবে তাহার বাড়ীর বৃদ্ধ ও অসমর্থ লোক অনাহারে মরিবে না। ছেলেমেয়ের শিক্ষা এবং অসমর্থদের ভরণপোষণের দায় সরকারের বহন করা উচিত একথা তো আমি বলিই। মনে রাখিবেন, জমির মালিককে বিনামূল্যে জমি ছাড়িয়া দিতে আমি বলি নাই; উচিত মূল্যে তাঁহার জমি বিক্রয় করিবেন। উচিত মূল্য না পাইলে বিক্রয় না করিয়া জমি তাঁহারা পতিত ফেলিয়া রাখিবেন। তাহাতে ক্ষতির কথা নাই।

প্রশ্ন ঃ ব্যবস্থাপক সভায় বর্গাদার বিল নামে একটি বিল উপস্থাপিত করা হইয়াছে। উহা পাস হইলে জমির মালিক অর্ধেক স্থলে এক-তৃতীয়াংশ ফসল

পাইবে। পূর্ববৎসর যাহাদের বর্গা দেওয়া হইয়াছে, এবারও তাহাদের বর্গা দেওয়া হইলে সেই জমি ১৯৪৯ সন পর্যন্ত সেই বর্গাদারের হাতেই থাকিবে। চর-অঞ্চলের হিন্দুরা নিজেরাই জমি চাষ করিয়া থাকে। দাঙ্গার সময় বাড়ী ছাড়িয়া আসিবার কালে মুসলমানদের তাহারা জমি বর্গা দিয়া আসিয়াছিল। এক্ষণে যেসব জমিতে ফসল রহিয়াছে জুনমাসের পূর্বে তাহা উঠিবে না। সুতরাং এ বৎসরও সে সকল জমি মুসলমানের হাতেই থাকিয়া যাইতেছে। সুতরাং অন্ততঃ আগামী তিন বৎসরের জন্য চরের জমি হিন্দুদের হাতছাড়া হইয়া যাইবে।

হিন্দুরা এখন চরে ফিরিয়া যাইতেছে। আইনের কারসাজিতে তো তাহারা নিজ নিজ চাষ করিতে না পারিয়া বেকার হইয়া যাইবে, ইহার প্রতিকার কি ?

উত্তর : যম না আসিতেই যমের ভয়ে অথর্ব হওয়া কোন কাজের কথা নহে। বিলটা পাস হইয়া গেলে না কথা। সে যাহাই হউক অর্ধেক স্থলে ফসলের এক-তৃতীয়াংশের প্রস্তাবে জমির মালিকের রাজী হওয়া উচিত। অদূর ভবিষ্যতে রাষ্ট্রই সব জমির মালিক হইবে, অথবা যে চাষ-আবাদ করিবে জমি তাহারই হইবে। এই প্রশ্নটাকে সাম্প্রদায়িক রূপ দিলে ভুল করা হইবে। হইতে পারে নোয়াখালির বেশির ভাগ জমি হিন্দুর। আইন যদি ভাল হয় তবে আপত্তির কিছুই থাকিতে পারে না ; ক্ষতি তাহাতে যাহারই হউক না কেন ? বর্গাদারকে জমি দিতেই হইবে কিনা সে বিষয়ে আমার ঘোর সন্দেহ আছে। বিলের খসড়াটা আমার দেখিতে হইবে। শুনিতেছি মুসলমানেরা জমি বেদখল করিয়া বসিয়াছে। সত্য কিনা জানি না। সত্য হইলে বলিব যে তাহা তাহাদের অন্যায় জবরদস্তি। লোকায়ত্ত কোন গভর্নমেণ্টেই এরূপ বে-দখলির প্রশ্রয় দিতে পারে না। দাঙ্গার দরুন পরিত্যক্ত জমির চাষ-আবাদ মুসলমানেরা করিয়া থাকে তো চাষ-আবাদের মজুরি তাহারা পাইতে পারে, তাহার বেশী কিছু নহে। বস্তুতঃ প্রতিবেশীর বিপদের সময় যদি তাহার প্রতিবেশীর জমি চাষ করিয়া থাকে, তবে তাহা প্রতিবেশীর প্রতি প্রতিবেশীর যাহা কর্তব্য তাহাই করিয়াছে। তাহার জন্য মজুরিও তাহারা চাহিতে পারে না। জমি দখল করিয়াছে এরূপ প্রমাণ থাকিলে, প্রতিকারের জন্য তাহা সরকারকে জানাইতে হইবে।

প্রশ্ন : শিল্পীদের শিল্পে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য সাহায্য দেওয়া হইতেছে। শুনা যাইতেছে যে, প্রায় আরও একমাস কাল তাহাদের রেশন

দেওয়া হইবে। কিন্তু চাষীদের কৃষি-ঋণের অতিরিক্ত কিছু দেওয়া হইবে না? তাহাও শতকরা ৬।০ টাকা সুদে। আগামী ফসল না উঠা পর্যন্ত রেশন দেওয়া না হইলে তাহাদের অনাহারে থাকিতে হইবে। চাষীদের অবস্থাই সর্বাপেক্ষা শোচনীয় মনে হইতেছে। তাহাদের জন্য কি ব্যবস্থা?

উত্তর: শিল্পে পুনঃ-প্রতিষ্ঠাকল্পে শিল্পীদের টাকা দেওয়া হইবে, আর হওয়াও উচিত তাহাই। জমির মালিক চাষী তেমন সাহায্য পাইবে না। আমার মনে হয় বিনা সুদে ও সহজে দেয় কিস্তিবন্দিতে তাহাদের টাকা দেওয়া উচিত। চাষীদের ঘরবাড়ী পোড়া গিয়া থাকিলে আলাদা করিয়া টাকা দিতে হইবে। রাজকর্মচারীদের সহিত কথাবার্তায় আমার ধারণা জন্মিয়াছিল যে চাষীদের বিনা সুদে বা নামমাত্র সুদে (যথা একশতে চারি আনা সুদে) টাকা ধার দেওয়া হইবে। একথাও আমি ভাবি নাই যে, হঠাৎ রেশন বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে এবং তাহাদের অনাহারে মরিতে হইবে। উড়োকথায় কান না দেওয়াই ভাল। আমি যে সংবাদ পাইয়াছি তাহা কিন্তু ইহার বিপরীত।

কাফিলাতলী

১২ই ফেব্রুয়ারি গান্ধীজী কাফিলাতলীতে পৌছেন। হামচাঁদী হইতে কাফিলাতলী যাইবার পথে গান্ধীজী রেড-ক্রশ সোসাইটির সেবাকেন্দ্র পরিদর্শন করেন। রেড-ক্রশ সোসাইটি নোয়াখালি ও ত্রিপুরায় ফ্রেণ্ডস সার্ভিস ইউনিট ও এমেরিকান মিউনোয়াইট সেণ্ট্রাল কমিটির সহযোগিতায় সেবাকার্যে আত্ম-নিয়োগ করিয়াছিল।

কাফিলাতলীতে প্রার্থনা-সভার কাজে একজন মুসলিম লীগ ন্যাশনাল গার্ডের কর্মীকেও যোগদান করিতে দেখা যায়। প্রার্থনা-সভায় বহুসংখ্যক মুসলমান ছেলেমেয়েদের আসিতে দেখা যায়। এত মুসলমান মেয়েদের আর কোনদিন প্রার্থনা-সভায় আসিতে দেখা যায় নাই। তাহাদের ৮ হইতে ১০ বৎসরের মধ্যে বয়স হইবে। অধিক সংখ্যায় মুসলমান ছেলেমেয়েদের সভায় যোগদান করা হইতে একটি বিষয় বোঝা যায় যে, তাহাদের অভিভাবকগণের বাধা ক্রমেই শিথিল হইয়া আসিতেছিল। গান্ধীজীর গ্রাম হইতে গ্রামান্তর ভ্রমণের প্রথম পর্যায় এমন কি দ্বিতীয় পর্যায়ের মাঝামাঝি সময় পর্যন্তও কোন মুসলমান মেয়েদের সভায় আসিতে দেখা যায় নাই। কোন কোনদিন ২।১ জনকে আসিতে দেখা যাইত। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, মুসলমান গ্রামবাসীরা ক্রমেই

উপলব্ধি করিতেছিলেন যে, গান্ধীজী তাহাদের কল্যাণসাধনের জন্যই আসিয়াছেন, তাহাদের কোন ক্ষতি তাঁহার দ্বারা কখনই হইতে পারে না। যতই তাহারা ইহা বুঝিতে পারিতেছিল ততই গান্ধীজীর সহিত মেলামেশা সম্পর্কে তাহাদের বাধা শিথিল হইয়া আসিতেছিল।

কাফিলাতলীতে স্থানীয় মুসলমান অধিবাসীদের অনুরোধক্রমেই বজরুল ইসলাম পাটোয়ারীর বাটীসংলগ্ন মাদ্রাসা-প্রাঙ্গণে গান্ধীজীর প্রার্থনা-সভা হয়। প্রার্থনা-সভাশেষে ফিরিবার সময় বসিরুল্লা কেরানী নামে স্থানীয় একজন মুসলমান অধিবাসী গান্ধীজীকে সেলাম করেন এবং বলেন,—আপনি শান্তি প্রতিষ্ঠা করিতে আসিয়াছেন, আমরাও শান্তি চাই। আমরাও শান্তি-প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করিতেছি। দুর্বৃত্তদের পাগলামির জন্য আমাদের হিন্দু-ভাইরা যেমন দুর্ভোগ ভুগিয়াছে, আমরা তাহা হইতে একেবারে বাদ পড়ি নাই। গান্ধীজী বলেন, সে তো ঠিকই ; শান্তি হইবে।

কাফিলাতলীতে প্রার্থনা-সভায় গান্ধীজী কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর দেন।

প্রশ্ন : নোয়াখালির স্থানে স্থানে যাহাতে এক চাপে অনেক হিন্দু বাস করিতে পারে তজ্জন্য কলকারখানা স্থাপনের কথা শুনা যাইতেছে। আপনি বিকেন্দ্র গৃহ-শিল্পের প্রসার চাহেন একথা সুবিদিত। কেন্দ্রীভূত শিল্প-প্রয়াসের ও তদবলম্বনে এক চাপে (যেমন শহরে) অনেক লোকের জমায়েত বসবাসেরও আপনি পক্ষপাতী নহেন। কিন্তু ইতিমধ্যেই তো ভারতবর্ষে অনেক কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। জমি রাষ্ট্রের তথা জনগণের হউক ইহাই আপনার কথা। কলকারখানা সম্বন্ধে আপনার বক্তব্য কি ? তাহাও কি রাষ্ট্রেরই সম্পত্তি হইবে, এবং রাষ্ট্রেরই নিয়ন্ত্রণে যোগ্য লোক দ্বারা গণহিতকল্পে পরিচালিত হইবে ?

উত্তর : স্থানে স্থানে কারখানা বসাইয়া নোয়াখালির হিন্দুরা অনেকে এক চাপে বাস করুক এরূপ প্রস্তাবের আমি পক্ষপাতী নহি। গৃহশিল্প সম্পর্কে আমার মতামত কি, এইস্থলে সেকথা বাদ দিন। হিন্দুরা আলাদা হইয়া বসবাস করিবে, নিজেদের কলকারখানায় আলাদা হইয়া কাজ করিবে ইহা আমি ভাবিতেও পারি না। তাহাতে বিষাক্ত পাকিস্তানেরই পত্তন করা হইবে। তাহা স্বাধীনতার পথ নহে।

এমন কি বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী লোকে আলাদা আলাদা স্থানে বসবাস করিবে এমন কথায়ও আমি সায় দিব না। আমার মনে স্বাধীন ভারতের যে চিত্র তাহাতে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী লোক ঘনিষ্ঠ বন্ধুভাবে পাশাপাশি লাগালাগি বাস

করিবে, উহাতে ধনী-দরিদ্রের কোন প্রশ্ন থাকিবে না। তাহাদের সকলেই হইবে রাজা, আবার প্রজাও। এই স্বপ্নকে সার্থক করিতে আমি হাসিমুখে মরিতে প্রস্তুত। ভারতবাসী গৃহযুদ্ধে ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইবে তাহা দেখিয়াও বাঁচিয়া থাকার সাধ আমার নাই।

কাফিলাতলীতে দুইজন মুসলমান কর্মীর সহিত কথাবার্তাকালে একটি প্রশ্নের উত্তরে তাঁহারা বলেন যে, এখনও তাহাদের শান্তি প্রতিষ্ঠা করিতে হয় একথা ঢাকিবার কিছুই নাই। কারণ যাহারা দুর্বৃত্ত তাহারা সর্বদাই দুষ্কর্ম করিবার জন্য সুযোগ খুঁজিবে ইহা স্বাভাবিক। তবে সাধারণ পল্লীবাসী মুসলমান, যাহাদের এক সময় ভুল বুঝাইয়া ক্ষেপাইয়া তোলা হইয়াছিল তাহারা তাহাদের ভ্রম বুঝিয়াছে এবং কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনাও করিতেছে, তাহারা সকলেই এখন শান্তিস্থাপনের জন্য উৎসুক।

গান্ধীজীর যাত্রাপথে বাধা সৃষ্টি করিবার অপপ্রয়াসের সম্পর্কে একটি প্রশ্নের উত্তরে তাঁহারা বলেন যে, ইহা দুর্বৃত্তদেরই কাজ। তাহাদের ইহাতেই আনন্দ।

গান্ধীজীর গ্রাম হইতে গ্রামান্তর ভ্রমণের সময় পথে সে পর্যন্ত বিভিন্ন সময় বিভিন্ন স্থানে ৫ বার বিষ্ঠা লেপন করিয়া রাখা হইয়াছিল। কয়েক স্থানে সাঁকো ভাঙ্গিয়া ফেলা হয় এবং দুই-এক স্থানে দুর্বৃত্তরা প্রবেশপথের কলাগাছ উৎপাটিত করিয়া রাখে এবং সাজান গেট ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া রাখে। অবশ্য গান্ধীজী পৌঁছিবার পূর্বেই কর্মিগণ সাঁকো প্রভৃতি চলিবার উপযুক্ত করিয়া মেরামত করিয়া রাখিয়াছিল।

পূর্ব কেরোয়া

১৩ই ও ১৪ই ফেব্রুয়ারি বৃহস্পতি ও শুক্রবার গান্ধীজী যথাক্রমে পূর্ব ও পশ্চিম কেরোয়াতে অবস্থান করেন। কেরোয়া একটি গণ্ডগ্রাম এবং পূর্ব ও পশ্চিম কেরোয়া এই দুই ভাগে বিভক্ত।

পূর্ব কেরোয়া ছোট গ্রাম। বিশেষ লোকজনের ভীড় হয় না। তবে সারাদিনই কিছু কিছু দর্শনার্থী আসিতে থাকে। দর্শনার্থীদের মধ্যে স্ত্রীলোকের সংখ্যাই বেশী দেখা যায়। যাহারাই গান্ধীজীর দর্শনের জন্য আসে তাহাদেরই দর্শনলাভের পর অপরাহ্নে প্রার্থনা-সভায় যাইতে অনুরোধ করা হয়। এই স্থানে মহারাষ্ট্রের মহিলা-কর্মী শ্রীমতী প্রেমাবেন কণ্টক গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাৎ

করেন। অপরাহ্ণে হামচাঁদী রেড-ক্রশ কেন্দ্রের কর্মী মিঃ আবদুল খালেক গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সেবা ও পুনঃ সংস্থাপন সম্পর্কে তাঁহার সহিত আলোচনা করেন।

গান্ধীজী যে বাটীতে ছিলেন সেখান হইতে পৌণে এক মাইল দূরে শ্রীগোবিন্দ পণ্ডিতের বহির্বাটী-প্রাঙ্গণে গান্ধীজীর প্রার্থনা-সভা হয়। খুব অল্পসংখ্যক মুসলমানই সেদিন সভায় উপস্থিত ছিল। প্রার্থনা-সভায় উপস্থিত লোকেরা রামধুনে ঠিকমত তালি দেয় বলিয়া গান্ধীজী সন্তোষ প্রকাশ করেন।

তেভাগা আন্দোলন সম্পর্কে একটি প্রশ্নের উত্তরে গান্ধীজী বলেন, আমি নীতির দিক হইতেই কেবল তেভাগা আন্দোলন সম্পর্কে বলিয়াছি। স্থানীয় অবস্থার দিক হইতে উহার বিচার করি নাই। প্রশ্নকর্তা যতটা আশঙ্কা করেন ততটা আশঙ্কার কারণ নাই। জমির মালিক সর্বস্বান্ত হইয়া যাইতেছেন তাহা নহে। তাঁহার জমি বাজেয়াপ্ত হইয়া যাইতেছে না। জমির মালিক দিল্লী-দিল্লী যেখানে থাকুন, তাঁহার ভাগ তো তিনি পাইবেনই, অর্ধেকের স্থানে তিন ভাগের একভাগ পাইবেন এইমাত্র।

সমবায় চাষ-আবাদ সম্পর্কে একটি প্রশ্নের উত্তরে গান্ধীজী বলেন, এ বিষয়ে কি কোন সংশয় আছে যে, সমবায় প্রথায় চাষ-আবাদ করা, সমবায় প্রথায় মাদুর বোনা অপেক্ষা অনেক বেশী দরকার। আমি বলি যে, রাষ্ট্রই জমির মালিক, অতএব একজোটে চাষ-আবাদ করিলে সর্বাপেক্ষা অধিক ফসল পাওয়া যাইবে; কিন্তু এ বিষয়ে জবরদস্তির কোন স্থান নাই, তাহা সম্পূর্ণরূপে স্বেচ্ছা-প্রণোদিত হওয়া চাই।

পশ্চিম কেরোয়া

১৪ই ফেব্রুয়ারি প্রাতঃকাল ৮টা ১০ মিনিটের সময় গান্ধীজী ৪০ মিনিটে অনুমান দুই মাইল পথ অতিক্রম করিয়া পূর্ব কেরোয়া হইতে পশ্চিম কেরোয়ায় পৌছেন। এই সময় পূর্ব কেরোয়া হইতে পশ্চিম কেরোয়া পর্যন্ত স্থানে স্থানে পথিপার্শ্বে জাতীয় পতাকাধারী স্বেচ্ছাসেবকগণ সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান ছিলেন এবং গান্ধীজীর অনুগামী দলের ভজনগানে সমগ্র যাত্রাপথ মুখরিত হইয়াছিল। গান্ধীজী এইখানে কবিরাজ বিপিনবিহারী দাসের বাসভবনে অবস্থান করেন।

পশ্চিম কেরোয়ার লোকসংখ্যা প্রায় এগার শত। মুসলমান অধিবাসীর সংখ্যা হিন্দুদের দ্বিগুণ। গান্ধীজীর বাসস্থানের নিকটেই খোলামাঠে প্রার্থনা-

সভা হয়। হিন্দুদের সংখ্যানুপাতে সভায় মুসলমানেরা খুব কমই উপস্থিত হন। আবদুল্লা সুরাবর্দি সংগৃহীত হজরতের বাণী হইতে গান্ধীজী পড়িয়া শুনান।

এইদিন স্থানীয় তিনজন মুসলমান বন্ধু গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাৎ করেন ও তাঁহাকে ঈশ্বরের কাছে এই বলিয়া প্রার্থনা করিতে বলেন যে, দুই সম্প্রদায় যেন শান্তিতে মৈত্রীর সহিত বসবাস করিতে পারে। গান্ধীজী তাঁহাদের সাক্ষাতে ঐ দুইটি বাণী প্রার্থনা-সভায় পড়িবেন বলিয়া পাঠ করিয়া লন। বাণী দুইটি এই, "তুমি যেন এ দুনিয়ায় বেড়াইতে আসিয়াছ—পথিক মাত্র; এইভাবেই চলিবে এবং মনে করিবে যে, তুমি যেন নাই (মরিয়া গিয়াছ)।" এই বাণী অপেক্ষা উত্তম আর কিছু হইতে পারে না। মৃত্যু তো আমাদের যে কোন মুহূর্তেই হইতে পারে। মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকিবার ইহা চমৎকার পথ। "নরোত্তমই বা কে? আর কেই বা নরাধম?"—ইহাই ছিল দ্বিতীয় আলোচ্য প্রশ্ন। হজরতের মতে যে ব্যক্তি দীর্ঘজীবী ও সৎ, তিনিই উত্তম আর যে লোক অপকর্ম করে সে অধম। কথা দিয়া কাহারও বিচার করিতে নাই, বিচার করিতে হয় কাজ দিয়া। হজরতের এই বাণী লক্ষ্য করিবার মত। হজরতের এই অনুশাসন সকলেরই জন্য, কেবলমাত্র মুসলমানদের জন্য নহে। এখানে যে সকল হিন্দু আছেন, তাঁহারা কি সদাচারী? অস্পৃশ্যতা কি সদাচার? আমি তাঁরস্বরে বলিয়া আসিতেছি যে, অস্পৃশ্যতা হিন্দুধর্মের কলঙ্ক, যতদিন এই পাপ দূর না হইবে, ততদিন ভারতের শান্তি নাই মুক্তি নাই। দুইদিন আগে পাছে ইংরাজকে ভারত ছাড়িতে হইবে। কিন্তু অস্পৃশ্যতা পুরাপুরি বর্জন না করা পর্যন্ত স্বাধীনতা লাভ হইবে না।

খুলনা হইতে একজন মৌলভী পশ্চিম কোরোয়াতে আসিয়া গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাৎ করেন। গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাতের ব্যবস্থার জন্য মৌলভী-সাহেব গান্ধীজীর সেক্রেটারী অধ্যাপক নির্মল বসুকে অনুরোধ করিয়া বলেন যে, শান্তিস্থাপনাই তাঁহাদের একমাত্র কাম্য এবং সে সম্পর্কেই তিনি গান্ধীজীর সহিত আলোচনা করিতে আসিয়াছেন। মৌলভীসাহেব অধ্যাপক বসুকে বলেন যে, শান্তিস্থাপনের উদ্দেশ্যে নিজগ্রামে তাঁহারা প্রায়ই রাত্রে সভা করিতেছেন এবং যাহাতে সর্বত্র স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়, সেজন্য চেষ্টা করিতেছেন। বিহারের হাঙ্গামার বিষয় উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন যে, নোয়াখালিতে যে অত্যাচার সংঘটিত হইয়াছে বিহারে তদপেক্ষা বেশী হইয়াছে। গান্ধীজীও একথা স্বীকার করিয়াছেন। তবুও কেন তিনি বিহারে যাইতেছেন

না ? অধ্যাপক বসু কথাপ্রসঙ্গে তাঁহাকে বলেন যে, গান্ধীজী বিহারে গিয়া যাহা করিতে পারিতেন এখানে বসিয়াই তাহা করিয়াছেন এবং এখনও করিতেছেন। তাঁহার অনশনের সঙ্কল্পমাত্রই কি বিহারে দাঙ্গা থামিয়া যায় নাই। এখনও তিনি বিহার সরকারের সহিত বরাবর সংযোগ রক্ষা করিয়া আসিতেছেন এবং দাঙ্গাসম্পর্কিত সমস্ত খুঁটিনাটি ব্যাপারে বিহার সরকার তাঁহার মতামত গ্রহণ করিয়া চলিতেছেন।

এই মৌলভীসাহেবকে মধ্যাহ্নে গান্ধী-শিবিরে আহারের নিমন্ত্রণ করা হইলে তিনি ফল ও দুগ্ধমাত্র গ্রহণ করেন। মৌলভীসাহেব বলেন যে, তাঁহাদের মধ্যে হিন্দুদের রান্না-করা জিনিস খাওয়া আচারবিরুদ্ধ। গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাৎকালে তিনি মৌলভীসাহেবকে এ সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলেন। তিনি বহুবর্ষ হইতে অস্পৃশ্যতার ছোঁয়াচ সম্পর্কে বলিয়া আসিয়াছেন। অস্পৃশ্যতা এত খারাপ যে, সান্নিধ্যবশতঃ উহা অপর সম্প্রদায়ের সমাজেরও ক্ষতি করে এবং খ্রীষ্টান ও মুসলমান সমাজও উহার প্রভাব হইতে মুক্ত থাকিতে পারে না। মুসলমানের হিন্দুর হাতে না-খাওয়া ইহারই দৃষ্টান্ত।

রায়পুরা

১৫ই ফেব্রুয়ারি শনিবার গান্ধীজী রায়পুরায় পৌছেন। রায়পুরায় গান্ধীজী দুইদিন অবস্থান করেন। তিনি যে বাড়ীতে ছিলেন সেই বাড়ীকে 'কাছারী-বাড়ী' বলা হয়।

শনিবার প্রাতে গান্ধীজী রায়পুরায় পৌছেন। রায়পুরায় কাছারীবাড়ীর আবেষ্টন মনোরম ছিল। একটু তফাতেই রায়পুরার বাজার। এটি একটি মুসলমানপ্রধান গ্রাম। লোকসংখ্যা প্রায় একুশ শত। তাহার মধ্যে সাড়ে পাঁচ শত হিন্দু। হাঙ্গামার সময় এখানে তিন জন মারা যায়; সকলকেই ধর্মান্তরিত করা হয় এবং ১৫৪টি ঘর পোড়া যায়।

রায়পুরায় একটি বড় মসজিদ আছে, সেখানে হাঙ্গামার সময় হরেনবাবু কয়েকদিন বন্ধ ছিলেন। সেই অবস্থায় তাঁহাদের সকলকে ইসলামধর্ম গ্রহণ করিতে হয়। ধর্মান্তরিত হওয়ার পর যে নাম তাঁহাকে দেওয়া হইয়াছিল, সেই নাম ও তাঁহার পূর্বনামের পরিচয় দিয়া ছাপান ইস্তাহার সে সময় বিলি করা হইয়াছিল। গান্ধীজীর আগমনে অসন্তোষ প্রকাশের জন্য মুসলমান দোকানদারদের হরতাল করার চেষ্টা চলে। বেশির ভাগ লোকেই হরতাল

পালন করে নাই এবং গান্ধীজী রায়পুরায় আসিয়া পৌঁছিলে স্থানীয় বহু মুসলমান তাঁহাকে দেখিবার জন্য কাছারীবাড়ীর বহিঃপ্রাঙ্গণে আসিয়া সমবেত হন।

অপরাহ্নে সভায় অনেক মুসলমান উপস্থিত ছিলেন। এইদিন রায়পুরায় দুইরকম পোস্টার আঁটা দেখিতে পাওয়া যায়। হিন্দুদের বিরুদ্ধে ও গান্ধীজীর বিরুদ্ধে মুসলমানদের ক্ষেপাইয়া তুলিবার উদ্দেশ্যেই এই ইস্তাহার বিলি করা হয়।

অতঃপর 'মুসলিম পিটুনি পার্টির' নামে মুদ্রিত যেসব ইস্তাহার ঘরের বেড়ায় লাগানো হইয়াছিল তাহার কথা উল্লেখ করিয়া গান্ধীজী বলেন :— "বয়কটের প্রশ্ন যে অমূলক নহে তাহা এই সকল হইতে বুঝা যায়। মুসলমান বন্ধুদের ও অপর সকলকে বলি যে ইহাতে তাঁহারা যেন ভীত বা বিচলিত না হন। বয়কটের কথা যদি নোয়াখালির সমগ্র মুসলমানসমাজের না হয় তবে তাহা তাঁহারা উপেক্ষা করিবেন। বয়কটের চেষ্টা যদি ব্যাপক হয় তবে গভর্নমেণ্টই হয়তো বয়কটের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ যদি বয়কট গভর্নমেণ্টের নীতি হয় তবে ব্যাপারটা ঘোরালো হইয়া উঠিবে। তখন কর্তব্য কি? আমি অহিংসার দিক হইতেই মাত্র একথার জবাব দিতে পারি। গভর্নমেণ্ট যদি সঙ্গত ক্ষতিপূরণ দিতে প্রস্তুত থাকেন তাহা হইলে লোককে আমি গভর্নমেণ্টের বয়কট নীতি অনুসারে কাজ করিতে বলিব। সে স্থলে ভাল-মন্দ, বর্তমান ভবিষ্যতের কথা উঠে না। কিন্তু গভর্নমেণ্ট যদি ক্ষতিপূরণ না করিয়া বাজেয়াপ্ত করিতে চাহেন, তবে আমি বলিব এক পাও নড়িবেন না, মরিতে হয়, ভিটা-বাড়ীতেই মরিবেন। কি মুসলমান-প্রধান, কি হিন্দু-প্রধান সকল প্রদেশ সম্পর্কেই এই কথা প্রযোজ্য। কিন্তু আমি মনে করি না যে, কোন স্থির-মস্তিষ্ক গভর্নমেণ্ট এইরূপ বয়কটের (ক্ষতিপূরণ দিয়া বা বিনা ক্ষতিপূরণে) নীতি অবলম্বন করিতে পারে। সংখ্যায় কম বলিয়াই কোন সম্প্রদায়ের লোককে তাহাদের যুগযুগান্তরের পৈতৃক ভিটা ছাড়িয়া দেশান্তরে যাইতে হইবে, তাহা হইতেই পারে না। না তাহা হিন্দুধর্মের, না তাহা অন্য কোন ধর্মের কথা। তাহা পরধর্ম-অসহিষ্ণুতার কথা।"

সান্ধ্যভ্রমণের সময় তাঁহাকে একটি আখড়ার সংলগ্ন রায়পুরা বাজার-প্রবেশের পথের উপর একটি ঘর দেখান হয়। এই ঘরের উপর একটি লীগ-পতাকা উঠান ছিল। এই ঘরখানি কংগ্রেস-অফিস ছিল। কিন্তু হাঙ্গামার

সময় উহাতে "পাকিস্তান ক্লাব" সাইনবোর্ড টাঙ্গাইয়া দেওয়া হয়। তখনও সেই অবস্থায় তালাবদ্ধ ছিল।

গান্ধীজী রায়পুরা আসিবার কয়েকদিন পূর্ব হইতে, তিনি রায়পুরা পৌছিলে অসন্তোষ প্রকাশের জন্য চেষ্টা চলিতেছিল। কিন্তু গান্ধীজীর গ্রামে আগমনের সঙ্গে সঙ্গে অবস্থা সম্পূর্ণ অন্যরকম দাঁড়ায়। তাঁহার সরল ও উদার ব্যক্তিত্বের সান্নিধ্য এই পরিবর্তনের কারণ বলিয়া স্পষ্ট উপলব্ধি করা যায়। পথে মুসলমান জনতা যেস্থানে যেমন দৃষ্টি লইয়াই তাঁহার প্রতি চাহিয়াছে, গান্ধীজী তখনই সেখানে থামিয়া তাহাদের প্রতি তাঁহার শুভেচ্ছা জানাইতে ও 'সেলাম' করিতে ভুলেন নাই। তাহারাও উত্তরে 'সেলাম' জানাইয়াছে। রায়পুরার নিকটবর্তী হইলে বহু মুসলমান বালক ও বৃদ্ধকে গান্ধীজীর পশ্চাৎ অনুসরণ করিতে দেখা যায়। গান্ধীজী যে কাছারীবাড়ীতে ছিলেন তাহার সম্মুখে ও পার্শ্ববর্তী পথে বহু মুসলমান বাসিন্দাকে অনেক বেলা পর্যন্ত দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখা যায়। গান্ধীজী ছাগদুগ্ধ পান করিবেন জানিয়া গ্রামের কয়েকজন বাসিন্দা বাটী হইতে তাহাদের ছাগল লইয়া আসে ও তখনি দুগ্ধ দোহন করিয়া গান্ধীজীর পানের জন্য দেয়। রায়পুরায় যে দুইদিন গান্ধীজী ছিলেন, স্থানীয় মুসলমানরাই তাহাদের ছাগল লইয়া নিয়মিতভাবে কাছারীবাড়ীতে আসে এবং স্বহস্তে দোহন করিয়া গান্ধীজীর ব্যবহারের জন্য দেয়। গান্ধীজী যে বাটীতে ছিলেন সন্ধ্যার সময় সেই বাটীতে আরও কয়েকটি বাতির প্রয়োজন হইবে এই মর্মে যখন দুইজন কর্মীর মধ্যে কথাবার্তা চলিতেছিল সেই সময় সেই স্থানে অপেক্ষমান কয়েকজন স্থানীয় মুসলমান তাহা শুনিতে পাইয়া বলেন যে, তাঁহারা বাতির ব্যবস্থা করিয়া দিতে পারেন। তাঁহাদের মধ্যে দুইজন তখনই বাতির সন্ধানে যাত্রা করেন এবং ঘণ্টাখানেক পরে একটি 'পেট্রোমাক্স' ও একটি 'ডে-লাইট' লইয়া ফিরিয়া আসেন। তাঁহারা বলেন যে, এই বাতি তাঁহাদের নিজের নহে, তাঁহারা দুইটি মুসলমানবাটী হইতে বাতি দুইটি 'হাওলাত' করিয়া আনিয়াছেন।

গান্ধীজীর রায়পুরায় অবস্থানকালে দুইদিনে আট দশজন স্থানীয় মুসলমান অধিবাসী গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাৎ করেন। তাঁহাদের মধ্যে উলেমা পার্টির মৌলভী বজলুল হক ও মৌলভী বাহারউদ্দীন অন্যতম। স্থানীয় অধিবাসী যাঁহারা গান্ধীজীর সহিত নানা বিষয় লইয়া আলাপ-আলোচনা করেন, তাঁহাদের মধ্যে মহম্মদ আলি চৌধুরী, মজলুর রহমন, আবদুল হায়াৎ ও কাজী মৌলভী আজিজুল রহমনও ছিলেন।

মৌলভী বজলুল হক ও মৌলভী বাহারউদ্দীন স্থানীয় জুম্মামসজিদ দেখিবার জন্য গান্ধীজীকে আমন্ত্রণ করেন। রবিবার অপরাহ্নে গান্ধীজী এই মসজিদ দেখেন। গান্ধীজী যখন মসজিদ দেখিতে যান সেই সময় অনেক মুসলমান অধিবাসীও তাঁহার সঙ্গে যান। মৌলভী বাহারউদ্দীন গান্ধীজীকে মসজিদের প্রবেশদ্বারে অভ্যর্থনা করেন এবং মসজিদের অভ্যন্তরস্থ উপাসনা-স্থান ও বাহিরে ঘুরিয়া দেখান। গান্ধীজী বিশেষ আগ্রহ সহকারে সমস্ত ঘুরিয়া দেখেন। উপাসনাস্থলে কতজন 'নামাজ' পড়িতে পারে, গান্ধীজী তাহা জানিতে চাহিলে তাঁহাকে বলা হয় যে, প্রায় সাত আটশত লোক একসঙ্গে 'নামাজ' পড়িতে পারেন। এই মসজিদে আরও কি কি দেখিবার মত আছে গান্ধীজী তাহা জানিতে চাহেন। মৌলভীসাহেব তখন তাঁহাকে মসজিদের তলদেশে একটি বিরাট গহ্বরের কথা বলেন। গান্ধীজী বিশেষ আগ্রহের সহিত উহা দেখিতে চাহেন। মৌলভীসাহেব আগে আগে এবং গান্ধীজী ও শ্রীমতী মানু গান্ধী তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে সিঁড়ি বাহিয়া সেই গহ্বরের মধ্যে প্রবেশ করেন এবং আলোকের সাহায্যে অভ্যন্তরস্থ দৃশ্যাবলী দেখেন।

মৌলভীসাহেবের নিকট গান্ধীজী বিশেষ আগ্রহের সহিত এই মসজিদের ইতিহাস শ্রবণ করেন।

মসজিদটি বহু পুরাতন। এতবড় মসজিদ এতদঞ্চলে বড় একটা দৃষ্টিপথে পড়ে না। ১৯২৪ সালে জমিয়াৎ-উল-উলেমা পার্টির প্রেসিডেণ্ট হোসেন আমেদ মাদানী বহুদিন এই মসজিদে বাস করিয়াছিলেন। গান্ধীজীর অনুরোধে মাদানী সাহেব মসজিদের মধ্যে যেখানে থাকিতেন সেই স্থানটি তাঁহাকে দেখানো হয়। এই মসজিদটি দিল্লীর জুম্মামসজিদের অনুকরণে নির্মাণ করা হয়।

রায়পুরায় কতক লোকের পক্ষ হইতে গান্ধীজীর আগমনে অসন্তোষ প্রকাশের চেষ্টা চলিলেও পল্লীবাসী মুসলমান সাধারণের আচরণে কিন্তু সে ভাব অনুভূত হয় না। যাহারা অসন্তোষ প্রকাশের চেষ্টা করিতেছিল তাহাদের সংখ্যা মুষ্টিমেয়। এই প্রকার লোকের সংখ্যা সর্বত্রই যে মুষ্টিমেয় তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। তাহারা জীবনে বেশ লব্ধপ্রতিষ্ঠ এবং দরিদ্র নির্বিশেষে তাহাদের উপর শোষণ ও শাসন চালাইবার লোভও তাহাদের মধ্যে অদম্য। একজন দরিদ্র মুসলমান চাষী রায়পুরায় গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাৎকালে বলে যে, একজন তাহাকে এই বলিয়া শাসাইয়াছে যে, গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাৎ করিলে তাহার আজ রক্ষা থাকিবে না। কিন্তু তবুও সে সাহসে ভর করিয়া তাঁহার

নিকট আসিয়াছে। গান্ধীজী তাহাকে বলেন যে, কোন কাজ করিবার সময় যদি তাহার বিবেক বলে যে সেটি ভাল কাজ, তাহা হইলে সমস্ত বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও সে কাজ তাহার করা কর্তব্য নয় কি ?

গান্ধীজী প্রার্থনা-সভায় তাঁহার বক্তৃতায় স্বার্থান্বেষীদের সম্পর্কে মুসলমান সাধারণের কিভাবে চলা বাঞ্ছনীয় তাহার উল্লেখ করিতে গিয়া বলেন, "মুসলমান বন্ধুদের ও অপর সকলকে বলি যে, ইহাতে তাঁহারা যেন ভীত বা বিচলিত না হন। বয়কটের চেষ্টা যদি নোয়াখালির সমগ্র মুসলমানসমাজের না হয়, তবে তাহা তাঁহারা উপেক্ষা করিয়া চলিবেন।"

রায়পুরায় মহাত্মা গান্ধী একটি হিন্দুমন্দির পরিদর্শন করেন। সেখানে তখন উৎসব চলিতেছিল এবং প্রায় ২০০০ লোকের একত্র আহারের ব্যবস্থা হইয়াছিল। মহাত্মা গান্ধী আগ্রহসহকারে রন্ধনশালায় ১৫ মিনিট দাঁড়াইয়া সমস্ত দেখেন। তিনি জিজ্ঞাসা করেন, কাহারা আহারের ব্যবস্থা করিতেছেন। মুসলমান এবং খ্রীষ্টানদের আহার করিতে দেওয়া হইবে কি না? মুসলমান এবং খ্রীষ্টানগণ অভ্যর্থিত হইবে জানিয়া মহাত্মাজী আনন্দিত হন।

ইহার পর মহাত্মাজী একটি পুরাতন মসজিদে পদার্পণ করেন। মৌলভী বাহারউদ্দীন তাঁহাকে মসজিদ দেখান।

রায়পুরার পরবর্তী গান্ধীজীর গ্রাম হইতে গ্রামান্তর পরিক্রমণের পাঁচদিনের সাধারণ অবস্থা আপাতদৃষ্টিতে কিছুটা প্রতিকূল মনে হইলেও উহাকে মুসলমান পল্লীসাধারণের অন্তরের স্বতঃস্ফূর্ত অভিব্যক্তি মনে করিলে যে ভ্রমাত্মক হইবে তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। স্থানীয় হিন্দু ও মুসলমান বাসিন্দাদের সহিত কথাবার্তাকালে তাহারা বলে যে, ফজলুল হক সাহেবের অগ্রগামীদলের গান্ধী-বিরোধী প্রচারকার্যে ও মুসলিম পিটুনী পার্টির তরফ হইতে পোস্টার ও ইস্তাহার মারফত গান্ধীজীর দলের সহিত সহযোগিতা করিলে তাহাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে বলিয়া শাসাইবার ফলে মুসলমান অধিবাসীরা ইচ্ছা থাকিলেও ভয়ে অধিক সংখ্যায় গান্ধীজীর নিকট ভিড়িতেছিলেন না। এই প্রকার প্রচারকের সংখ্যা অত্যন্ত নগণ্য হইলেও তাহাদের অর্থবল আছে, শিক্ষিত ও আধুনিক আদব-কায়দা-দুরস্ত বলিয়া দরিদ্র ও অজ্ঞ পল্লীবাসীদের উপর প্রভাব ও প্রতিপত্তি আছে। বিশকাটালী হইতে কমলাপুর যাওয়ার পথে গান্ধীজীর সহগামী সাংবাদিকদের মালপত্র বহন করিবার জন্য আলি হোসেন নামে একজনকে শাসান হয়। সে বলে যে, সে একজন দরিদ্র

জমিহীন দিনমজুর। তাহাকে এই বলিয়া শাসানো হইয়াছে যে, যদি সে পুনরায় গান্ধীজীর দলের লোকের মাল বহন করে তাহা হইলে তাহার আর রক্ষা থাকিবে না। পরদিনও সে সাংবাদিকদের মালপত্র বহন করে। সে বলে যে, সেদিনও তাহাকে শাসানো হইয়াছে। ইহার সমসাময়িক পরিস্থিতির কথা উল্লেখ করিয়া ১৯শে ফেব্রুয়ারির 'শান্তিমিশন' দিনলিপিতে বলা হইয়াছে, "বিভিন্ন কেন্দ্র হইতে যে সকল খবর আসিতেছে তাহা হইতে একটা বিষয় স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে যে, স্থানীয় অবস্থা খারাপের দিকে যাইতেছে।...অনুমান গভর্নমেণ্ট এ বিষয়ে সম্পূর্ণ অবহিত আছেন। গভর্নমেণ্টের তরফ হইতে সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি ভাল করিবার জন্য কি চেষ্টা করা হইতেছে জানি না। কিন্তু অপপ্রচার যে বন্ধ হইতেছে না এবং ধমকানি, শাসানি ও কার্য বন্ধ করার জলুম ইত্যাদি যে চলিতেছে তাহা জানিতেছি। ফজলুল হক সাহেব যাহা বলিতেছেন বলিয়া সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইতেছে, তাহা আর যাহাই হউক শান্তিস্থাপনের অনুকূল নহে।"

ধমকানি ও শাসাইবার ফলেই যে প্রার্থনা-সভাগুলিতেও মুসলমানগণ অল্পসংখ্যায় আসিতেছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। গান্ধীজীকে দেখিবার ও তাঁহার মুখনিঃসৃত কথা শুনিবার আগ্রহ যে তাহাদের আছে অনেক বিষয় হইতেই তাহা উপলব্ধি করা যায়।

অনেক সময় দেখা গিয়াছে প্রার্থনা-সভার প্রাঙ্গণের গণ্ডীর মধ্যে প্রবেশ না করিলেও সভা-প্রাঙ্গণের আশেপাশে ও প্রবেশপথে রাস্তায় দাঁড়াইয়া অনেক পল্লীবাসী মুসলমান প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত আগ্রহের সহিত অপেক্ষা করিয়াছে। ডাকিলে ভিতরে আসিয়া আসন গ্রহণ করিয়াছে এবং বাহিরে অপেক্ষমান তাহাদের সঙ্গীসাথীদের হাতছানি দিয়া ভিতরে আসিতে ইঙ্গিত করিয়াছে। তাহাদের ভাবভঙ্গী দেখিলেই বুঝা যাইত তাহাদের অন্তরে ইচ্ছা আছে, কিন্তু কিসের বাধা যেন তাহাদের পিছন হইতে টানিতেছে। সে পুনঃ পুনঃ পিছন ফিরিয়া চায়—তাহার মনের ভাব পশ্চাতে তাহার 'সাথীরা যাহারা আছে তাহারা যদি আসে তাহা হইলে তাহারই বা আপত্তির কারণ কি থাকিতে পারে।'

দেবীপুর

রায়পুরায় দুইদিন অবস্থানের পর ১৭ই ফেব্রুয়ারি মহাত্মা গান্ধী দেবীপুরে উপনীত হন। নোয়াখালির এই গ্রামটি ত্রিপুরা জেলার সীমান্তে অবস্থিত।

যথারীতি ৭টায় মহাত্মাজী রায়পুরা ত্যাগ করেন। মহাত্মাজী ১ ঘণ্টা ২৫ মিনিটে ৩ মাইল পথ অতিক্রম করেন।

মহাত্মাজীর 'শাখারিবাড়ী' নামক একটি গৃহে অবস্থানের কথা ছিল। কিন্তু এই গ্রামে কয়েকজন উৎকট উদরাময়ে আক্রান্ত হওয়ায় অন্য একটি গৃহে তাঁহার থাকার ব্যবস্থা হয়। তিনি এখানে শ্রীযুক্ত রাজকুমার শীলের গৃহে অবস্থান করেন। উৎকল প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভানেত্রী শ্রীযুক্তা মালতী চৌধুরী যে গৃহে ছিলেন সেই গৃহের দুইজন বিসূচিকায় আক্রান্ত হইয়াছিলেন। গান্ধীজী যে গৃহে অবস্থান করিতেছিলেন ঐ গৃহেও দুইজন বিসূচিকার রোগী ছিলেন। তাঁহারা গত রাত্রে ঐ রোগে আক্রান্ত হন।

মহাত্মা গান্ধীর সহিত ভ্রমণরত সাংবাদিকগণকেও একটি বাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া আসিতে হয়; ঐ বাড়ীতেও কলেরা আরম্ভ হইয়াছিল।

এই অঞ্চলে পুষ্করিণীসমূহ শুকাইয়া যাইতেছিল। মহাত্মাজী যে গৃহে অবস্থান করেন তাহার দক্ষিণ পার্শ্ব দিয়া ডাকাতিয়া নদী ক্ষীণ স্রোতধারায় প্রবাহিত।

প্রহরার জন্য ইন্সপেক্টর শ্রীযুক্ত বটকৃষ্ণ সরকারের অধীনে একদল সশস্ত্র রক্ষিসহ নোয়াখালির যে ১৭ জন পুলিস মহাত্মাজীর অনুগমন করিতেছিলেন, তাঁহারা ত্রিপুরা জেলার একদল পুলিসের নিকট উক্ত কার্যের ভার অর্পণ করেন। এই গ্রামটি নোয়াখালি জেলার গান্ধীজীর দ্বিতীয় পল্লী-পরিক্রমার শেষ গ্রাম।

পতাকাহস্তে কয়েক দল স্বেচ্ছাসেবক সমগ্র যাত্রাপথে গান্ধীজীকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন। একদল কীর্তনীয়া সায়েস্তানগর হইতে গন্তব্যস্থল পর্যন্ত গান্ধীজীর অনুগমন করেন। পথিপার্শ্বে অপেক্ষমান রমণীগণ স্থানে স্থানে উলুধ্বনি করেন।

শ্রীযুক্ত নিবারণ দাসের গৃহে গান্ধীজীকে অভ্যর্থনা করা হয় এবং তিনি দাঙ্গায় নিহত এক ব্যক্তির স্মৃতির উদ্দেশ্যে নির্মিত একটি তোরণ অতিক্রম করিয়া যান। শ্রীযুক্তা চারুশীলা দেবী একটি বৃহৎ ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকাহস্তে তোরণের সম্মুখে গান্ধীজীকে অভিবাদন করেন।

দেবীপুরে শতকরা ৮০ জন মুসলমানের বাস। সান্ধ্যকালীন সভায় অনেক হিন্দু-মুসলমান যোগদান করিয়াছিলেন। অন্যান্যের সঙ্গে শ্রীযুত সতীশ দাসগুপ্ত, শ্রীযুক্তা মালতী চৌধুরী এবং মৌলানা বজলুল হক সভায় উপস্থিত ছিলেন। গান্ধীজী বলেন যে, তিনি একখানি চিঠি পাইয়াছেন। পত্রপ্রেরক একজন দায়িত্বশীল ব্যক্তি এবং উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি ফিরাইয়া আনিবার জন্য

তিনি কাজ করিতেছেন। কয়েকজন মুসলমান কর্তৃক একটি হিন্দু বালক উৎপীড়িত হইয়াছে বলিয়া পত্রপ্রেরক সংবাদ দিয়াছেন। গান্ধীজী নোয়াখালি ত্যাগ করিয়া গেলে অক্টোবর মাসের নির্যাতন হইতেও হিন্দুদের অধিকতর উৎপীড়ন করা হইবে বলিয়া মুসলমানগণ শাসাইতেছে।

সংবাদটি অসত্য হইলেই মঙ্গল। কিন্তু ভয় হইতেছে, উহা অসত্য নয়। ঐ মনোভাব কয়েকজন অশিষ্ট ব্যক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ বলিয়া তিনি আশা করেন। যে কয়জনের ভিতরেই সীমাবদ্ধ থাকুক না কেন, তিনি বলিতে বাধ্য যে, উক্ত মনোভাব ইসলামধর্মের বিরোধী। ইসলামধর্মের ব্যাপারে তিনি নিজেকে বাহিরের লোক মনে করেন না। অন্যান্য ধর্মমতের মতন ইসলামধর্মকেও তিনি নিজের ধর্ম বলিয়াই শ্রদ্ধা করেন এবং এইজন্যই তিনি সহানুভূতি এবং বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাব লইয়া উহার সমালোচনা করেন। অবশ্য অনিষ্টকর প্রচারের বিরুদ্ধে প্রত্যেক সৎ মুসলমানই দৃঢ় মনোভাব দেখাইতে পারেন।

বক্তৃতার প্রথম অংশে গান্ধীজী একটি জিনিসের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। একটি অভিযোগের তদন্ত করিয়া দেখা গিয়াছে উহা ভিত্তিহীন। কতকগুলি সম্পত্তি-লুণ্ঠনের অভিযোগ করা হইয়াছিল, তদন্তের সময়ে সমস্ত জিনিস ঐ স্থানেই পাওয়া গিয়াছে। উহা খুবই গুরুতর বিষয় এবং দ্বিতীয়বার তিনি এইরূপ ঘটনার সংবাদ পাইলেন। কয়েকজন মুসলমান তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া স্বীকার করিয়াছে যে, অক্টোবর মাসে নোয়াখালির মুসলমানগণ উন্মত্ত হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু তাহারা বিহারের হিন্দুদের মত খারাপ না হওয়া সত্ত্বেও তাহাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ আনয়ন করিয়া তাহাদের অসুবিধার সৃষ্টি করা হইতেছে। ঐ ভাবে উভয় সম্প্রদায়ের মিলন-সাধন সম্ভবপর নয়। গান্ধীজী বলেন যে, মিথ্যা অভিযোগ আনয়নকারীদের শাস্তি দেওয়া উচিত। তিনি পুলিসের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বা মন্ত্রী নিযুক্ত থাকিলে উহাদের বিরুদ্ধে মামলা আনয়ন করিতেন। উহাদের নাম এবং ঠিকানা দিলে তিনি কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারিতেন। এ পর্যন্ত তিনি কোন নাম পান নাই। তিনি এইমাত্র বলিতে পারেন যে, যে সমস্ত হিন্দু মিথ্যা অভিযোগ আনয়ন করিয়াছে, তাহারা তাহাদের নিজেদের সহধর্মীদের এবং সমস্ত দেশের ক্ষতি করিয়াছে।

এইদিন রাত্রে মৌলানা শাহ খলিলুর রহমন নামে একজন স্থানীয় প্রভাবশালী বৃদ্ধ মুসলমান ফকির ও আরও কতিপয় মুসলমান অধিবাসী গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং বহুক্ষণ ধরিয়া গান্ধীজীর সহিত তাহাদের আলোচনা হয়।

বৃদ্ধ ফকির গান্ধীজীকে বলেন, দোষীদের যে সাজা হওয়া একান্ত উচিত সে বিষয়ে তিনি একমত, তবে নির্দোষীরা যাহাতে ফাঁসিয়া না যায় সে বিষয়েও সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত। তিনি আরও বলেন যে, তিনি শুনিয়াছেন হিন্দুরা অনেক মিথ্যা এজাহার দিয়াছে। উত্তরে গান্ধীজী বলেন, যাহারা মিথ্যা এজাহার দিয়াছে তাহাদের কঠোর সাজা হওয়া উচিত। মিথ্যা এজাহার বা মিথ্যা সাক্ষ্য যাহারা দিয়াছে, তাহাদের নামধাম পাইলে তিনি ব্যবস্থা করিতে পারেন। কিন্তু এ পর্যন্ত কেহ মিথ্যা এজাহারকারী বা মিথ্যা সাক্ষীর নাম-ঠিকানা দেন নাই। যে একটি অভিযোগ তাহার নিকট আসে তাহা প্রমাণ করিতে বলিলে অভিযোক্তা প্রমাণ করিতে পারেন নাই। পরিশেষে এসম্বন্ধে গান্ধীজী তাঁহাকে বলেন যে, হিন্দুরা মিথ্যা এজাহার দিলে তাহারা নিজেরাই তাহাদের স্বার্থের, ধর্মের ও দেশের ক্ষতি করিবে।

আলুনিয়া

১৮ই ফেব্রুয়ারি গান্ধীজী সকাল ৭ ঘটিকায় দেবীপুর হইতে রওনা হইয়া ৯০ মিনিটে আড়াই মাইল পথ অতিক্রম করিয়া ত্রিপুরা জেলার প্রথম গ্রাম আলুনিয়ায় উপস্থিত হন। দেবীপুর হইতে আলুনিয়া পর্যন্ত পথ প্রায় সমস্তটাই সুপারিবাগানের মধ্য দিয়া ছিল। দুইটি গ্রামের মধ্যে সাধারণতঃ যে মাঠের ব্যবধান থাকে তাহা ছিল না। সমস্ত পথটাই প্রায় হয় সুপারিবাগানের মধ্য দিয়া আর না হয় পাশ দিয়া ছিল। এখানে মাটিতে বালুর অংশ দেখা যায়, নোয়াখালিতে সম্পূর্ণ কাদামাটি। যে বাটীতে গান্ধীজী ছিলেন তাহার অনতিদূরেই ডাকাতিয়া নদী। নদী এই স্থান দিয়া অবশ্য মরিয়া গিয়াছে। নদীতে স্রোত চলে না। বনের প্রান্তে নদীতীরে বাড়ী এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের আবেষ্টন বড় মনোরম ছিল। বাড়ীতে যেমন লোকজনের সমাগম হইয়াছিল তাহাদের আন্তরিকতা ও আগ্রহও ততোধিক ছিল।

গান্ধীজী ত্রিপুরায় সেই প্রথম প্রবেশ করিতেছেন বলিয়া ঐ জেলার সেবা-প্রতিষ্ঠানের কর্মিগণ তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার বিশেষ আয়োজন করিয়াছিলেন।

আলুনিয়া পৌছিয়া মহাত্মা গান্ধী ত্রিপুরা জেলা পুনর্বসতি কমিটির সেক্রেটারীর নিকট হইতে দাঙ্গায় বিধ্বস্ত ঐ অঞ্চলের লোকদের অবস্থা সম্পর্কে এক রিপোর্ট পান। ঐ রিপোর্টে বলা হয় যে, গৃহনির্মাণের জন্য সরকারী সাহায্য মোটেই পর্যাপ্ত নয়। চাষের জিনিসপত্রের অভাবের দরুন এই অঞ্চলে

মরিচ ফলন হইতেছে না। সরকার গবাদি পশু কিনিবার জন্য মাত্র ১৫০৲ টাকা বরাদ্দ করিয়াছেন ; অথচ একজোড়া বলদের দাম কমপক্ষে ৫০০৲ টাকা। এই সকল অসুবিধার মধ্যে আবার এক সম্প্রদায়ের লোক অপর সম্প্রদায়ের চাষবাসের কাজে মোটেই সহযোগিতা করিতেছে না। রিপোর্টে বলা হইয়াছে, ইহা প্ররোচনারই ফল।

ত্রিপুরা অঞ্চলে কয়েক হাজার বাড়ী পুড়িয়া গিয়াছে। প্রত্যেক বাড়ীতে গড়ে ৪।৫ খানা ঘর থাকিলে মোট পোড়া ঘরের সংখ্যা বিশ পঁচিশ হাজার হইতে পারে। ছোট ছোট ঘরের মাপ ধরিলে, যেমন ঘর গভর্নমেণ্ট দিতে কল্পনা করিয়াছেন, সেগুলির মত ঘরের দ্বারাই পূর্বের সমস্ত প্রয়োজন মিটাইবার মত পুনর্বসতি করিতে হইলে, অর্ধলক্ষ গৃহ দরকার হইতে পারে বলিয়া অনুমান করা হয়।

গভর্নমেণ্ট যে ১৮ ফুট × ১০ ফুট ঘরের ইউনিট ধরিয়াছেন তাহাতে চালে ও বেড়ায় ৫০ খানা করগেটেড টিন লাগে বলিয়া হিসাব করিয়াছেন। তাহা হইলে ১০০ খানা টিনে ২ খানা ঘর ও ১০০০ খানা টিনে ২০ খানা ঘর হইবে।

'ইত্তেহাদ' পত্রে কলিকাতা ১০ই ফেব্রুয়ারির সংবাদে নোয়াখালির ও ত্রিপুরার দাঙ্গাপীড়িতদের সম্পর্কে "বাংলা সরকারের মহান উদারতা" শীর্ষক সংবাদে বলা হয়, "চট্টগ্রাম বিভাগের রিহাবিলিটেশন কমিশনার মিঃ টি. আই. এম. নুরন্নবী চৌধুরী, আই. সি. এস. বলেন, সরকার কর্তৃক পূর্বাহ্নেই প্রচুর পরিমাণে গৃহনির্মাণের সরঞ্জামাদি ক্রয় করা হইয়াছে এবং নোয়াখালি ও ত্রিপুরা জেলায় অক্টোবর মাসের দাঙ্গা-পীড়িত ব্যক্তিদের নিকট উহা সস্তাদামে বিক্রয় হইয়াছে।"

মিঃ চৌধুরী বলেন যে, দাঙ্গা-পীড়িত এলাকার বিভিন্ন কেন্দ্রে ৫৮ হাজার খানা করোগেটেড টিন ও ৩০ হাজার খুঁটি বিক্রয় করা হইয়াছে।

৫৮ হাজার করোগেটেড টিন দ্বারা হাজার বারশত স্ট্যাণ্ডার্ড ঘর হইবে। ইহাই বিক্রয়ের জন্য উপস্থিত করা হইয়াছে ; এবং ইহাই গভর্নমেণ্টের মহান উদারতার পরিচায়ক বলিয়া প্রচার করা হইয়াছে। ইহার দশগুণ দিলেও দগ্ধ গৃহগুলি পুনর্নির্মিত হইবে না। দান করার কথা হইতেছে না। মূল্য দিয়া ক্রয় করার জন্যও তো লোককে মালমসলা যোগাইতে হইবে। গভর্নমেণ্ট তো এক পরিবারের জন্য দুই কামরা একখানি গৃহের বরাদ্দ করিয়াছেন এবং তাহারই আবশ্যকীয় সরঞ্জামের সামান্য মাত্র অংশ যোগাইয়াই তৃপ্তি অনুভব করিয়াছেন। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় ইহা অকিঞ্চিৎকর বলিয়া দেখা যায়।

গান্ধীজীর বাসস্থানের নিকটেই উন্মুক্ত মাঠে প্রার্থনা-সভা হয়। সভাস্থল বেশ পরিপাটি করিয়া সাজান হইয়াছিল। পুরুষ, স্ত্রীলোক ও বালকদের বসিবার জন্য পৃথক পৃথক স্থান নির্দিষ্ট ছিল। এইদিন শ্রীমতী সুচেতা দেবী সভায় উপস্থিত ছিলেন।

গান্ধীজী প্রার্থনা-সভায় বলেন যে, যথাযোগ্য ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইলে পর সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকদের উপদ্রুত অঞ্চল পরিত্যাগ করিয়া আসা তিনি সমর্থন করিবেন। সংখ্যাগরিষ্ঠরা যদি কোনক্রমেই সংখ্যালঘুদের বরদাস্ত না করে, তবে সে ক্ষেত্রে গভর্নমেণ্টের কিছু করার নাই। যথাযোগ্য ক্ষতিপূরণের বিনিময়ে তাহাদের স্থানত্যাগ করিয়া আসাই বাঞ্ছনীয়।

গান্ধীজীকে এক ব্যক্তি প্রশ্ন করেন যে, লীগ গভর্নমেণ্ট অথবা সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় যদি যথাযোগ্য ক্ষতিপূরণ দেয়, তবে হিন্দুদের উপদ্রুত অঞ্চল হইতে সরিয়া আসা তিনি সমর্থন করিবেন কিনা। গান্ধীজী ইহার জবাবে বলেন, তিনি অহিংসার দিক হইতে ইহা সমর্থন করেন। সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় হিন্দুই হোক আর মুসলমানই হোক, ইহা সমস্ত প্রদেশের পক্ষেই প্রযোজ্য। সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় যদি সংখ্যাল্প সম্প্রদায়ের উপস্থিতি কোনরকমেই বরদাস্ত করিতে না পারে, তবে গভর্নমেণ্টের কি করার আছে? গান্ধীজী মনে করেন, গভর্নমেণ্টের পক্ষে সংখ্যাধিক সম্প্রদায়কে দাবাইয়া রাখা বা সর্বদা অস্ত্রের সাহায্যে সংখ্যাল্প সম্প্রদায়কে রক্ষা করা সঙ্গত হইবে না। ধরুন, সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় যদি রামধুন অথবা হাততালি সহ্য না করে এবং রাম যে কোন মানুষ এবং রাম ঈশ্বরেরই অপর নাম, তাহা যদি তাহারা বিশ্বাস না করে, এমন কি তাহারা যদি ইহা বরদাস্ত করিতেও রাজী না হয়, তবে গান্ধীজী বিনা দ্বিধায় এই অভিমত প্রকাশ করিবেন যে, যোগাযোগ্য ক্ষতিপূরণ পাইলে পর সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্থান ত্যাগ করিয়া যাওয়াই বাঞ্ছনীয়।

প্রার্থনা-সভার পর গান্ধীজী ডাকাতিয়া নদী পার হইয়া প্রায় মাইলখানেক বেড়াইয়া আসেন।

বিরামপুর

১৯শে ফেব্রুয়ারি গান্ধীজী আলুনিয়া হইতে যাত্রা করিয়া বিরামপুরে পৌছেন। তাঁহার যাত্রাপথে একটি সরকারী ওয়ার্ক হাউস ছিল। ওয়ার্ক হাউসে গভর্নমেণ্ট তাঁতশিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করিয়াছেন। আলুনিয়া হইতে

বিরামপুরের পথও, দেবীপুর হইতে আলুনিয়ার পথের ন্যায়, সুপারিবাগানের মধ্য দিয়াই ছিল। নোয়াখালির ন্যায় ত্রিপুরা জেলায় অত নারিকেল গাছ দেখা যায় না। এখানে নারিকেল গাছ খুব কম। ত্রিপুরা জেলায় সুপারিবাগানই বেশী দেখা যায়।

বিরামপুরের পথে চরদুখিয়া ইউনিয়নের প্রেসিডেণ্ট আনোয়ারউল্লা পাটোয়ারী গান্ধীজীর সহিত দেখা করিয়া বলেন যে, নিকটেই একটি ঝোপের আড়ালে তাঁহার বাটীর মেয়েরা এবং গ্রামের আরও কয়েকজন স্ত্রীলোক তাঁহার দর্শনলাভের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। তিনি যদি একটু আগাইয়া গিয়া তাঁহাদের দর্শন দেন তাহা হইলে তাঁহারা কৃতার্থ হইবেন। তাঁহারা অনেকখানি পথ হাঁটিয়া আসিয়া তাঁহার দর্শনলাভের জন্য ঐস্থানে দাঁড়াইয়া আছেন। গান্ধীজী মৃদু হাস্য করিতে করিতে পাটোয়ারী সাহেবের অনুসরণ করেন এবং মেয়েরা যেখানে অপেক্ষা করিতেছিলেন সেখানে গিয়া তাঁহাদের দর্শন দেন এবং কিছুক্ষণ তাঁহাদের সহিত আলাপ করেন। গান্ধীজীকে দেখিবার ও তাঁহার কথা শুনিবার জন্য তাঁহাদের মধ্যে বিশেষ একটা আগ্রহ দেখা যায়।

বিরামপুরে গান্ধীজী নলিনীচন্দ্র দাস নামে একজন মৎস্যজীবীর বাটীতে অবস্থান করেন। পল্লী-পরিক্রমার পথে গান্ধীজী এই প্রথম একজন জেলের বাটীতে থাকিলেন। এই গ্রামে বহু জেলের বাস। এককালে মেঘনানদী এই গ্রামের পার্শ্ব দিয়া প্রবাহিত ছিল। সেইজন্য এই স্থান জেলেদের বাসের বিশেষ উপযোগী ছিল। পরে চর পড়িয়া নদী ক্রমশঃ দূরে সরিয়া যাইতে যাইতে গ্রাম হইতে প্রায় ৬ মাইল দূরে চলিয়া গিয়াছে। দরিদ্র জেলেরা আর ঘরবাড়ী ছাড়িয়া কোথায় যাইবে—তাহারা রহিয়াই গিয়াছে।

দাঙ্গার সময় তাহাদের গ্রামের সকলের মাছ ধরিবার জাল লুণ্ঠিত হইয়াছে। ফলে তাহারা একেবারে অসহায় হইয়া পড়িয়াছে। জাল তৈয়ারি করিতে অনেক সূতার দরকার। গ্রামের লোকদের নিকট শুনিলাম সূতাও দুষ্প্রাপ্য। বহু আবেদননিবেদনেও গভর্নমেণ্ট তাহাদের জালের জন্য সূতা সরবরাহের কোন ব্যবস্থাই করেন নাই। দাঙ্গায় একটা বৃহৎ এবং বর্ধিষ্ণু সম্প্রদায় এইভাবে একেবারে জীবিকাহীন হইয়া পড়িয়াছে।

শ্রীআর্যনায়কম, আসামের নারীকর্মী শ্রীমতী অমলপ্রভা দাস ও ডাঃ অমিয় চক্রবর্তী বিরামপুরে আসিয়া গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাৎ করেন।

রাত্রে গান্ধীজীর কুটীরে গাম্ভীর্যপূর্ণ পরিবেশের মধ্যে কস্তুরবার তৃতীয়

মৃত্যুবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হয়। তাঁহার স্মরণে একঘণ্টাকাল প্রার্থনা অনুষ্ঠিত হয়। গান্ধীজীর দলের সকলে এবং সাংবাদিকগণও এই অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। শ্রীমতী মানু গান্ধী মধুর স্বরে সমগ্র গীতা আবৃত্তি করেন। কস্তুরবা ও গান্ধীজীর একটি প্রতিকৃতি মাল্য ও পুষ্পভূষিত করিয়া ধূপধূনা জ্বালান হয়। গীতাপাঠের পর গান্ধীজীকে বলিতে শুনা যায়, "তিন বৎসর হইল কস্তুরবা আমাদের মায়া ত্যাগ করিয়াছেন।"

গান্ধীজীর বাসস্থানের নিকটেই সান্ধ্য-প্রার্থনার জন্য স্থান নির্দিষ্ট হইয়াছিল। উন্মুক্ত স্থানে প্রার্থনা-সভা হয়।

গান্ধীজী তাঁহার প্রার্থনান্তিক বক্তৃতায় তিনটি প্রশ্নের উত্তর দেন। প্রথম প্রশ্নে বলা হয় যে, নোয়াখালিতে স্বার্থসংশ্লিষ্ট পক্ষ ইচ্ছা করিয়া যদি কোন হিন্দু কর্মী সম্পর্কে ভুল বুঝাইতে থাকে, তবে এই হিন্দু কর্মীর কর্তব্য কি? দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রশ্ন স্থান ত্যাগ করা সম্পর্কে করা হয়।

গান্ধীজী বলেন যে, মুসলমানগরিষ্ঠ প্রদেশে হিন্দুর অবস্থান মাত্রেই যদি মুসলমানদের রাগের কারণ হয়, তবে তাঁহার মতে গভর্নমেণ্টের হিন্দুদিগকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া সঙ্গত। এইরূপ হিন্দুগরিষ্ঠ প্রদেশেও যদি মুসলমানের অবস্থান মাত্রেই হিন্দুদের উষ্মার কারণ হয়, তবে সেখানেও গভর্নমেণ্টের মুসলমানগণকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া কর্তব্য।

গান্ধীজী স্বীকার করেন যে ইহা খুবই সত্য কথা যে, অহিংস ব্যক্তির স্বীয় স্থান ত্যাগ করা উচিত নয়। এইরূপ ব্যক্তির সম্পর্কে ক্ষতিপূরণের প্রশ্নই উঠে না। অহিংস ব্যক্তি নিজ স্থানে মৃত্যু বরণ করিয়া ইহাই প্রতিপন্ন করিবেন যে, তাঁহার উপস্থিতি রাষ্ট্রের পক্ষে অথবা কোন সম্প্রদায়ের পক্ষে বিপজ্জনক ছিল না। নোয়াখালির হিন্দুরা এরূপ কিছু করেন নাই, তাহা গান্ধীজী জানেন। তাহারা সরল নিরীহ গৃহস্থ। এই সংসারই তাহাদের প্রিয় এবং এখানে তাহারা শান্তি ও নিরাপদে থাকিতে চাহে। যাহাতে গরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের অধিবাসীরা স্বচ্ছন্দে বসবাস করিতে পারে তজ্জন্য গভর্নমেণ্ট যদি এই নিরীহ লোকদের সম্মানজনক ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করেন তবে তাহারা তখন স্বীয় বিবেক-বুদ্ধিমত কর্তব্য স্থির করিবে।

গান্ধীজী আরও বলেন যে, স্থানত্যাগকারী ব্যক্তি তাহার স্থাবর ও অস্থাবর যে সকল সম্পত্তি সঙ্গে করিয়া নিতে পারিবে না, গভর্নমেণ্ট তাহার সমস্তেরই ক্ষতিপূরণ করিবেন। ব্যবসায়ের ক্ষতি এক কঠিন সমস্যা। কোন গভর্নমেণ্টের

পক্ষে এইরূপ ক্ষতিপূরণ বহন করা সম্ভব বলিয়া তিনি ধারণা করিতে পারেন না। স্থানত্যাগকারীর নূতন স্থানে জীবিকানির্বাহের কোন উপায় অবলম্বনের জন্য সম্ভবমত অর্থসাহায্যের প্রস্তাব তিনি বুঝিতে পারেন।

গান্ধীজী আরও বলেন যে, তিনি স্থানত্যাগের ঔচিত্য স্বীকার করিয়াছেন বটে, কিন্তু ভারত সম্পর্কে তাঁহার অভিজ্ঞতা হইতে তিনি বলিতে পারেন যে, পরস্পরের মধ্যে কিভাবে শান্তিতে বাস করা যায়, তাহা হিন্দু ও মুসলমানেরা জানেন। হিন্দু ও মুসলমান ধর্মাবলম্বীরা পুরুষানুক্রমে পরস্পরের মধ্যে শান্তিতে বাস করিয়াছেন। এখন তাহা অসম্ভব করিয়া তুলিবার জন্য তাহারা তাহাদের সমস্ত কাণ্ডজ্ঞান বিসর্জন দিয়াছেন তাহা গান্ধীজী বিশ্বাস করেন না। মহাত্মাজী স্বর্গীয় কবি ইকবালের এই বাণী বিশ্বাস করেন যে, হিন্দু ও মুসলমান বিরাট হিমালয়ের ছায়াতলে দীর্ঘকাল ধরিয়া একসঙ্গে বাস করিতেছে এবং একই গঙ্গা ও যমুনার জল পান করিতেছে। বিশ্ববাসীর নিকট ইহা এক অতুলনীয় আদর্শ।

হিন্দু কর্মীদের সম্পর্কে স্বেচ্ছাকৃত ভ্রান্ত প্রচারের প্রতিকার সম্বন্ধে পরামর্শ-দান প্রসঙ্গে গান্ধীজী বলেন যে, এমনভাবে কাজ করিতে হইবে, যাহাতে কার্যেই তাহার উদ্দেশ্য স্বতঃস্ফূর্ত হয়। সাধারণভাবে ইহা বেশ ভাল প্রস্তাব বটে, কিন্তু এমনও অবস্থা দেখা দেয়, যখন কার্যের উদ্দেশ্য বুঝাইয়া দেওয়াও কর্তব্য হয়। তখন কথা না বলা মিথ্যারই সামিল হয়। অতএব অভিজ্ঞতায় ইহাই বলে যে, কোন কোন সময় কার্যের সঙ্গে সঙ্গে এই সম্পর্কে কথাও হইবে। অবশ্য এমন সময়ও আসে যখন কেবল চিন্তাই বাক্য ও কার্যের স্থান গ্রহণ করে।

বিশকাটালী

২০শে ফেব্রুয়ারি গান্ধীজী ৫০ মিনিটে তিন মাইল পথ অতিক্রম করিয়া বিশকাটালীতে উপস্থিত হন।

এই গ্রামে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অধিবাসীর সংখ্যা খুবই অল্প। তাহারা তখনও গ্রামে প্রত্যাবর্তন করে নাই। গান্ধীজী যে গৃহে অবস্থান করেন তাহার মালিক সাময়িকভাবে গান্ধীজীর গ্রাম পরিদর্শন উপলক্ষে আসিয়াছিলেন।

বিশকাটালী গ্রামে কয়েকটি মাত্র হিন্দুবাড়ী ছিল। গৃহদাহ ও লুণ্ঠনাদি অত্যাচারে যাহারা চলিয়া গিয়াছিল তাহাদের মধ্যে অল্পই ফিরিয়াছে। প্রতি বাড়ীতে দুই একজন করিয়া লোক ছিল। একজন উৎসাহী লোক আছেন

পণ্ডিতমহাশয়। তিনিই গ্রামকে জীবন্ত রাখিয়াছেন। তাঁহাদের বাড়ী খুব বড় ছিল। অনেকগুলি ঘর অনেকটা জায়গা জুড়িয়া ছিল। তাঁহার সমস্ত ঘরদুয়ারই ভস্মীভূত করা হইয়াছে। সেদিন দেখি ইনি গান্ধীজীর আগমনপথ সাফ করিতে কোদাল কুড়াল লইয়া গ্রামের দলবল সহ লাগিয়া গিয়াছেন। গান্ধীজীর পরিক্রমায় রাস্তা-ঘাট-গ্রাম সাফাই ইত্যাদি কর্ম গ্রামের সেবাদল গঠন করিয়া করা হইত। ইহাতে স্পষ্টই জীবনের সঞ্চার হইয়াছে, ভয় ভাঙ্গিয়াছে, এবং মৈত্রী প্রতিষ্ঠা করার কাজও সহজ হইতেছিল।

বিশকাটালী যাইবার রাস্তার কয়েক স্থানে বড় বড় গাছের গায়ে হাতে লেখা পোস্টার লাগান দেখা যায়। পোস্টারগুলির নমুনা এই প্রকার ঃ—

(১) "বিহারের কথা মনে কর।
তাড়াতাড়ি ত্রিপুরা ছাড়।
তোমায় বলি বারে বারে
তবুও তুমি ঘরে ঘরে।
ভাল হবে ফিরে গেলে"।

(২) "তোমার যেথানে দরকার সেথানে যাও
ভণ্ডামি এথানে চলিবে না।
পাকিস্তান মানিয়া লও।"

(৩) "মুসলিম লীগ জিন্দাবাদ
কায়েদে আজম জিন্দাবাদ
পাকিস্তান কায়েম হউক
কংগ্রেস ধ্বংস হউক"।

গান্ধীজী বিশকাটালীর বাটীতে পৌছিবার পর এই তিন প্রকারের পোস্টার তাঁহাকে পাঠ করিয়া শোনান হয়। তিনি এগুলি সম্বন্ধে কোন মত প্রকাশ করেন না। কেবল দুই একবার মৃদু মৃদু হাস্য করেন।

বিশকাটালীতে মহাত্মা যে বাটীতে ছিলেন সে বাটীর উপরও অত্যাচার হইয়াছে। সে বাটীতে একটি লাইব্রেরী ছিল। লাইব্রেরীর পুস্তাকাদি সমস্তই ভস্মীভূত করা হইয়াছে। বহু প্রাচীন হস্তাক্ষরে তুলটকাগজে লিখিত 'রামায়ণ-কথা' 'চৈতন্যচরিতামৃতম্' প্রভৃতি গ্রন্থরাজি, নোয়াখালির প্রাচীন ঐতিহ্যের নিদর্শন সমস্তই পোড়ান হইয়াছে।

সন্ধ্যার সময় একখানি ঘরের পাশে অর্ধদগ্ধ কতকগুলি কাগজপত্রের গাদা

ওলটপালট করিতে করিতে অধ্যাপক শ্রীনির্মল বসু—বহু প্রাচীন হস্তাক্ষরে লিখিত 'চৈতন্যচরিতামৃতম্'-এর কতকগুলি পৃষ্ঠা উদ্ধার করেন। অন্যান্য ধর্মপুস্তকেরও খানকয়েক পাতা পাওয়া যায়। এই পাতাগুলি নির্মলদা আমার নিকট রাখিতে দেন।

প্রসাদপুরেও আমরা এক বাড়ীতে এইরূপ তুলটকাগজে প্রাচীন হস্তাক্ষরে লিখিত 'রামায়ণ-কথা' দেখিতে পাই। হাঙ্গামার সময় গ্রন্থখানি মাটির তলে গর্ত করিয়া লুকাইয়া রাখা হইয়াছিল বলিয়া বাঁচিয়া গিয়াছে। এই 'রামায়ণ-কথা' প্রায় একশত বৎসর পূর্বে রচিত হইয়াছিল। বিশকাটালীতে যে বাড়ীতে গান্ধীজী ছিলেন তাহার পাশেই চক্রবর্তীবাড়ী। চক্রবর্ত্তীবাড়ীর মেয়েরাও বাড়ীতে ছিলেন। তাঁহারা হাঙ্গামার সময়েও বাড়ীতে ছিলেন। চক্রবর্তী-মহাশয়ের সহিত কথাবার্তাকালে তিনি বলেন যে, গ্রামের একজন সৎ মুসলমান তাঁহাদের রক্ষা করিয়াছেন। তিনি আরও বলেন যে, হাঙ্গামার ৯ দিন পরে ইউনিয়ন প্রেসিডেণ্ট সহ গ্রামের কয়েকজন মাতব্বর অত্যাচারিত হিন্দু বাড়ীতে বাড়ীতে গিয়া দুষ্কর্মের জন্য পল্লীবাসী মুসলমানদের তরফ হইতে ক্ষমা চাহিয়াছিলেন। অবশ্য চক্রবর্তীমহাশয় একথাও বলেন যে, এই প্রকার লোকের সংখ্যা গ্রামে অত্যন্ত মুষ্টিমেয়। তাঁহারা সাহস দিলেও তাঁহাদের সংখ্যা এত নগণ্য যে, তাঁহাদের কথার উপর ভরসা করিয়া গ্রামে থাকা চলে না।

এইদিন ডাঃ অমিয় চক্রবর্তী গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাৎ করেন। তাঁহাদের মধ্যে কিছুক্ষণ কথাবার্তা হয়। ডাঃ চক্রবর্তীর একটি প্রশ্নের উত্তরে গান্ধীজী বলেন, আমি যদি অকৃতকার্যও হই (উদ্দেশ্যসিদ্ধি বিষয়ে), সত্য ব্যর্থ হইবে না। আমি এই প্রশ্নকে আলোকের দিকে লইয়া যাইবার চেষ্টা করিব এবং লইয়া যাইব। এই চেষ্টায় আমি বাঁচি বা মরি তাহাতে কিছু আসে যায় না। নোয়াখালি ও ত্রিপুরা বিচ্ছিন্ন সমস্যা নহে, তবে ভারতকে নিজের জন্য এবং মানব-সমাজের জন্য এই সমস্যার সমাধান করিতে হইবে।

"সৌভাগ্যবশতঃই হউক বা দুর্ভাগ্যবশতঃই হউক, আমি আমার জীবনের সর্বাপেক্ষা কঠিন কার্যেও সাফল্যলাভ করিয়াছি; কিন্তু এবার কি ঘটিবে আমি জানি না। আমাদিগকে বৃহত্তম পরীক্ষায় ফেলা হইয়াছে; তবে ইহা উত্তীর্ণ হওয়া কখনও আমাদের সাধ্যাতীত নহে।"

নোয়াখালি ও ত্রিপুরায় সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় কর্তৃক সংখ্যালঘুদের বর্জন করা

সম্পর্কে ডাঃ অমিয় চক্রবর্তীর সহিত আলোচনাকালে মহাত্মা গান্ধী বলেন, "যদি সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের লোকজন সংখ্যালঘুদের ধর্ম, খাদ্য, পরিচ্ছদ, আচার-ব্যবহার ও স্বাতন্ত্র্য সহ্য করিতে রাজী না হয়, তাহা হইলে ঐ ব্যাপারে তাহাদিগকে জনসাধারণের প্রতিনিধিস্থানীয় গভর্নমেণ্টের সহায়তা লইতে হইবে।" অতঃপর তিনি বলেন, "সত্যই ভগবান। একমাত্র অহিংসার পথেই তাঁহার সন্ধান পাওয়া যায়। এ স্থানেই এ প্রসঙ্গের নিষ্পত্তি হইবে। যাহারা বিভেদের কথা বলিয়া থাকে, তাঁহাদিগকে নিজ নিজ অবস্থা জানিতে হইবে। আসুন আমরাও বাস্তব ঘটনার সম্মুখীন হই। বর্জনই যদি গভর্নমেণ্টের নীতি হইয়া থাকে তাহা হইলে তাহা আমাদের জানিতে হইবে। বিশেষ একটি সম্প্রদায় আপনা হইতে কোনরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারে না। বাংলা ও অন্যান্য প্রদেশকে এ বিষয়ে অবহিত হইতে হইবে।"

মানব-স্বভাবের পরিবর্তনশীলতা সম্পর্কে তিনি বলেন, "আমি যদি ইহাতে আস্থাবান না হইতাম তাহা হইলে আমি এখানে অবস্থান করিতাম না।"

শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনাথ চৌধুরীর বাটির বহিঃপ্রাঙ্গণে প্রার্থনা-সভা হয়। হাঙ্গামার সময় ঐ বাটী সম্পূর্ণরূপে ভস্মীভূত করা হইয়াছিল। পূর্বদিনও ঐস্থান জনশূন্য ছিল, কেহই ধারণা করিতে পারে নাই সেদিন তথায় এত জনসমাগম হইবে। প্রার্থনা-সভায় গান্ধীজী চারিটি প্রশ্নের উত্তর দেন।

প্রশ্ন : গভর্নমেণ্ট হিন্দু-বয়কট তথা হিন্দু-অপসারণ চাহেন এবং পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ দিবেন এই কথাই যদি আপনি মনে করেন তবে তাহার জন্য পূর্বাহ্নেই হিন্দুদের প্রস্তুত হওয়া উচিত নহে কি? এই প্রশ্নের উত্তরে গান্ধীজী বলেন—"হিন্দু-অপসারণ সংঘগঠন করিয়া যাহারা পূর্বাহ্নেই প্রস্তুত হইতে চাহেন, তাঁহাদের কথায় আমার কিছুই বলিবার নাই। এইরূপ কোন পরিকল্পনায় আমি সময় দিতে পারি না। হিন্দুদের উৎখাত করিবে কিনা সেকথা সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় ও গভর্নমেণ্ট বলুক। তাহারা এবংবিধ বুদ্ধিবিকারের কার্যে উদ্যত ও পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ করিতে রাজী হইলেই সংখ্যালঘিষ্ঠদের নোয়াখালি ছাড়িয়া যাইবার কথা উঠিবে ইহাই মাত্র আমি বলিয়াছি। অন্য যে পথের কথা তোলা হইয়াছে তাহা অহিংসার পথ নহে, তাহা হিংসার, তথা গৃহযুদ্ধের পথ।"

প্রশ্ন : জাতিভেদ আপনি দূর করিতে বলেন। তাহা হইলেই কি হিন্দুধর্ম বাঁচিবে? খ্রীষ্টানধর্ম বা ইসলামধর্ম প্রগতিশীল। তাহার সহিত আপনি হিন্দু-ধর্মের তুলনা করেন কেন? এই প্রশ্নের উত্তরে গান্ধীজী বলেন—"জাতিভেদ

বলিতে যাহা বুঝায় তাহা দূর হওয়া চাই; নইলে হিন্দু লোপ পাইবে। খ্রীষ্টান-ধর্ম ও ইসলাম প্রগতিশীল, আর হিন্দুধর্ম স্থিতিশীল বা পশ্চাতঃগতিক একথা আমি মানি না। বস্তুতঃ কোন ধর্মেই আমি নিশ্চয়াত্মক কোন প্রগতি দেখিতে পাই না। পৃথিবী তো আজ কসাইখানায় পরিণত হইয়াছে। বিভিন্ন ধর্ম যদি প্রগতিশীল হইবে তবে কি তুনিয়া এমন কসাইখানা হইত? ধর্ম বা কর্তব্য বলিয়া গ্রহণ করিলে বর্ণের স্থান আছে। অন্য নামে অভিহিত করিতে পারেন, কিন্তু সকল ধর্মেই এইরূপ বর্ণের স্থান আছে। ধর্ম বা কর্তব্য ব্যাখ্যা করিবার মত শক্তি ও সম্পদ যাঁহার আছে, আর যিনি বিনা পরিশ্রমের সেই সম্পদ সহায় করিয়া সমাজকে ধর্মের পথে পরিচালনা করেন তিনি ব্রাহ্মণ। মৌলভী বা খ্রীষ্টান ধর্মযাজক যদি সেই সম্পদের অধিকারী হন ও বিনা পারিশ্রমিকে নিজ নিজ যজমানদিগকে ধর্মপথে পরিচালনা করেন, তবে তাঁহারা ব্রাহ্মণ ছাড়া আর কি? অন্য যে কোন সব বর্ণেরও এইরূপ ধর্ম বা কর্তব্য নির্ধারিত আছে।"

প্রশ্ন: বিবাহে জাতিভেদ-প্রথা কি আপনি উঠাইয়া দিতে চাহেন? গান্ধীজী উত্তরে বলেন:—নিশ্চয়ই। জাতিভেদ-প্রথা উঠিয়া গেলে বিবাহে জাত-বিচারের কথা থাকিবে না। সেই শুভদিন যখন আসিবে তখন বৃত্তিভেদও থাকিবে না।

প্রশ্ন: ভগবান যদি এক, তবে একটি ধর্ম থাকিলেই তো হয়? গান্ধীজী উত্তরে বলেন:—প্রশ্নটি অদ্ভুত। গাছে অগণিত পাতা, কিন্তু মূল তাহাদের সবারই এক। তেমনি ভগবান এক হইলেও যত জীব তত শিব বা ধর্ম—যদিও পাতার মত সবার মূল সে একই। লোকে বিভিন্ন ধর্মপ্রবর্তক বা পয়গম্বরের, তথা তাঁহাদিগের প্রবর্তিত ধর্মের অনুসরণ করিয়া থাকে বলিয়া এই সহজ সত্য তাহাদের কাছে ধরা পড়ে না। আমি জানি আমি হিন্দু। কিন্তু একথাও আমি জানি যে অন্যান্যের মত বিভক্ত ভগবানের আরাধনা আমি করি না।"

কমলাপুর

২১শে ফেব্রুয়ারি মহাত্মা গান্ধী বিশকাটালী হইতে তিন মাইল পথ ৭৫ মিনিটে অতিক্রম করিয়া ৮টা ১৫ মিনিটে চাঁদপুর থানার অন্তর্গত কমলাপুরে উপনীত হন। তিনি পথিমধ্যে কোথাও থামেন নাই।

কমলাপুর মহাত্মা গান্ধীজীর পল্লী-পরিক্রমার দ্বিতীয় পর্যায়ের পঞ্চদশ গ্রাম এবং ত্রিপুরা জেলায় পরিক্রমার পথে চতুর্থ গ্রাম।

মহাত্মা গান্ধী শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদপ্রসন্ন সেনের বাড়ীতে অবস্থান করেন। মহাত্মা গান্ধী পরদিন সকালে কমলাপুর হইতে চরকৃষ্ণপুর রওনা হওয়ার পূর্বে তিনি যে ঘরে ছিলেন, উহার দরজার সম্মুখে বহু নারী উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে ফুল ও ফল উপহার দেন। তিনি উচ্চবর্ণের কতিপয় লোকের অস্পৃশ্যতাবোধ দেখিয়া ব্যথিত হন। তিনি সমবেত নারীদিগকে জিজ্ঞাসা করেন, তাঁহারা কোন অচ্ছুৎকে দেখিয়াছেন কিনা। তাঁহারা কোন উত্তর না দেওয়ায়, তিনি ঐ প্রশ্নের পুনরুক্তি করিতে থাকেন এবং বলেন যে, তিনি সর্বাপেক্ষা বড় অচ্ছুৎ, তাঁহাদের তাঁহাকে যাহা দিবার থাকে, তাঁহারা তাহা যেন দূর হইতে দেন।

কমলাপুরে যে বাড়ীতে গান্ধীজী ছিলেন সে বাটীতে বহু লোকজনের সমাগম হইয়াছিল। প্রার্থনা-সভায়ও বহু লোকসমাগম হয়। চাঁদপুর হইতে নরনারী ও বালকবালিকাদের একটি খুব দীর্ঘ শোভাযাত্রা শৃঙ্খলার সহিত সভায় উপস্থিত হয়। চাঁদপুর হইতে এই গ্রামের দূরত্ব হাঁটাপথে ৯।১০ মাইলের কম হইবে না। পরিক্রমার পরবর্তী স্থান আবার দূরে পড়ে। এই কারণে চাঁদপুরের উদ্যোক্তারা ঐ স্থানের দর্শনার্থীদের লইয়া আসিয়াছিলেন। অনেকেরই পরিচ্ছদে "চাঁদপুর রিলিফ কমিটির" ব্যাজ আঁটা ছিল। চাঁদপুর হইতে আগত দর্শনার্থীদের সুবিধার জন্য গান্ধীজী প্রার্থনার সময় আগাইয়া ৪টায় করিতে সম্মতি দেন যাহাতে তাহাদের চাঁদপুর ফিরিয়া যাইতে রাত না হয়।

কমলাপুরে প্রার্থনা-সভায় বক্তৃতাপ্রসঙ্গে গান্ধীজী ঘোষণা করেন যে, সমগ্র দেশবাসীও যদি একই ধর্মাবলম্বী হয়, তথাপি রাষ্ট্রধর্ম বলিয়া কোন্ ধর্ম হইতে পারে, ইহা তিনি বিশ্বাস করেন না। তিনি বলেন যে, ধর্ম নিছক ব্যক্তিগত ব্যাপার।

ত্রিপুরার এই অঞ্চলে উক্ত প্রার্থনা-সভা বিশেষ প্রতিনিধিমূলক হইয়াছিল। সভায় লোকসমাগমও খুব বেশী হইয়াছিল। গরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের লোকদের মধ্যে বহু প্রচারপত্র বিলি করা হয়, ইহা সত্ত্বেও বিরাট সভা হইয়াছিল। দূর ও নিকটের বহু রমণী শিশু কোলে করিয়া সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। ইহা ছাড়া চাঁদপুরের নিকটবর্তী অনেক গ্রাম হইতেও বহু লোক সভায় যোগদান করেন।

বহু লোক সভায় উপস্থিত হওয়ায় গান্ধীজী আনন্দ প্রকাশ করেন। অবশ্য জনতাকে রৌদ্রভোগ করিতে হইয়াছিল বলিয়া তিনি সহানুভূতি জানান। গান্ধীজী বলেন যে, এই সূর্য সম্ভবতঃ ভারতীয়দের কাছে ভগবানের সর্বশ্রেষ্ঠ

দান। তিনি মন্তব্য করেন যে, বৎসরের অধিকাংশ সময় ভারতবাসী নির্মল আকাশ উপভোগ করিতে পারে বলিয়া তাহারা আনন্দিত।

গান্ধীজী দৃঢ়তার সহিত এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, রাষ্ট্র হইতে ধর্ম পৃথক থাকিবে, তাঁহার মতে প্রকৃতপক্ষে যত মত তত পথ। এই হেতু কোন অবস্থায়ই ধর্মে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ বাঞ্ছনীয় নয়। প্রত্যেক মানুষেরই ভগবান সম্বন্ধে নিজের বিশেষ ধারণা আছে। রাষ্ট্র হইতে কোন ধর্মপ্রতিষ্ঠানকে আংশিক কিংবা সম্পূর্ণ সাহায্যদানেরও মহাত্মাজী বিরোধী।

বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী ভারতীয়দের মধ্যে বিবাহ তিনি সমর্থন করেন কি না, এই প্রশ্নের জবাবে গান্ধীজী স্বীকার করেন যে, সাধারণতঃ তিনি এই প্রথা সমর্থন করেন না বটে, তবে বহু পূর্বেই তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, ভিন্ন ধর্মাবলম্বী নরনারীর মধ্যে বিবাহ হইলে পর তাহাকে সাদরে বরণ করিয়া লওয়াই কর্তব্য। কিন্তু তাঁহার মতে এইরূপ বিবাহ কখনও কামজ হওয়া বিধেয় নয়। তাহা হইলে বিবাহ অবৈধ সংসর্গের সামিল হইয়া যায়। বিবাহকে তিনি একটা পবিত্র সংস্কার বলিয়াই গণ্য করেন।

এই হেতু বিবাহিত দম্পতীর পরস্পরের মধ্যে অবশ্যই বন্ধুত্ব থাকিবে এবং একে অন্যের ধর্মমতের প্রতি সমভাবে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিবে। এই ব্যাপারে ধর্মান্তরিত করার কোন প্রশ্নই উঠে না। এই অবস্থায় দুই ধর্মাবলম্বীদের যে কোন ধর্মমতের যাজকই বিবাহ অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিতে পারেন। সম্প্রদায়সমূহ পরস্পরের প্রতি শত্রুভাব ত্যাগ করিলে এবং বিশ্বের সমস্ত ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাবান হইলে পরই এইরূপ প্রীতিপূর্ণ ব্যাপার ঘটিতে পারে।

বক্তৃতার প্রথম দিকে গান্ধীজী উল্লেখ করেন যে, শ্রীযুক্ত হরদয়াল নাগ মহাশয় জীবিত থাকাকালে তিনি শ্রীযুক্ত নাগ মহাশয়ের আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। আশ্রয়প্রার্থীদের রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া চাঁদপুর উহার কর্তব্য করিয়াছে বলিয়া তিনি খুশী। কিন্তু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্যরক্ষার বিধানাবলীর প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শনে তিনি দুঃখ প্রকাশ করেন। কড়াকড়িভাবে এই সকল নিয়মাবলী পালন করিলে সর্বদা প্লেগ এবং অস্বাস্থ্যকর অবস্থা হইতে উদ্ভূত অন্যান্য পীড়ার ভয়ে শঙ্কিত থাকিতে হইত না।

অতঃপর গান্ধীজী বলেন যে, কখনও যেন তাঁহারা মুসলমান প্রতিবেশীর প্রতি বিদ্বেষ পোষণ না করেন। উভয় সম্প্রদায়কেই পরস্পর মিলিয়া মিশিয়া শান্তিতে বাস করিবার জন্য তিনি আবেদন জানান।

চরকৃষ্ণপুর

২২শে ফেব্রুয়ারি গান্ধীজী তিন মাইল পথ ১ ঘণ্টা ১৫ মিনিটে অতিক্রম করিয়া ৮ টা ৩৫ মিনিটে চরকৃষ্ণপুরে পৌছেন। তিনি শ্রীহেমচন্দ্র বৈদ্য দাস নামে একজন তপসিলী হিন্দুর গৃহে অবস্থান করেন। যে ঘরে তাঁহাকে থাকিতে দেওয়া হইয়াছিল তাহা একটি ভস্মীভূত গৃহের ধ্বংসাবশেষের উপর নির্মিত হইয়াছিল। সাংবাদিকগণ ও গান্ধীজীর দলের অন্যান্য সকলে তাঁবুতে আশ্রয় পাইয়াছিলেন।

শ্রীযুক্তা রেণুকা রায় ও অপর যে কয়জন মহিলা-কর্মী চরকৃষ্ণপুরে পুনর্বসতির কাজে ব্যাপৃত ছিলেন, তাঁহারা গান্ধীজীকে সম্বর্ধনা জানান।

চরকৃষ্ণপুরে যে বাটীতে গান্ধীজী ছিলেন তাহা অতি তাড়াতাড়ি বাসোপযোগী করা হয়। কর্মীদের উপর সাধারণ নির্দেশ ছিল যে, দুইবার মুসলমান নিমন্ত্রণকারীরা শেষমুহূর্তে নিমন্ত্রণ প্রত্যাহার করায় যে অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল সেরূপ অসুবিধা এড়াইবার জন্য সঙ্গে সঙ্গে সেই সেই স্থানে অপর বাড়ীতে ব্যবস্থা রাখা। চরকৃষ্ণপুরের নিমন্ত্রণকারী ভদ্রলোক এতই নিকট সম্পর্ক রাখিয়া আসিতেছিলেন যে তাঁহার সম্পর্কেও বিকল্প ব্যবস্থা রাখিতে কর্মীদের বাধে এবং তাহারা সাধারণ নির্দেশ অনুযায়ী অপর বাড়ী দেখিবেন না একথা জানান। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ইনিও চাপে পড়িয়া লজ্জিত হইয়া জানাইতে বাধ্য হন যে, তাঁহার দ্বারা আতিথেয়তা সম্ভব হইল না। এই মুসলমান ভদ্রলোক গান্ধীজী যে বাড়ীতে ছিলেন সেই বাড়ীতে আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন।

গান্ধীজীর সান্ধ্যপ্রার্থনা-সভায় প্রায় ৫ হাজার নরনারী ও শিশু উপস্থিত ছিল। চর-অঞ্চলে প্রধানতঃ নমঃশূদ্রদের বাস। এইদিন সভায় উপস্থিত নমঃশূদ্রদের সংখ্যাই প্রায় ৪ হাজার হইয়াছিল। তাহাদের মধ্যে বহু নারী ও শিশু ছিল।

মহাত্মা গান্ধী তাঁহার প্রার্থনান্তিক বক্তৃতায় বলেন, "ইংরাজদের চক্ষের সম্মুখে যেরূপ নিশ্চিতভাবে ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটিতেছে, তাহাতে যদি উহা পুরাপুরি ধ্বংস নাও হয়, তাহা হইলেও ব্রিটিশ জাতি উহার নাম-মাহাত্ম্য হারাইবে, সেইরূপ অস্পৃশ্যতার বিনাশ না হইলে হিন্দুগণ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে।"

মহাত্মা গান্ধী আরও বলেন যে, তিনি যাহাদিগকে অচ্ছ্যুৎ বলিয়া

অভিহিত করিয়া থাকেন, তাহাদের মধ্যে আসিয়া তিনি সুখী হইয়াছেন। তিনি আপনাকে তাহাদের সহিত এক বলিয়া অভিহিত করিয়া বলেন যে, তিনি অচ্ছ্যুৎদের মধ্যে নিম্নতম। তিনি জাতিভেদে বিশ্বাসী নহেন বলিয়া তিনি হিন্দুসমাজের সর্বনিম্ন ধাপে স্থান গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি সকলকে সর্বনিম্ন ধাপে স্থান গ্রহণ করিতে আহ্বান করিয়া বলেন যে, তাহা হইলে মন্দির-প্রবেশ, সর্ব-বর্ণের ভোজ ও অস্পৃশ্যতা প্রভৃতি প্রশ্নের উদ্ভবের কোন অবকাশ থাকিবে না। তিনি এই প্রস্তাব পুরাপুরি সমর্থন করেন যে, যখন কাহারও জাতির জন্য তাহার বিরুদ্ধে কোন বিধিনিষেধ প্রযুক্ত হইবে না, তখন অস্পৃশ্যতা সম্পূর্ণ রহিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে। তিনি বিশ্বাস করেন যে, অস্পৃশ্যতাবর্জন কার্যসূচীর প্রথম কাজ মন্দির-প্রবেশ। অস্পৃশ্যতা দানবের চূড়ান্ত পরাজয়ের পূর্বে বর্তমানে যেরূপ চলিতেছে, সেইরূপ সাধারণের সামাজিক ভোজ হওয়া উচিত।

ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ এটলীর বিবৃতি সংবাদপত্রে যেরূপ প্রকাশিত হইয়াছিল অপরাহ্নে চরকৃষ্ণপুরে মহাত্মা গান্ধীকে তাহা পড়িয়া শুনান হয়। ঐ সময়ে মহাত্মা গান্ধী শ্রীযুক্ত এ. ভি. ঠক্করের সহিত আলাপ-আলোচনায় প্রবৃত্ত ছিলেন। তিনি বিবৃতিটি স্থিরভাবে শ্রবণ করেন। বিবৃতিপাঠ শেষ হইতে ৫ মিনিট অধিক সময় লাগায় গান্ধীজীর প্রার্থনাস্থলে যাইতে ৫ মিনিট বিলম্ব হয়। মহাত্মাজী বিবৃতি সম্বন্ধে কোনও মন্তব্য করেন না।

মহাত্মা গান্ধীর সান্ধ্য ভ্রমণকালে জনৈক বৃদ্ধ (নমঃশূদ্র) তাঁহার ভস্মীভূত ও লুণ্ঠিত গৃহে গান্ধীজীকে অভ্যর্থনা করেন। গান্ধীজী তথায় গেলে বৃদ্ধ ক্রন্দন করিতে থাকেন। গান্ধীজী তাঁহাকে বলেন, "কাঁদিও না, শুধু কাঁদিলেই হারানো জিনিস ফিরিয়া পাওয়া যায় না।" গান্ধীজী এই বৃদ্ধ লোকটিকে সান্ত্বনা দিয়া বলেন, "এই পৃথিবীতে কিছুই অবিনশ্বর নয়। একদিন না একদিন সবই ভস্মে পরিণত হইবে। একদিন আসিবে, যখন আমাকে ও তোমাকে চিতানলে ভস্মীভূত হইতে হইবে। সুতরাং সাহস সঞ্চয় করিয়া মানুষের মত মানুষ হও।"

চরসোলাদি

২৩শে ফেব্রুয়ারি গান্ধীজী ২৮ মিনিটে প্রায় দেড়মাইল পথ হাঁটিয়া ৭টা ৫৮ মিনিটে চরসোলাদি গ্রামে পৌছেন। এখানে তিনি শ্রীযুক্ত যামিনীকান্ত

মাঝির বাটীতে অবস্থান করেন। এই গ্রামের অধিকাংশ অধিবাসীই তপসিল হিন্দু।

প্রার্থনা-সভায় কয়েক সহস্র নরনারী উপস্থিত ছিলেন। এইদিন গান্ধীজীর সেক্রেটারী অধ্যাপক শ্রীনির্মল বসু জরুরী কাজে অন্যত্র যাওয়ায় প্রার্থনা-সভায় উপস্থিত থাকিতে পারেন নাই। সুতরাং গান্ধীজীর অনুরোধ-ক্রমে সাংবাদিক শ্রীশৈলেন চ্যাটার্জি প্রার্থনান্তিক অভিভাষণের বঙ্গানুবাদ করিয়া শুনান।

প্রার্থনা-সভায় গান্ধীজী বাল্যবিবাহ ও বিধবাবিবাহ সম্পর্কে বলেন। তিনি বলেন যে, এ বিষয়ে তাঁহার মত সুস্পষ্ট।

প্রথমতঃ বাল্য-বৈধব্য না ঘটে তাহা করিতে হইবে। বাল্যবিবাহের আমি ঘোর বিরোধী; সম্ভবতঃ তথাকথিত উচ্চজাতি হইতে নমঃশূদ্রগণ দুর্ভাগ্যক্রমে এই বিশ্রী প্রথা গ্রহণ করিয়াছেন।

আমি যৌতুকেরও ঘোর বিরোধী। যৌতুক লইয়া মেয়ের বিবাহ, বিবাহ নহে, মেয়ে বিক্রি। নমঃশূদ্রের নিজেদের মধ্যেও জাতিভেদ আছে, ইহা পরিতাপের বিষয়। আপনাদের কাছে অনুরোধ নিজেদের মধ্যে এই ভেদাভেদ আপনারা দূর করুন। এই প্রসঙ্গে আপনারা মনে রাখিবেন যে, সর্বপ্রকার জাতিভেদই আমি তুলিয়া দিতে বলিয়া আসিতেছি।

"বাল্যবিবাহ উঠিয়া গেলে বালবিধবা থাকিবে না;—হইলেও দুই-একটি হইবে। পুরুষ বা নারী, জীবনে একবারই মাত্র বিবাহ করিবে, ইহাই সাধারণ নিয়ম হওয়া চাই। তথাকথিত উচ্চজাতির স্ত্রীলোকেরা লোকাচারের দরুন অনিচ্ছায় বৈধব্য-জীবন যাপন করিতে বাধ্য হন। কিন্তু পুরুষদের একাধিক বিবাহে আদৌ বাধা নাই। ইহা কলঙ্কের কথা। সমাজে যতদিন এই আচার চলিবে ততদিন বালবিধবা বা যুবতীবিধবাদের আমি বিবাহ দিতে বলিব। নরনারীর মধ্যে কেহ কাহারও ছোট বা বড় নহে। অতএব অধিকারও নরনারীর সমান।"

প্রশ্ন: বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীর মধ্যে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ স্বামী-স্ত্রী কি আজীবন নিজ নিজ ধর্মানুসারে চলিয়াছেন বলিয়া আপনি জানেন? উত্তরে গান্ধীজী বলেন, "মৃত্যু পর্যন্ত কোন স্বামী-স্ত্রী স্ব স্ব ধর্ম অনুসরণ করিয়া গিয়াছেন এইরূপ কোন দৃষ্টান্তের কথা মনে করিয়া আমি ঐরূপ বিবাহের কথা বলি নাই। এইরূপ বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ যেসব বন্ধুর কথা আমি জানি তাঁহারা আজও জীবিত।

তাঁহাদের সম্বন্ধে বলিতে পারি যে, তাঁহারা নিজ নিজ ধর্মানুসারে চলিতেছেন। নিজ ধর্মবিশ্বাসে তাঁহাদের কোনই শৈথিল্য দেখা যায় না। কিন্তু আমি বলিব যে, এইরূপ দৃষ্টান্ত যদি অতীতে নাই মিলে তাহাতেই বা কি—নূতন আমরা সৃষ্টি করিব না কেন? পথ দেখাইলে দুর্বলেরাও দুর্বলতা পরিহার করিয়া নূতন পথে চলিবে।

আইনতঃ সিদ্ধ বিবাহের আমি পক্ষপাতী নই। কিন্তু সংস্কারবিধানের জন্ত একান্ত দরকার বলিয়া আইন-সিদ্ধ বিবাহেও আমার আন্তরিক সম্মতি আছে।

হাইমচরে গান্ধীজী

২৪শে ফেব্রুয়ারি গান্ধীজী তাঁহার পরিক্রমার শেষগ্রাম হাইমচরে আসিয়া পৌছেন। এইদিন তাঁহার মৌনদিবস ছিল। হাইমচরে গান্ধীজী ৬ দিন ছিলেন। এখানে গান্ধীজী শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ দেবনাথ নামে স্থানীয় জনৈক ব্যবসায়ীর বাটীতে অবস্থান করেন। এই ব্যক্তি হাঙ্গামার সময় তাঁহার যথাসর্বস্ব হারাইয়া নিঃস্বের পর্যায়ে পৌছিয়াছেন।

মহাত্মাজী এখানে পৌছিলে উৎকল প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভানেত্রী শ্রীযুক্তা মালতী চৌধুরী এবং অন্যান্য স্বেচ্ছাসেবক ও স্বেচ্ছাসেবিকাগণ সুললিত কণ্ঠে ব্রহ্মসঙ্গীত গাহিয়া তাঁহাকে সম্বর্ধনা জানান। গান্ধীজী তাঁহার কুটীরের দরজায় দাঁড়াইয়া তাঁহাদের গান শুনেন।

হাইমচর ঠক্কর বাপার প্রধান কর্মকেন্দ্র। তিনি গান্ধীজীকে স্থানীয় অবস্থা বিশদভাবে জানান। পরিক্রমার দ্বিতীয় পর্যায় ভালোয় ভালোয় সম্পন্ন হইল বলিয়া গান্ধীজী ভগবানের নিকট কৃতজ্ঞতা জানান। বাপাকে তিনি হরিজনদের প্রধান পুরোহিত ও প্রধান সেবক বলিয়া বর্ণনা করেন। হাইমচরকে পরিক্রমা-ভুক্ত করিবার জন্য বাপা যে কত আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহাও উল্লেখ করেন। কর্মীদের বিভিন্ন স্থানে নিয়োগ করার কথা উল্লেখ করিয়া গান্ধীজী বলেন যে, বৃক্ষ-লতা যেমন সহজ প্রেরণায় সূর্যের দিকে মুখ ফিরায়, বাপাও তেমনি এই ক্ষেত্রকে স্বতঃস্ফূর্ত প্রেরণায় আপন কর্মক্ষেত্ররূপে বাছিয়া লইয়াছেন।

গান্ধীজী যে বাড়ীতে ছিলেন তাহার সম্মুখেই বিখ্যাত হাইমচর বাজার। এই বাজারে দৈনিক লক্ষ লক্ষ টাকার ক্রয়-বিক্রয় হইত। বিস্তৃত এলাকা লইয়া এই বাজার। এক্ষণে বাজারের ধ্বংসাবশেষ (অর্থাৎ ভস্মাবশেষ)

ছাড়া আর কিছুই নাই। কতকগুলি লোহার ছোটবড় সিন্দুক ইতস্ততঃ ভাবে এদিক ওদিক ছড়াইয়া পড়িয়া থাকিতে দেখা যায়।

এই অঞ্চলে প্রধানতঃ তপসিলী হিন্দুদের বাস। দুই চার ঘরের বেশী মুসলমান নাই।

হাইমচরে অবস্থানকালে চতুর্থ দিনে মিঃ ফজলুল হক মহাত্মাজীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া প্রায় ৭০ মিনিট ধরিয়া তাঁহার সহিত আলোচনা করেন।

হাইমচর হইতে গান্ধীজী চর-অঞ্চল দিয়াই পরিভ্রমণ করিবেন এইরূপ স্থির হইতেছিল। অবশ্য ত্রিপুরার অধিবাসীরাও মহাত্মাকে ত্রিপুরা দিয়া লওয়ার জন্য জিদ ধরিয়াছিল। দুই জেলার অধিবাসীগণের মধ্যে মহাত্মাকে নিজ নিজ জেলার মধ্যে দিয়া টানিয়া লইয়া যাওয়ার জন্য এক সময় উভয়ের মধ্যে যখন রেষারিষি চরমে উঠিয়াছিল, সেই সময় এক সন্ধ্যায় অকস্মাৎ বজ্রাহতের ন্যায় তাহারা শুনিল মহাত্মার ডাক আসিয়াছে বিহার হইতে। দুই-একদিনের মধ্যেই তিনি বিহার রওনা হইয়া যাইবেন।

গান্ধীজীর বাসস্থানের কিছু দূরে এক বিস্তৃত মাঠে গান্ধীজীর প্রার্থনা-সভা হয়। প্রার্থনার জন্য একটি সুসজ্জিত মণ্ডপ নির্মাণ করা হইয়াছিল। শেষের দিকে কয়েকদিন প্রার্থনা-সভা একটি বাটীর সম্মুখে হয়।

প্রথমদিন প্রার্থনা-সভায় গান্ধীজী মিঃ এটলীর বিবৃতির উল্লেখ করিয়া বলেন যে, উহা বিভিন্ন দলের উপর, যে যেরূপ ভাল বুঝিবে, সেইভাবে কাজ করার দায়িত্ব অর্পণ করিয়াছে।

তিনি আরও বলেন যে, ১৯৪৮ সালের জুন মাসে কিংবা তৎপূর্বেই ব্রিটিশ শাসনের অবসান হইবে বলিয়া বিবৃতিতে ঘোষণা করা হইয়াছে। অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করা হইবে, না, উহা ব্যর্থ হইতে দিবে, তাহা বিভিন্ন দলকেই এখন স্থির করিতে হইবে। তাহাদের সম্মিলিত ইচ্ছাশক্তিকে অগ্রাহ্য করিতে পারে, পৃথিবীতে এমন কিছুই নাই। তবে তাঁহার নিজের দৃঢ় অভিমত এই যে, বাহিরের চাপ ছাড়া হিন্দু ও মুসলমানরা যদি শ্রেণীবিভেদ ঘুচাইয়া একত্র হইতে পারে, তাহা হইলে তাহারা যে শুধু নিজেদের রাজনৈতিক অবস্থার উন্নতিসাধন করিবে তাহা নহে, সমগ্র ভারতের এমন কি নিখিল বিশ্বেরও তাহাতে কল্যাণ হইবে।

ইহার পরে গান্ধীজী নমঃশূদ্রদের কথা বলেন। প্রার্থনা-সভায় নমঃশূদ্রই ছিল বেশীর ভাগ। অতএব তাহাদের মনের কথাই গান্ধীজী তুলিলেন।

গান্ধীজী বলেন, নিজেদের কখনও আপনারা নীচ মনে করিবেন না। অস্পৃশ্য ভাবিবেন না। দোষী আপনারা নহেন। তথাকথিত উচ্চবর্ণের লোকেরাই দোষী; আপনাদের এই অবস্থার জন্য তাহারাই দায়ী। এই কথা যখন আপনারা বুঝিবেন তখন আর আপনারা উচ্চজাতির কদাচার ও কু-অভ্যাসের অনুকরণ করিবেন না।

আপনারা মেয়েদের শিশুকালে বিবাহ দেন এবং উচ্চজাতির অনুকরণে বাল-বিধবাদের পুনরায় বিবাহ না দিয়া বিধবা রাখেন, ইহা জানিয়া আমি দুঃখিত। তাহার ফলে বহু-জন-আসক্তির দরুন যে ব্যাধি জন্মে তাহাতে নাকি আপনাদের সমাজ ক্লিষ্ট হইয়াছে। আপনারা যদি মনে করেন যে, আইনের দ্বারা আপনাদের অবস্থার উন্নতি হইবে তাহা হইলে আপনারা ভুল করিবেন। আপনাদের উন্নতি আপনাদের নিজেদের হাতে, নিজেদের চেষ্টায়।

হাইমচরে গান্ধীজীর অবস্থানের দ্বিতীয় দিবস সারাদিন খুবই কর্মব্যস্ততার মধ্যে কাটে। অপরাহ্নে রিলিফ কমিশনার মিঃ নুরন্নবী চৌধুরী গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং তাহার পরই তিনি একটি জনসভায় গান্ধীজীকে পূর্বব্যবস্থানুযায়ী লইয়া যান। পুনর্গঠন সম্বন্ধে কমিশনার সাহেব বক্তৃতা দিবেন বলিয়া এই সভা আহ্বান করিয়াছিলেন। অপরাহ্নে ৩টা হইতে সাড়ে ৪টা পর্যন্ত সভা চলে। এই সভার পরই সময় হওয়ায় গান্ধীজী সেখান হইতে সোজা কতকটা দূরে প্রার্থনা-সভায় উপস্থিত হন।

মিঃ চৌধুরী বক্তৃতা প্রসঙ্গে গ্রাম উন্নয়ন সম্পর্কে তাঁহার পরিকল্পনা বলেন। জনশক্তি উদ্বুদ্ধ করিয়া তাহা কাজে লাগাইলে গ্রামের শ্রী ফিরিবে এই বিষয়ে তিনি জোর দেন।

কমিশনারসাহেব বলেন যে, তাঁহার পরিকল্পনায় অর্থের আবশ্যক নাই। আবশ্যক হইতেছে লোকের মনোবৃত্তি পরিবর্তনের। তাহা হইলে লোকে যে সময়টা অপব্যয় করে তাহার সামান্য মাত্র অংশ হিতের জন্য লাগাইলে সর্বপ্রকার হিতকর কার্য হইতে পারে, যথা:—রাস্তাঘাট তৈরী, পুকুরসাফাই, পাঠাগার নির্মাণ ইত্যাদি হইতে পারে। হিন্দু-মুসলিম একযোগে এই কাজ করিতে পারে এবং অন্যত্র করিয়াছে।

গান্ধীজী এই সম্বন্ধে বলিতে অনুরুদ্ধ হইলে তিনি বলেন যে, তিনি নুরন্নবী সাহেবের প্রবল কর্মব্যস্ততার পরিচয় নিজেই পাইয়াছেন যখন তিনি কয়েক ঘণ্টার মধ্যে একটা পথ সংস্কার করিয়া বহুলোক লইয়া শ্রীরামপুরে তাঁহার নিকট

উপস্থিত হন। বর্তমানে তিনি গ্রাম্য-হিতের সর্বপ্রথম ধাপস্বরূপ হিন্দু-মুসলিম ঐক্য প্রতিষ্ঠিত করিতে নুরন্নবী সাহেবকে অনুরোধ করেন। নুরন্নবী সাহেব, স্বর্গরাজ্য "Kingdom of God"-এর প্রতিষ্ঠা দেখিতে চাহেন এবং সভ্যতার প্রতিষ্ঠা দেখিতে চাহেন। স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করায় তিনি বড়ই আনন্দ লাভ করেন। তিনিও তাহাই চাহেন। রামরাজ্য, স্বর্গরাজ্য এসবই 'খুদাই রাজ্য'। কিন্তু সভ্যতার প্রতিষ্ঠা যে চাহেন সে বিষয়ে গান্ধীজীর শঙ্কার উদ্রেক হয়। কোন্ প্রকারের সভ্যতা? ইউরোপীয় সভ্যতা তো জগৎময় বিষ উৎপন্ন করিয়াছে এবং উহার দাপটে ভারতবাসীকেও অন্নবস্ত্রে কষ্ট পাইতে হইতেছে। সভ্যতা বলিতে কি বুঝি তাহার উপর নির্ভর করিবে যে, যাহা চাই তাহা চাওয়ার যোগ্য কিনা। তবে "Kingdom of God"—স্বর্গরাজ্য তো চাই-ই এবং সেই প্রচেষ্টায় নুরন্নবী সাহেব যে খিদ্‌মত চাহেন গান্ধীজী তাহা দিতে আগ্রহান্বিত।

২৬শে ফেব্রুয়ারি গান্ধীজী সকাল ৭টার কিছু পূর্বে প্রাতর্ভ্রমণে বাহির হন। পায়ে-হাঁটা গ্রাম্য পথ। একপাশে শ্যামল ক্ষেত রৌদ্রকিরণে চিক্‌মিক্ করিতেছিল, আর একপাশে লোকালয়। মহাত্মার আগমনে পল্লীবাসীদের প্রাণে আশার অভ্যুদয় হইতেছে। অত্যাচার নিপীড়ন হইতে তাহারা মুক্তিলাভ করিবে। পথিপার্শ্বে করজোড়ে দাঁড়াইয়া তাহারা মহাত্মাকে সশ্রদ্ধ অভিবাদন জানায়। হাইমচরে সেবারত কর্মী শ্রীশচীন মিত্র গান্ধীজীর সাথে ছিলেন। পথ চলিতে চলিতে তিনি ঐ অঞ্চলে সাম্প্রদায়িক সদ্ভাব স্থাপনে কর্মীদের পথে যে সমস্ত অসুবিধা দেখা দিতেছিল তাহা গান্ধীজীর নিকট বলিতেছিলেন। গান্ধীজীকে তিনি বলেন, ঐ অঞ্চলের আয়তনের তুলনায় কর্মীদের সংখ্যা অল্প। অদূর ভবিষ্যতে বৃষ্টি আরম্ভ হইলে তাঁহাদের পক্ষে গ্রামে কাজ চালাইয়া যাওয়া কঠিন হইবে।

গান্ধীজী পূর্বে যে পথ দিয়া হাঁটিয়াছেন, ফিরিবার সময় সেই পথ দিয়া আবার হাঁটিতে চাহেন না বলিয়া ভিন্ন পথ দিয়া হাঁটেন। মাটি উঁচু-নীচু থাকায় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হয়, তিনি পায়ে ব্যথা পাইতেছেন কিনা। গান্ধীজী বলেন যে, কিছুই তাঁহার পায়ে ব্যথা দিবে না। তিনি তাঁহার পথ ধরিয়া হাঁটিতে ভালবাসেন।

গান্ধীজী যখন বেড়াইতেছিলেন, তখন ইউনিফরম-পরিহিত প্রায় পঞ্চাশ জন বালক-বালিকা জাতীয় সঙ্গীত গাহিতে গাহিতে চাঁদপুরে ফিরিয়া

যাইতেছিল। তাহারা পূর্বদিন এখানে আসিয়াছিল। গান্ধীজী তাহাদিগকে দেখিয়া আনন্দিত হন।

এইদিনও সান্ধ্য প্রার্থনা-সভায় বহু লোকসমাগম হইয়াছিল। চাঁদপুর ও বহু দূরবর্তী গ্রাম হইতেও বহু লোকজন মহাত্মার দর্শনের জন্য প্রার্থনা-সভায় উপস্থিত হয়।

প্রার্থনা-অনুষ্ঠানের পর গান্ধীজী কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর দেন।

প্রশ্ন : যে ব্যক্তি স্বীয় সম্প্রদায়ের জন্য নিজ স্বার্থ বিসর্জন দিয়াছে তাহার সম্প্রদায়ের পক্ষে সে নিঃস্বার্থপর। এই ব্যক্তি যাহাতে জাতির স্বার্থের জন্য সম্প্রদায়ের স্বার্থ বিসর্জন দিতে উদ্বুদ্ধ হয়, কিভাবে তাহার অন্তরের এই পরিবর্তন-সাধন করা সম্ভব ?

উঃ : যে ব্যক্তির ত্যাগের পরিধি স্বীয় সম্প্রদায়কে ছাড়াইয়া যায় না, সে নিজেও স্বার্থপর হয় এবং তাহার সম্প্রদায়কেও স্বার্থপর করিয়া তুলে। তাঁহার (গান্ধীজীর) মতে আত্মত্যাগের যুক্তিপূর্ণ পরিণতি এই যে, ব্যক্তি তাহার সম্প্রদায়ের জন্য, সম্প্রদায় উহার গ্রামের জন্য, গ্রাম জেলার জন্য, জেলা প্রদেশের জন্য, প্রদেশ জাতির জন্য এবং জাতি সমগ্র বিশ্বের জন্য ত্যাগ করিবে। সমুদ্র হইতে একবিন্দু বারি উঠাইয়া লইলে উহা বৃথাই নষ্ট হয়! কিন্তু সমুদ্রের অংশ হইয়া থাকিলে এই বারিবিন্দুই উহার বক্ষে বিরাট অর্ণবপোত বাহিনী বহন করার গৌরবের অংশ গ্রহণ করিতে পারে।

প্রশ্ন : স্বাধীন ভারতে কাহার স্বার্থ অগ্রগণ্য হইবে ? কোন প্রতিবেশী রাষ্ট্র কোন বিষয়ে অভাবে পড়িলে স্বাধীন ভারত কি করিবে ?

উত্তরে গান্ধীজী বলেন যে, প্রকৃত আত্মনির্ভরশীল স্বাধীন ভারত বিপদে পতিত প্রতিবেশীর সাহায্যার্থ অবশ্যই আগাইয়া যাইবে। উদাহরণস্বরূপ তিনি আফগানিস্থান, সিংহল এবং ব্রহ্মের কথা উল্লেখ করিয়া বলেন যে, উপরিউক্ত তিনটি রাষ্ট্রের প্রতিবেশীদের বেলায়ও এই নিয়ম প্রযোজ্য। এইভাবে ঐ সকল দেশও ভারতের প্রতিবেশী। গান্ধীজী বলেন যে, ব্যক্তিগত ত্যাগ যদি প্রকৃত ত্যাগ হয়, তবে সমগ্র মানবসমাজই উহার ফলভাগী হয়।

২৭শে ফেব্রুয়ারি অপরাহ্নে বাংলার ভূতপূর্ব প্রধান মন্ত্রী মিঃ এ. কে ফজলুল হক গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সত্তর মিনিট ধরিয়া তাঁহার সহিত আলোচনা করেন। রুদ্ধদ্বারকক্ষে এই আলোচনা হয়। আলোচনার সময় গান্ধীজীর সেক্রেটারী নির্মল বসু ও হক সাহেবের তিনজন সাথী উপস্থিত ছিলেন।

কয়েকদিন হইতেই গান্ধী-শিবিরে গান্ধীজীর তৃতীয় পর্যায় পরিক্রমার কার্যক্রম স্থির করা লইয়া বিশেষ ব্যস্ততা দেখা যাইতেছিল। শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র দাশগুপ্তও হাইমচরে আসেন। অধিকাংশ সময় তাঁহাকে কর্মীদের সহিত আলোচনায় ব্যাপৃত থাকিতে দেখা যায়। ত্রিপুরার লোকেরা চায় ত্রিপুরার মধ্য দিয়া গান্ধীজীকে লইয়া যাইতে, আবার নোয়াখালির লোকেরা জিদ ধরে গান্ধীজীকে নোয়াখালির গ্রামের মধ্য দিয়া লইবার জন্য।

বেলা ২টার সময় কর্মীদের এক সভায় নোয়াখালির চর-অঞ্চলের কর্মীরা বলে যে, গান্ধীজী তাহাদের গ্রাম দিয়া যাইবেন জানিতে পারিয়া তাহারা পথ-ঘাট সব পরিষ্কার করিয়া রাখিয়াছে। গ্রামের লোকেরা উদ্‌গ্রীব হৃদয়ে তাঁহার আগমনপথের দিকে চাহিয়া আছে। এই অবস্থায় তিনি যদি ঐ অঞ্চল দিয়া না যান তাহা হইলে তাহারা সত্যাগ্রহ করিবে।

এই কর্মীসভায় গান্ধীজী সর্বপ্রথম তাঁহার বিহার যাওয়ার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন।

বৈকালে প্রার্থনা-সভায় তাঁহার বিহার যাওয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিয়া গান্ধীজী বলেন, শীঘ্রই আমি বিহার চলিয়াছি। কিছুদিন বিহারে থাকিয়াই আমি আবার নোয়াখালি ও ত্রিপুরায় সেবাকার্য শুরু করিব। দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা না করিয়া আমি এ অঞ্চল ত্যাগ করিব না।·· সম্প্রতি ডাঃ সৈয়দ মামুদের সেক্রেটারী একখানি দীর্ঘ পত্র লইয়া আমার নিকট আসিয়াছেন। এই পত্রে আমাকে বিহার যাইতে অনুরোধ করা হইয়াছে। তাই আমি বিহার চলিয়াছি।

১লা মার্চ বিশ্ব-যুবসংঘের ৪ জন প্রতিনিধি গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া প্রায় আধ ঘণ্টা ধরিয়া তাঁহার সহিত আলোচনা করেন। গান্ধীজী তাঁহাদের বলেন যে,—যে পর্যন্ত ভারত স্বাধীন না হইবে ততদিন ভারতীয় সমস্যার আসল সমাধান কিছুতেই আশা করা যায় না।

২রা মার্চ—ভোরের পাখী ডাকিবার পূর্বেই গান্ধী-শিবিরের সকলেই শয্যা-ত্যাগ করে। শ্রীনির্মল বসু, শ্রীযুক্তা মালতী চৌধুরী ও অন্যান্য কর্মীদের সম্মিলিত কণ্ঠে একখানি 'বিদায় সঙ্গীত' প্রভাত সমীরণে ভাসিয়া আসিতেছিল। যাত্রার আয়োজন চলিতেছিল। স্থানীয় অধিবাসী ও কর্মীদের মন ভারাক্রান্ত, মুখে বিমর্ষভাব। প্রকৃতিতেও অদ্ভুত সাদৃশ্য! প্রকৃতিও অশ্রুভারাক্রান্ত। প্রত্যুষ হইতেই চারিদিক ঘন কুয়াশায় সমাচ্ছন্ন হইয়া ছিল। চারিদিকে কুয়াশাপাতের

টিপ্ টাপ্ শব্দ ছাড়া গান্ধী-শিবিরে আর কোন শব্দ নাই, কাহারও মুখে কথা নাই। বেলা প্রায় ১১টা পর্যন্ত দুর্ভেদ্য কুয়াশায় চতুর্দিক সমাচ্ছন্ন থাকে। তারপর ধীরে ধীরে কুয়াশা কমিয়া রৌদ্র উঠে।

বেলা ২টার সময় মহাত্মা খালিগায়ে জোড়হাতে তাঁহার কুটির হইতে বাহির হইয়া আসেন। সেদিন প্রায় ২ মাস পরে প্রথম তাঁহার পায়ে চটি দেখা যায়। কুটীরের বাহিরে কিছুদূরে একখানি জীপ দাঁড়াইয়া ছিল। সমবেত দর্শনার্থীর মধ্য দিয়া ধীরে ধীরে হাঁটিয়া তিনি গিয়া জীপে আসন গ্রহণ করেন। শ্রীমতী মৃদুলা সরাভাই, শ্রীমতী মনু গান্ধী ও শ্রীচারু চৌধুরী গান্ধীজীর সহিত একই জীপে রওনা হন।

একটি নৌকায় ডাকাতিয়া নদী পার হইয়া পৌনে চারটার সময় গান্ধীজী চাঁদপুর পৌছেন। এখানে স্বর্গীয় হরদয়াল নাগের পুত্র শ্রীমানকুমার নাগ ও অন্যান্য কর্মীবৃন্দ গান্ধীজীকে অভ্যর্থনা করেন।

নদীর তীরেই গান্ধীজীর সান্ধ্য প্রার্থনা-সভা হয়। সভায় প্রায় পঁচিশ-ত্রিশ হাজার হিন্দু-মুসলমান সমবেত হইয়াছিল।

প্রার্থনার পর গান্ধীজী বলেন, বিহারে যাত্রাও আমার সত্য ও অহিংসার পরীক্ষারই একটি অংশমাত্র। নোয়াখালি ও ত্রিপুরার অধিবাসীদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, আমি আজ এ অঞ্চল ত্যাগ করিয়া বিহার চলিয়া যাইতেছি বটে, কিন্তু আসলে আমার মন পড়িয়া রহিল বাংলারই এই কোণে।

পরিশেষে তিনি বলেন, আপনারা মনে করিবেন না যে, আমি আপনাদের চিরজীবনের মত ছাড়িয়া যাইতেছি, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আপনাদের কাছেই আবার ফিরিয়া আসিবার ইচ্ছাই আমি রাখি। দুইটি বিরোধী সম্প্রদায়ের মধ্যে পুনরায় মৈত্রী স্থাপিত না হওয়া পর্যন্ত আমি বাংলাদেশ ছাড়িব না। যদি প্রয়োজন হয় এ উদ্দেশ্যে এখানেই আমি প্রাণ রাখিব। মহাত্মাজী হিন্দু-মুসলমানের নিকট ঐক্যের জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাইয়া বলেন, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই যে, ভারতবর্ষ অচিরে স্বাধীনতা পাইবে। স্বাধীনতা প্রায় আমাদের হাতেই আসিয়া পড়িয়াছে বলিয়া মনে হয়। কিন্তু এখন যদি আপনারা নিজেরা মারামারি কাটাকাটি করেন, তবে দাসত্বই হইবে আমাদের ভাগ্যের একমাত্র লিখন।

ঐদিন রাত্রেই গান্ধীজী চাঁদপুর হইতে একটি স্পেশ্যাল ষ্টীমারে বিহারের পথে কলিকাতা রওনা হন।

পরিশিষ্ট

মহাত্মা গান্ধী পূর্ববঙ্গে থাকাকালীন এবং তিনি পূর্ববঙ্গ ত্যাগ করিবার পরও পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন স্থান হইতে কিছু কিছু অপ্রীতিকর ঘটনার সংবাদ পাওয়া যায়। এপ্রিল মাসের প্রথমদিকে পূর্ববঙ্গের অবস্থার আবার অবনতি ঘটে। উপদ্রুত সম্প্রদায়ের উপর পুনরায় নির্যাতন আরম্ভ হইয়াছে—মহাত্মা গান্ধী শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত ও শ্রীযুক্ত হারানচন্দ্র ঘোষ এম. এল. এ.-র নিকট হইতে এই মর্মে তারবার্তা পান। নোয়াখালির পল্লী-অঞ্চলে লুণ্ঠন, অগ্নিকাণ্ড ও অন্যান্য নির্যাতনের সংবাদে মহাত্মাজী বিচলিত হইয়া পড়েন। গান্ধীজী অবিলম্বে নোয়াখালির অবস্থার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বাংলার প্রধান মন্ত্রী মিঃ সুরাবর্দীর নিকট এবং শ্রীযুক্ত সতীশ দাশগুপ্ত ও শ্রীযুক্ত হারানচন্দ্র ঘোষকে অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা অবলম্বনের নির্দেশ দিয়া নিম্নোক্ত তারবার্তাগুলি প্রেরণ করেন :—

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাশগুপ্তের নিকট তার :

"আপনার এবং হারানবাবুর নিকট হইতে সংক্ষিপ্ত অথচ মর্মভেদী তারবার্তা পাইলাম। অবস্থা যেরূপ মনে হইতেছে, তাহাতে সকলকে ঐ স্থান ত্যাগ করিতে হইবে, না হয় ধর্মোন্মত্ততার আগুনে পুড়িয়া মরিতে হইবে। আশা করি, ইতিকর্তব্য সম্পর্কে উপদেশ দিতে আমাকে নোয়াখালি যাইতে অনুরোধ করিবেন না। কর্মীদের সহিত পরামর্শ করিয়া দ্রুত ব্যবস্থা অবলম্বন করুন।"

শ্রীযুক্ত হারান চৌধুরীর নিকট তার :

"আপনি যাহা জানাইয়াছেন, তাহা সত্য হইলে হয় ব্যাপকভাবে সকলকে ঐ স্থান ত্যাগ করিতে হইবে, না হয় উন্মত্ততা ও ধর্মোন্মাদনার আগুনে পুড়িয়া মরিতে হইবে। সতীশবাবুর সহিত পরামর্শ করিয়া মিলিয়া মিশিয়া কাজ করুন।—গান্ধী"

বাংলার প্রধান মন্ত্রীর নিকট মহাত্মাজীর তার :

"নোয়াখালিতে বেআইনী কার্যকলাপ বৃদ্ধির বেদনাদায়ক বহু তার পাইতেছি—শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাশগুপ্তের তারের প্রতি আপনার আশু মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি এবং ঐ বিষয়ে দ্রুত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে আপনাকে অনুরোধ করিতেছি। আমি তারগুলি প্রকাশার্থ ছাড়িয়া দিতেছি।
—গান্ধী"

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত এবং শ্রীযুক্ত হারানচন্দ্র ঘোষ গান্ধীজীর নিকট যে সমস্ত তারবার্তা প্রেরণ করিয়াছিলেন, বাংলা সরকার তাহা প্রকাশ নিষিদ্ধ করিয়া দেন। গান্ধীজী উক্ত তারসমূহের যে সকল উত্তর দেন তাহার প্রকাশও নিষিদ্ধ করিয়া দেওয়া হয়।

সরকারী দপ্তরখানায় নোয়াখালি জেলার সরকারী কর্মচারীদের সহিত এক বৈঠক শেষ করিয়া সেখান হইতে বাহির হইয়া আসিয়া প্রধান মন্ত্রী মিঃ এইচ. এস. সুরাবর্দী সংবাদপত্রে এক বিবৃতি দেন। এই বিবৃতিতে মিঃ সুরাবর্দী বলেন, "আমি এ কথা জানিয়া আনন্দিত হইয়াছি যে, নোয়াখালির অবস্থা অতিশয় বিপজ্জনক বলিয়া যে সকল কথা ধরিয়া লওয়া হইয়াছে তাহা বাস্তবিকই সেরূপ বলিয়া মনে করিবার কোনই কারণ নাই।" মিঃ সুরাবর্দী বলেন, "নোয়াখালির সরকারী কর্মচারীরা তাঁহাদের কর্তব্য বেশ ভালভাবেই বোঝেন। অবস্থা যাহাতে খারাপের দিকে না যায় সেদিকে তাঁহারা সর্বদা সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়াছেন; কিন্তু ইহাই নহে, রাজনৈতিক নেতাদের নিকট নোয়াখালির অবস্থা যাহাতে একটা খেলার বস্তু না হইয়া দাঁড়ায় আমাদিগকে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।"

মিঃ সুরাবর্দী আরও বলেন যে, নোয়াখালির অবস্থা জানাইয়া গান্ধীজীর নিকট যে টেলিগ্রামগুলি প্রেরণ করা হইয়াছিল, সেগুলি প্রকাশ করিবার ফলেই কলিকাতায় অবস্থার অবনতি ঘটিয়াছে।

মহাত্মা গান্ধী মিঃ সুরাবর্দীর বিবৃতি পাঠ করিয়া অত্যন্ত মর্মাহত হন। তিনি দিল্লীতে প্রার্থনান্তিক ভাষণে ইহার উল্লেখ করিয়া বলেন, ইহাতে আমি অত্যন্ত মর্মাহত হইয়াছি। ব্যাখ্যাটি একেবারেই ভুল। টেলিগ্রামগুলিকে এজন্য দায়ী করা শহীদসাহেবের পক্ষে নিতান্তই অসঙ্গত হইয়াছে।

গান্ধীজী বলেন, "মানুষের কর্তব্য হইতেছে যদি তাহার কোন বন্ধুর সম্পর্কে কোন সন্দেহ থাকে তবে তাহা প্রকাশ করা। আমি সতীশবাবুর টেলিগ্রামগুলি সংবাদপত্রে প্রকাশার্থ দিয়াছিলাম, কারণ আমার দৃঢ় বিশ্বাস, সতীশবাবু কোন অবস্থাতেই সত্যের অপলাপ করিবেন না। নোয়াখালির সংবাদ যদি মিথ্যাই হইয়া থাকে, তবে তাহা প্রমাণের ভার তো শহীদসাহেবেরই হাতে। তাহা না করিয়া খবরটি সংবাদপত্রে প্রকাশ করাতেই দাঙ্গা হইতেছে এরূপ মিথ্যা বিবৃতি দেওয়া মিঃ সুরাবর্দীর পক্ষে নিতান্তই অন্যায় হইয়াছে। আমি একজন সত্যাগ্রহী, সুতরাং আমি কোন অবস্থাতেই সত্যকে পরিত্যাগ করিতে পারি না। কাহারও

প্রতি কোন সন্দেহ পোষণ বা অন্তরে কোন অভিযোগ পুষিয়া রাখাও আমার পক্ষে সম্ভব নহে। বাংলার প্রধান মন্ত্রীর সাহায্য ব্যতীত বাংলার হিন্দু বা মুসলমান কোন পক্ষেরই সেবা করা আমার পক্ষে সম্ভব নহে। আশা করি, প্রধান মন্ত্রী আমাকে সে সাহায্যদান হইতে বিরত হইবেন না। তিনি নিজে কাহাকেও প্রকৃত পথের সন্ধান দিতে বিরত থাকিতে পারেন না।

৯ই এপ্রিল দিল্লীতে প্রার্থনার পর গান্ধীজী নোয়াখালির অবস্থা সম্পর্কে মিঃ সুরাবর্দীর মনোভাবে দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলেন যে, নোয়াখালির অবস্থার ক্রমাবনতি সম্পর্কে শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত ও শ্রীযুক্ত হারানচন্দ্র ঘোষের মত নিঃস্বার্থ কর্মীদের প্রেরিত সংবাদে আস্থা স্থাপন না করিয়া সরকারী কর্মচারীদের বিবরণের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া থাকা বাংলার প্রধান মন্ত্রী মিঃ সুরাবর্দীর পক্ষে উপযুক্ত কাজ হয় নাই।

গান্ধীজী আরও বলেন যে, মিঃ সুরাবর্দীর মত যদি তিনি উচ্চপদে সমাসীন থাকিতেন, তাহা হইলে স্বার্থলেশহীন ও অবৈতনিক কর্মীদের প্রদত্ত বিবরণের সহিত সরকারী কর্মচারীদের বিবরণ সামঞ্জস্যপূর্ণ না হইলে তিনি তাহাদের সমর্থন করিতেন না; অধিকন্তু তিনি তাহাদের ভর্ৎসনাও করিতেন।

১৪ই এপ্রিল—নোয়াখালির পরিস্থিতি সম্পর্কে বাংলার প্রধান মন্ত্রী যে বিবৃতি প্রদান করেন উহার প্রতিবাদে কাজিরখিল গান্ধী শিবির হইতে শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত এই মর্মে এক বিবৃতি প্রচার করেন যে, জেলাকর্তৃপক্ষের রিপোর্ট সত্ত্বেও নোয়াখালি জেলায় গৃহে অগ্নিসংযোগ, বয়কট ও ভীতিপ্রদর্শন চলিতেছে। শ্রীযুক্ত দাশগুপ্ত ১৪ই ফেব্রুয়ারি হইতে সে পর্যন্ত ৯৩টি ঘটনার বিবরণ পুলিস সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের নিকট পেশ করেন।

বিবৃতিতে শ্রীযুক্ত দাশগুপ্ত ইহাও উল্লেখ করেন যে, জানা যায়, অক্টোবর দাঙ্গার দায়ে অভিযুক্ত অধিকাংশ ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা পরিচালিত হইবে না। ফেরার আসামীরা অবাধে নানাবিধ দুষ্কার্য চালাইতেছে।

কাজিরখিল ক্যাম্প হইতে শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত নিম্নোক্ত বিবৃতি প্রচার করেন :—

"এ পর্যন্ত সংবাদপত্রে কোন বিবৃতি প্রদান হইতে আমি বিরত ছিলাম। নোয়াখালি ঘটনার প্রকৃত তথ্যাদি সংগ্রহের পর উহা আমি স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ও বাংলার প্রধান মন্ত্রীর নিকট প্রেরণ করিতাম। উহার একখানি নকল গান্ধীজীর

নিকটও প্রেরিত হইত। পূর্বাপর আমি এই নীতিই অনুসরণ করিতেছি এবং গভর্নমেণ্ট যাহাতে নির্বিঘ্নে কাজ করিতে সমর্থ হয়, তজ্জন্য আমি কোন বিবৃতি প্রচার করি নাই।

কিন্তু বিগত শনিবার প্রধান মন্ত্রী যে বিবৃতি প্রচার করিয়াছেন, উহার একটা উত্তর প্রদান করা অবশ্য কর্তব্য। সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য, আমি রিপোর্ট প্রেরণ করি, এই মর্মে তিনি একটা ভ্রান্ত বিবৃতি প্রচার করিয়াছেন। প্রধান মন্ত্রীর জেলা-কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে রিপোর্ট প্রাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও নোয়াখালিতে গৃহে অগ্নিসংযোগ, বয়কট ও ভীতিপ্রদর্শন চলিতেছে। হিন্দুরা নোয়াখালিতে বসবাস করুক ইহাই আমাদের কাম্য। সুতরাং আতঙ্ক-প্রচার আমার পরিকল্পনাবিরুদ্ধ।

বাংলার প্রধান মন্ত্রী ও গান্ধীজীর নিকট প্রেরিত তারবার্তায় আমি প্রকৃত ঘটনার বিবরণ মাত্র প্রদান করিয়াছি। প্রধান মন্ত্রী উক্ত ঘটনাবলী মিথ্যা বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। কিন্তু আমি তাঁহার এই মতে সায় দিতে পারি না। গত ১৪ই ফেব্রুয়ারি হইতে এ পর্যন্ত আমি পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট ৯৩টি ঘটনার বিবরণ পেশ করিয়াছি। বিশেষভাবে অনুধাবন ও তদন্তের পর এই সমস্ত ঘটনা সম্পর্কে ব্যবস্থা অবলম্বন আবশ্যক। ইহা ব্যতীত, এই সমস্ত ঘটনা হইতে নোয়াখালি জেলার সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতির গতি কোন্ দিকে তাহার আভাস পাওয়া যায়।

প্রকাশ, গত অক্টোবর দাঙ্গার দায়ে অভিযুক্ত অধিকাংশ আসামীর বিরুদ্ধে মামলা পরিচালিত হইবে না। ইহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য ও উদ্বিগ্নকর সংবাদ। ফেরার আসামীরা ইতস্ততঃ চলাফেরা করিতেছে এবং নানাবিধ দুষ্কার্য চালাইতেছে। ইহাদের কার্যকলাপে বাধা দেওয়া আবশ্যক।

গঠনমূলক কার্য পরিচালনায় বিশেষ দক্ষ ও খ্যাতিসম্পন্ন বাংলার কয়েকজন কর্মী গান্ধী-শিবিরে কাজ করিতেছেন। তাঁহাদের সঙ্গে সেবাগ্রাম হইতে আগত গান্ধীজীর অনুচরগণ এবং কর্নেল জীবন সিংহও আছেন। বিভিন্ন স্থানের বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে আমাদের সকলের অভিমত এক। আমরা আমাদের কাজ চালাইয়া যাইবার আশা রাখি এবং আশা করি বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও জনসাধারণ অবিচলিত থাকিবে এবং মনোবল হারাইবে না।

প্রধান মন্ত্রী কর্তৃক বিবৃতি প্রদত্ত হওয়া সত্ত্বেও গান্ধীজী বিহারের কাজ করুন ইহাই যদি তাঁহার কাম্য হয়, তাহা হইলে সরকারী নীতি পরিবর্তিত হইবে বলিয়া আমি আশা করি।”

নোয়াখালির প্রকৃত অবস্থা

অধ্যাপক শ্রীনির্মল বসুর বিবৃতি

২রা মে তারিখে 'মর্নিং নিউজে' নোয়াখালিতে শান্তি ও শৃঙ্খলার তখনকার অবস্থা সম্পর্কে বিহার ব্যবস্থা পরিষদের মুসলিম লীগ দলের চীপ হুইপ সৈয়দ মোজাহার ইমামের পাটনা হইতে ১লা মে তারিখে প্রদত্ত এক বিবৃতির উত্তরে অধ্যাপক শ্রীনির্মল বসু যে তথ্যবহুল বিবৃতি দেন তাহা হইতে নোয়াখালির প্রকৃত অবস্থা যে কি, তাহা উপলব্ধি করা যায়। অধ্যাপক বসু কাহাকেও আক্রমণের উদ্দেশ্য লইয়া এই বিবৃতি দেন নাই। তিনি সমস্ত বিষয়টি নিরপেক্ষভাবে বিচার করিয়া প্রকৃত সমস্যাটা যে কোথায় এবং কি পদ্ধতিতে কাজ করিলে প্রতিকার সম্ভব তাহার পথ নির্দেশ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। নোয়াখালি ভ্রমণকালে গান্ধীজীর সেক্রেটারী হিসাবে সমস্ত তথ্যাদি ও খুঁটিনাটি বিষয় অবগত থাকিয়া পূর্ববঙ্গের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে যে বিপুল অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছেন তাঁহার সেই অভিজ্ঞতা-সঞ্জাত বিবৃতির একটা বিশেষ গুরুত্ব আছে। তাহা ছাড়া, এই বিবৃতি দেওয়ার পূর্বেও তিনি নোয়াখালিতে ছিলেন এবং নোয়াখালির প্রকৃত অবস্থা তখন পর্যন্ত যে কি রূপ পরিগ্রহ করিয়াছিল সে সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা তাঁহার ছিল।

সংবাদপত্রে যে বিবৃতি প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা নিম্নে দেওয়া হইল:

২রা মে তারিখের 'মর্নিং নিউজে' নোয়াখালিতে শান্তি ও শৃঙ্খলার বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে বিহার ব্যবস্থা পরিষদের মুসলিম লীগ দলের চীফ হুইপ সৈয়দ মোজাহার ইমামের পাটনা হইতে ১লা মে তারিখে প্রদত্ত এক বিবৃতি প্রকাশিত হইয়াছে। এই বিবৃতির কিছুটা অংশ পরোক্ষ উক্তিতে বিবরণ হিসাবে প্রকাশ করা হইয়াছে আর বাকীটা প্রত্যক্ষ উক্তিতেই প্রকাশ করা হইয়াছে। এই বিবরণ সত্য বলিয়া ধরিয়া লইলে জনসাধারণের মনে ইহা হইতে যে ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টি হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে, তাহা অপনোদনের জন্য কয়েকটি বিষয় গোচরে আনা প্রয়োজন। স্বচক্ষে দেখা এবং প্রমাণিত তথ্যাদি হইতে প্রত্যেকেরই নিজ নিজ মতামত গঠন করিবার অধিকার রহিয়াছে। মিঃ ইমামের নিজ মতামতের প্রতিবাদ করা আমার উদ্দেশ্য নহে। কিন্তু যেখানে তিনি তাঁহার নিজের তথ্য প্রমাণ হিসাবে আমার নাম বা আমার উক্তি বিকৃতভাবে ব্যবহার করিয়াছেন, সেখানেই তাহা সংশোধন করিয়া দেওয়া আমার প্রয়োজন। শুধুমাত্র

ব্যক্তিগত ব্যাপার হইলে ইহার প্রয়োজন হইত না, কিন্তু আলোচ্য বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং জনসাধারণও এই সম্পর্কে আমার বক্তব্য দাবি করিতে পারে।

প্রথমেই আমি উল্লেখ করিতে চাই যে, সৈয়দ মামুদ ২২শে এপ্রিল তারিখে কাজিরখিল গান্ধী ক্যাম্পে আসিয়া পৌছেন। তাঁহার সহিত মিঃ ইমাম ও বাংলার প্রধান মন্ত্রীর সেক্রেটারী মিঃ মাসুদ আসেন। তাঁহারা বিকাল প্রায় ৫টার সময় বিমানঘাঁটি হইতে সোজা গান্ধী ক্যাম্পে চলিয়া আসেন এবং ২৪শে তারিখ সকাল ৭টায় তাঁহারা যান। ডাঃ মাসুদ নোয়াখালির উপদ্রুত অঞ্চলে মোট ৩৮ ঘণ্টা অতিবাহিত করেন, ইহার মধ্যে দুই রাত্রির বিশ্রামের সময়ও রহিয়াছে। তাঁহারা সাহায্য ও পুনর্বসতি-কার্যে নিরত সেচ্ছাসেবক, সরকারী কর্মচারী এবং মুসলমান সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট লোকজনের সহিত আলাপ-আলোচনা করেন এবং ইহাতেই অধিকাংশ সময় কাটিয়া যায়। ২৩শে তারিখ অপরাহ্ণে প্রায় তিন ঘণ্টাকাল ধরিয়া সভা হয়। এইদিন সকালেও গান্ধী ক্যাম্প হইতে অর্ধ মাইল দূরে অবস্থিত দাঙ্গাবিধ্বস্ত নন্দনপুর গ্রাম পরিদর্শন করিতে প্রায় দেড় ঘণ্টা লাগে। মাত্র এই সময়টুকু তাঁহারা উপদ্রুত অঞ্চল পরিদর্শন এবং দাঙ্গা-দুর্গতদের গৃহে গিয়া আলাপ-আলোচনা করেন। মিঃ ইমামের বিবৃতি হইতেই জানা যায় যে, অবশিষ্ট সংবাদ তিনি থানা ও রিলিফ অফিসারের নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

আমার মনে হয় যে, তাঁহারা উপদ্রুত অঞ্চল পরিদর্শন এবং আলাপ-আলোচনায় ঠিক কত সময় অতিবাহিত করিয়াছিলেন তাহা জানা প্রয়োজন, কারণ মিঃ ইমামের বিবৃতি দেখিয়া স্বভাবতঃই ধারণা হইতে পারে যে, এই উদ্দেশ্যে তাঁহার দীর্ঘকাল লাগিয়াছিল। আমার মত এই যে, মতামত গঠনের পক্ষে এই সময় যথেষ্ট নহে। উপরন্তু ডাঃ মাসুদ ও মিঃ ইমামকে একটা বড় অসুবিধার মধ্যে কাজ করিতে হইয়াছিল—তাঁহাদের কাহারও বাংলা ভাষা জানা ছিল না। কাজেই সভায় এক ঘণ্টা ধরিয়া বাংলায় যে বিতর্ক চলিয়াছিল তাহা তাঁহারা ভাল করিয়া বুঝিতে পারেন নাই এবং মিঃ মাসুদ, পুলিস সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মিঃ খান বাংলায় বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

সভায় যে বিতর্ক হইয়াছিল অন্ততঃ তাহার কিছুটা পাঠকদের গোচরীভূত করা প্রয়োজন। রামগঞ্জ থানার অন্তর্গত কয়েকটি ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট ডাঃ মাসুদকে বুঝাইবার চেষ্টা করেন যে, বর্তমানে যে সকল চুরি,

ডাকাতি, গৃহদাহ প্রভৃতি ঘটিতেছে তাহাতে শুধু হিন্দুরাই উৎপীড়িত হইতেছে না এবং বর্তমানের অর্থনৈতিক সঙ্কটের দরুনই চুরিডাকাতির সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। তখন আমি সভাপতির অনুমতি লইয়া মুসলমানদের একজন বিশিষ্ট নেতা হাজি এরসাদ মিঞাকে প্রশ্ন করি যে, কাহারা এই সকল অপরাধের জন্য দায়ী। উত্তরে হাজিসাহেব ঠিকই বলেন যে, কয়েকজন দুর্বৃত্ত গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া হিন্দু ও মুসলমানদের ক্ষতি করিতেছে। পুলিস উহাদিগকে গ্রেপ্তার করে নাই কেন প্রশ্ন করা হইলে তিনি উত্তর দেন, হিন্দুরা নিরপরাধ বিশিষ্ট মুসলমান নেতাদের বিরুদ্ধে এজাহার দিয়াছে। হয় তাহারা না জানিয়া, আর না হয় ভয় পাইয়া প্রকৃত দুষ্কৃতকারীদের নামোল্লেখ করে নাই। সেবাকার্যে রত কর্মীরাও জানেন যে, যে সকল ঘটনা পুলিসের গোচরে আনা হইয়াছিল পুলিস তৎপরতার সহিত তাহার সবগুলিই ডায়েরী করে নাই বা তদন্ত করে নাই। কারণ পুলিস সুপার নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে, তাঁহাদের সকল কর্মচারীকেই অতিরিক্ত খাটুনি খাটিতে হইতেছে। সুতরাং থানায় লিখিত ঘটনাবলী হইতেই নোয়াখালির প্রকৃত অবস্থা নির্ণয় করা সম্ভব নহে। যাহা হউক, আমি হাজিসাহেবকে পুনরায় প্রশ্ন করি যে, যাহারা গ্রামে গ্রামে উপদ্রব করিয়া বেড়াইতেছে তাহাদের নাম তিনি জানেন কি না এবং তাহাদিগকে পুলিসের হাতে ধরাইয়া দেওয়া যায় কিনা। কিরূপে ইহা করা যাইতে পারে হাজিসাহেব তাহা বলিতে পারিলেন না, তবে তিনি স্বীকার করিলেন যে, নোয়াখালির কয়েকটি থানায় এখনও উপদ্রব চলিতেছে। তিনি আরও বলেন যে, হাঙ্গামার সময় হিন্দুরা ভীষণভাবে অত্যাচারিত হইয়াছে। একজন বক্তা বলেন, যেন আকাশ হইতে একটা বাজ পড়িল, তাহাতে বহু গৃহ ভস্মীভূত হইয়া গেল। তাহাদের মন এখনও আতঙ্কগ্রস্ত। শান্তিপূর্ণ গ্রামে স্বাভাবিক কারণে গৃহে আগুন লাগিলেও তাহারা ভীত হইয়া পড়ে। ইহাতে পুনর্বসতির কাজ আরও কঠিন হইয়া উঠিতেছে।

পরিশেষে ইউনিয়ন বোর্ডর প্রেসিডেণ্টগণ এবং স্থানীয় মুসলিম নেতৃবৃন্দ বলেন যে, হাঙ্গামা-পীড়িতদের মনের আতঙ্কভাব দূর করিতে হইলে কঠোর পরিশ্রম করিতে হইবে। পুনর্বসতি সম্পর্কে আমি শ্রীসতীশ দাশগুপ্ত ও অন্যান্য কর্মীদের তরফ হইতে প্রস্তাব করি যে, (১) জেলার সর্বত্র হিন্দু-মুসলমানের যুক্তসভা করিয়া বুঝাইয়া দিতে হইবে যে, কংগ্রেস ও লীগ শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরাইয়া আনিতে চাহেন। (২) চুরি, ডাকাতি, গৃহদাহ বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে

গ্রাম পাহারা দিবার জন্য হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়ের শান্তিকামী লোকদের লইয়া যুক্ত আত্মরক্ষা-দল গঠন করিতে হইবে। ছোটখাট চুরি, ভীতিপ্রদর্শন প্রভৃতি যে সকল অপরাধ পুলিসের গ্রহণযোগ্য নহে তাহা ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট শান্তিদলের সাহায্যে মিটাইয়া ফেলিবার চেষ্টা করিবেন। গুরুতর ধরনের অভিযোগগুলি পুলিসের গোচরে আনিতে হইবে। (৩) হিন্দু ও মুসলমান যুবকগণকে পুষ্করিণী পরিষ্কার করা, রাস্তাঘাট নির্মাণ, কচুরিপানা ধ্বংস প্রভৃতি পল্লীসংস্কার-কার্যে মনোনিবেশ করিতে হইবে। ইহাতে পল্লী-উন্নয়নের মধ্য দিয়া উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতির বন্ধন দৃঢ় হইবে। তবে আপাততঃ এই তিনটি প্রস্তাবগ্রহণে সভার সম্মতি পাওয়া গেল না। স্থির হইল যে, শান্তিস্থাপনের উদ্দেশ্যে যুক্তসভার অনুষ্ঠান করা হইবে।

মিঃ ইমামের বিবৃতি হইতে মনে হয় যে, বাংলা জানা না থাকায় জনসভায় আলোচনার ধারা তাঁহারা মোটেই ধরিতে পারেন নাই। যে সকল দুর্বৃত্ত ও সমাজবিরোধী লোক উপদ্রব করিয়া সদ্য-প্রত্যাগত দুর্গতদের মনে আতঙ্ক জাগাইয়া রাখিতেছে তাহাদিগকে ধরিবার উদ্দেশ্য লইয়া হিন্দু বাঙালীরা মুসলমানদের সাহায্য লইয়া কাজ করিতেছে; সেবাকার্যে রত হিন্দু-কর্মীদের দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হইল সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের লোকদিগকে পুনর্বসতিকার্যে সাহায্য করিবার জন্য অগ্রসর হইয়া আসিতে উৎসাহিত করা। নোয়াখালিতে থাকিবার সময় গান্ধীজী প্রায়ই বলিতেন যে, অপরাধীরা যাহাতে সাহসভরে জনসাধারণের সম্মুখে আসিয়া অপরাধ স্বীকার করে এবং তাহাদের সাময়িক উন্মত্ততার জন্য সমাজ যে শাস্তির বিধান দেয় তাহা মানিয়া লয়, তজ্জন্য মুসলমান-ভাইদের সাহায্য করিতে হইবে। তিনি আরও বলিতেন যে, মুসলমানদিগকে যতদূর সম্ভব অর্থ দিয়া বা শারীরিক পরিশ্রম করিয়া দরিদ্রের পুনর্বসতি-কার্যে সাহায্য করিতে হইবে। তবে দুঃখের বিষয় এই যে, আন্তরিক হইলেও মৌখিকভাবে নিরাপত্তার আশ্বাস দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু মুসলমান সমাজ কার্যকরীভাবে সাহায্যে অগ্রসর হইয়া আসেন নাই। বাংলার আবহাওয়ার গুণই এই যে, শান্তির জন্য আন্তরিক তীব্র বাসনা জাগিলেও তাহা মনেই থাকিয়া যায়, কার্যে পরিণত হয় না। স্বাভাবিক বা অস্বাভাবিক সর্বপ্রকার অরাজকতা দমন করিবার এবং পুনর্বসতি-কার্য ত্বরান্বিত করিবার উদ্দেশ্যে কর্মীরা মুসলমান সম্প্রদায়ের সহযোগিতা লাভের জন্য বিশেষভাবে আগ্রহান্বিত। কিন্তু এখন পর্যন্ত তাঁহারা আগ্রহ প্রকাশ করেন নাই। তাঁহারা হিন্দু-কর্মীদের সহিত যোগ

দিয়া যুক্ত প্রচেষ্টায় কার্য সম্পন্ন করা অপেক্ষা সরকারের সাহায্যের মুখাপেক্ষী হইবার পক্ষপাতী। সকলেই জানেন যে, সরকারকেও বহু দিক দিয়া অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হইতেছে। যেখানে ৫ লক্ষ শীট টিন প্রয়োজন সেখানে মাত্র ৫০ হাজার শীট পাওয়া যাইতেছে। ভালভাবে বিলিও করা হইতেছে না। যেখানে ৫০টি শীট প্রয়োজন, সরকার সেখানে নিয়ন্ত্রিত মূল্যে মাত্র ২০ শীট টিন দিতেছে এবং অনেক পরিবার আবার তাহাও পাইতেছে না। যাহারা পাইতেছে তাহারা দেখিতেছে যে প্রয়োজনের তুলনায় উহা অনেক কম। অরাজকতাও বিদ্যমান রহিয়াছে।

উপদ্রুত অঞ্চলে নিয়ন্ত্রিত মূল্যে চাউল সরবরাহ করা বন্ধ করিয়া দেওয়ায় চাউল ২৫৲ টাকা মণ দরে বিক্রয় হইতেছে। ফলে যে বেশী টাকা দিতেছে তাহার নিকটে টিন বিক্রয় করিয়া দিয়া নিরাপদ স্থানে চলিয়া যাইতেছে আর না হয় সেই টাকা দিয়া চোরাবাজার হইতে চাউল ক্রয় করিতেছে। মিঃ ইমামের উল্লিখিত এই অপব্যবহার মানুষের (এ ক্ষেত্রে বর্ণহিন্দুদের) স্বভাবগত দুষ্প্রবৃত্তির দরুন নহে—সরকারের অযোগ্যতা এবং অদূরদর্শিতাই ইহার কারণ। বাস্তত্যাগীদিগকে নগদ টাকা না দিয়া ঘরবাড়ীনির্মাণের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি দিবার জন্য গান্ধীজী সরকারকে পরামর্শ দিয়াছিলেন। তবে এই সকল দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে পাওয়া না গেলে দরিদ্র কৃষক মজুরদিগকেই প্রথমে সাহায্য দেওয়া উচিত, কারণ অবস্থাসম্পন্ন বাস্তত্যাগী অপেক্ষা উহাদের পুনর্বসতিই অধিক প্রয়োজন। কিন্তু মাল না পাওয়ায় সরকার প্রায়ই নগদ টাকা দিতেছেন। কাজেই বর্তমান অবস্থায়ও যাহাদের অন্যত্র যাইবার ঠাঁই নাই, কেবলমাত্র তাহারাই ঘরবাড়ী নির্মাণ করিতেছে। শুধুমাত্র আন্তরিক সহানুভূতি ব্যতীত যদি কার্যকরী ভাবে মুসলমানদের সাহায্য পাওয়া যাইত, তবে ব্যাপারটা অনেক সহজ হইয়া যাইত। কিন্তু হিন্দু-কর্মীরা এজন্য এযাবৎ ব্যর্থ চেষ্টা করিয়া আসিয়াছেন মাত্র।

মিঃ ইমামের বিবৃতিতে এমন কতকগুলি বিষয়ের উল্লেখ আছে যে, সে সম্পর্কে মন্তব্য করার কোন প্রয়োজন হয় না; তিনি প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, বাংলার লীগ মন্ত্রিসভা আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছেন কিন্তু বিহারের কংগ্রেস মন্ত্রিসভা লক্ষ লক্ষ বিহারী দুর্গতদের প্রতি অবহেলা করিতেছেন এবং এ যাবৎ উল্লেখযোগ্য কিছুই করেন নাই। আমরা কংগ্রেস বা লীগ মন্ত্রিসভার মধ্যে কোন পার্থক্য করিতে চাহি না। আমরা চাই যে, বাংলা ও বিহারের বাস্ত-

ত্যাগীরা নির্ভয়ে তাহাদের পিতৃপুরুষের পুরাতন গৃহে গিয়া বসবাস করুক এবং দুর্বৃত্তদমনে পুলিসের সাহায্য চাহিতে তাহারা ভীত হইবে না (নোয়াখালিতে এই অবস্থা অবর্তমান)। আমরা চাই যে, কাজ যত কঠিনই হউক না কেন সর্বপ্রকার অরাজকতা সরকারকে দমন করিতে হইবে; জনসাধারণের মনে বিশ্বাস ফিরাইয়া আনিতে হইবে এবং তাঁতি, জোলা, শ্রমিক, কৃষক সকলকে তাঁহাদের নিজ নিজ গৃহে পুনরায় অধিষ্ঠিত করিতে হইবে। আমরা আশা করি যে, হিন্দু-মুসলমান সকল অধিবাসীই ইউনিয়ন বোর্ড ও পুলিসের সহায়তায় সমাজ-বিরোধী ও অরাজকতা-সৃষ্টিকারীদের ধরাইয়া দিবে। ইহাতে দুর্গতদের মন হইতে ভীতি দূর হইয়া যাইবে। আমরা আশা করি যে, শান্তিকামীদের মহান প্রচেষ্টায় প্রতিটি গ্রাম আবার সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠুক। মিঃ ইমাম কংগ্রেসকর্মীদের প্রতি দুই-একটি কটাক্ষ করিয়াছেন। আমি তাঁহার সহিত বিবাদ করিতে চাহি না। আমি তাঁহার নিকট হইতে ইহাই আশা করি যে, নোয়াখালির মুসলমানদের মধ্যে শান্তিস্থাপনের যে আন্তরিক আগ্রহ রহিয়াছে তাহা কার্যে পরিণত করিবার জন্য তিনি কার্যকরীভাবে সাহায্য করিবেন।

নোয়াখালি জেলার ভৌগোলিক বৃত্তান্ত

নোয়াখালি জেলা বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত এবং চট্টগ্রাম বিভাগের অন্তর্ভুক্ত। এই জেলার উত্তরে ত্রিপুরা, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর, পূর্বে চট্টগ্রাম ও পশ্চিমে বাখরগঞ্জ জেলা। আয়তনে নোয়াখালির পরিমাণ ১৬৫৮ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা মোট ২২,১৫,১২৮; তন্মধ্যে ৪,১১,২৯১ জন হিন্দু এবং ১৮,০৮৩,৩৭ জন মুসলমান। হাতিয়া, সন্দীপ, গাজিচর, নলচিরা, চরসিদ্ধি প্রভৃতি দ্বীপগুলি এই জেলার অন্তর্গত। মেঘনা, ফেণী, মুহরী, ডাকাতিয়া প্রভৃতি নদনদী এই জেলার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইতেছে।

নোয়াখালি দুইটি মহকুমায় বিভক্ত, যথা—নোয়াখালি (সদর) এবং ফেণী। সদর ও ফেণী মহকুমার আয়তন যথাক্রমে ১,৩১২ ও ৩৪৬ বর্গমাইল। রায়পুরা, লক্ষ্মীপুর, রামগঞ্জ, বেগমগঞ্জ, সেনবাগ, সুধারাম কোম্পানিগঞ্জ, রামগতি, হাতিয়া ও সন্দীপ এই দশটি থানা সদর মহকুমার অন্তর্গত। ফেণী, সোনাগাজি, ছাগলনাইয়া ও পরশুরাম,—এই চারটি থানা লইয়া ফেণী মহকুমা গঠিত। ১,২৪৬টি ও ৪৯২টি গ্রাম যথাক্রমে সদর ও ফেণী মহকুমায় অবস্থিত।

নোয়াখালি জেলায় রেলপথ বিশেষ নাই। ত্রিপুরা জেলার সহিত সুধারাম

(নোয়াখালির শহর) এবং ফেণী শহরের সহিত ত্রিপুরা জেলা, ত্রিপুরা রাজ্য ও চট্টগ্রাম রেলপথ দ্বারা সংযুক্ত। কাঁচা রাস্তাও জেলায় প্রয়োজনানুসারে কম। দ্বীপের মধ্যে সন্দীপ, চরবেলে, টুমচর, চরবারখিরী, চর নলচিরা, চর আমানুল্লা ও চর লরেন্স প্রধান স্থলভাগের সহিত জলপথ দ্বারা এবং লামচর, লক্ষ্মীপুর, নোয়াখালি শহর, কোম্পানিগঞ্জ, সোনাগাজি, ফেণী, চৌমুহনী, সোনাইমুড়ী প্রভৃতি স্থান স্থলপথ দ্বারা সংযুক্ত।

ভবানীগঞ্জ, লক্ষ্মীপুর, রামপুর, চৌমুহনী ও নোয়াখালি শহর বাণিজ্যপ্রধান স্থান। সুধারাম জেলার প্রধান নগর। ফেণীতে একটি কলেজ আছে। মেহারের কালীবাড়ি হিন্দুদের একটি সুপ্রসিদ্ধ তীর্থস্থান।

নোয়াখালি জেলার জমি খুব উর্বর। ধান, নারিকেল, সুপারি প্রভৃতি কৃষিজাত দ্রব্য। অধিবাসীদের প্রধান উপজীবিকা কৃষি।

নোয়াখালি ও ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত থানাসমূহের লোকসংখ্যা

ও

শতকরা মুসলমান জনসংখ্যা (১৯৪১ সালে)

—— ঃ০ঃ ——

নোয়াখালি জেলা

নাম	মোট জনসংখ্যা	মুসলমান জনসংখ্যা	শতকরা মুসলমান জনসংখ্যা
নোয়াখালি জেলা	২২১৭৪০২	১৮০৩৯৩৭	৮১·৩৫
সদর মহকুমা	১৭১৪৭২৮	১৪১৯৩৫৪	৮২·৭৭
রায়পুরা	১০৭৪৫৩	৯৬১৭৪	৮৯ ৫০
লক্ষ্মীপুর	২৬১৮৩	২২১৭৬৫	৮৪ ৭০
রামগঞ্জ	২৪৫৫৩৮	১৯৭৭০৭	৮০·৫২
বেগমগঞ্জ	৩৩৪৩৩৩	২৬৫৩৯৯	৭৯·৩৮
সেনবাগ	৮৯৮৩৯	৭৬০৮৫	৮৪·৬৯
সুধারাম	২১৬২৮৯	১৮২৭৩৬	৮৪·৪৯
কোম্পানিগঞ্জ	৭৭৮৫৬	৬৪২৩৪	৮২·৫০
রামগতি	৯৭৮৪৫	৮৯০৬৫	৯১·০৩
হাতিয়া	১০৫৫৫৫	৮৬৮৬৪	৮২·২৯
সন্দীপ	১৭৮১৮৫	১৩৯৩২৫	৭৮·১৯
ফেণী মহকুমা	৫০২৬৭৪	৩৮৪৫৮৩	৭৬·৫১
ফেণী থানা	২২৫১৩৮	১৮১৮৭৭	৮০·৭৮
সোনাগাজি	৯৩৬৩৭	৭৪৩৬৪	৭৯·৪২
ছাগলনাইয়া	১২৪৯৯৩	৯৪৯৪৫	৭৫·৯৬
পরশুরাম	৫৮৯০৬	৩৩৩৯৭	৫৬·৭০

ত্রিপুরা জেলা

নাম	মোট জনসংখ্যা	মুসলমান জনসংখ্যা	শতকরা মুসলমান জনসংখ্যা
ত্রিপুরা জেলা	৩৮৬০১৩৯	২৯৭৫৯০১	৭৭·০৯
ব্রাহ্মণবেড়িয়া মহকুমা	১০৩৯৮০৩	৭১২৪৭০	৬৮·৫২
নাসিনগর থানা	১২৩২১৮	৭৪৫৪৯	৬০ ৫০
সরাইল থানা	১১৯৫৫৪	৮৮৩৮৫	৭৩ ৯৩
ব্রাহ্মণবেড়িয়া থানা	২৬৯১৬৬	১৭৫৩১১	৬৫·১৩
কসবা থানা	১৬৬১৩৭	৯৬১৩২	৫৭·৮৬
নবীনগড় থানা	২২২৫৮৯	১৫৫০১০	৬৯·৬৪
বাঞ্ছারামপুর থানা	১৩৯১৩৯	১২৩০৮৩	৮৮·৪৬
সদর মহকুমা থানা	১৭৫০৩০৮	১৪০৭৪৯৪	৮০·৪১
হোমনা থানা	১২৬৮৭৬	১০৬৫৪০	৮৩·৯৭
দাউদকান্দি থানা	২৫৩৭৪০	২১১৮৯৫	৮৩·৫১
মুরাদনগর থানা	২২০৬৪২	১৫৮১২২	৭১·৬৬
দেবীদুয়ার থানা	১৪৯১৫৮	১২৩৬৯২	৮২·৯৩
বুড়িচঙ্ থানা	১৭৪৪৬৬	১৪০২৯৮	৮০·৪২
কুমিল্লা থানা	১৭৩৮৫০	১২৬০৬২	৭২·৫১
চৌদ্দগ্রাম থানা	১৯১৬২৩	১৫৯৪৩৫	৮৩·২০
লাকসাম থানা	২৪৪৩৪৬	২০৮৫৮৮	৮৫ ৩৭
চান্দিনা থানা	২১৫৬০৭	১৭২৮৬২	৮০·১৭
চাঁদপুর মহকুমা	১০৭০০২৮	৮৫৫৯৩৭	৭৯·৯৯
কচুয়া	১১৮৮৭৫	৯৯৫০৪	৮৩·৭০
হাজিগঞ্জ থানা	১৯৩১৪৯	১৬০০০২	৮২·৮৪
ফরিদগঞ্জ থানা	১৮৭২২২	১৫৫৭৫৮	৮৩·১৯
চাঁদপুর থানা	৩০৬৮৬৮	২২৪৭১৪	৭৩·২৩
মাতালবাজার থানা	২৬৩৯১৪	২১৫৯৩৯	৮১·৮২